প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অষ্টম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● এপ্রিল-জুন ২০১৮



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১৮

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
April-June Issue, 2018; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

মার্ক্সবাদের ভবিষ্যৎ

মার্ক্সবাদ ও মানবজাতির আদর্শগত ভবিষ্যৎ ৯
আবুল কাসেম ফজলুল হক

ধর্ম প্রসঙ্গ

ট্রায়ের শহরের প্রমিথিউস ৩৫
বদরুল আলম খান

বিতর্ক

শারিয়াতি ও মার্ক্স ৬৭
মার্ক্সবাদের একটি 'ইসলামি' সমালোচনার সমালোচনা
আসেফ বায়াত

ভারত প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও মার্ক্সের লেখনী : একটি সংক্ষিপ্ত ৮৯
পর্যালোচনা ও যুক্তিতর্ক
মোফাখ্খারুল ইসলাম

প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান পৃথিবীতে মার্ক্সবাদের প্রাসঙ্গিকতা ১০১
মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

কমিউনিস্ট নারী

নিবেদিতা নাগ : জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি ১১৭
মালেকা বেগম

পরিবেশ ভাবনা

কার্ল মার্ক্সের পরিবেশ ভাবনা ও রাজনৈতিক ১৪৫
অর্থনীতির অসমাপ্ত সমালোচনা
খলিলউল্লাহ্

লেখক পরিচিতি ১৫৭



কিছু মানুষ কর্মের মাধ্যমে নিজের যুগ ছাপিয়ে হয়ে ওঠে শাশ্বত। বেঁচে থাকে মানুষের চেতনায়, প্রেরণায়। প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক কার্ল মার্ক্সকে অনেকগুলো পরিচয়ে পরিচিত করা যায়। কিন্তু সব ছাপিয়ে তিনি হয়ে আছেন মানুষের মুক্তির প্রেরণাশক্তি হিসেবে। জার্মানিতে জন্ম নেওয়া এই কালজয়ী ব্যক্তিটি তাঁর আজীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন সব চিন্তার জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন, যা আজও কোটি মানুষের মুক্তির অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আসছে। গত ৫ মে ছিল তাঁর দুই শততম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে *প্রতিচিন্তা*র এ সংখ্যায় কার্ল মার্ক্সের কাজকে পাঠকের সামনে তুলে আনা হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। এই সংখ্যার বিভিন্ন লেখায় তাঁর চিন্তার ব্যবচ্ছেদ যেমন আছে, তেমনি নানা দেশে তাঁর চিন্তাকে যেভাবে ধারণ করা হয়েছে এবং এখনো টিকে আছে, সেই আলোচনাও রয়েছে।

অনেকে বলছেন, পৃথিবীতে একধরনের আদর্শিক শূন্যতা বিরাজ করছে। ফলে মানুষ পুরোনো বিশ্বাস আঁকড়ে বাঁচতে চাইছে। সব ধরনের আদর্শই দিন দিন অসাড় হয়ে পড়ছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট আদর্শ মানুষকে তার জীবনপ্রণালি নির্দিষ্ট করে দিতে পারছে না। ফলে মানবজাতির আদর্শগত ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। সবগুলো আদর্শিক পথ নিয়েই নতুন করে ভাবনা আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। *প্রতিচিন্তা*র এই সংখ্যায় তাই আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'মার্ক্সবাদ ও মানবজাতির আদর্শগত ভবিষ্যৎ' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হলো। এখানে লেখক নিজের আদর্শগত অবস্থান থেকে মার্ক্সবাদকে আত্মসমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি মানবজাতির বিদ্যমান আদর্শগুলোর ব্যাপারে পুনর্দৃষ্টিপাত করেছেন। লেখকের দেওয়া হাবিবুল্লাহ বাহার স্মারক বক্তৃতাটিই প্রবন্ধ আকারে ছাপা হয়েছে।

বদরুল আলম খানের প্রবন্ধে পাওয়া যায় মার্ক্সের ব্যক্তিজীবনের কিছু দিক। মার্ক্সের চিন্তার আলোকে আমাদের দেশের বর্তমান হালচাল উঠে এসেছে এই লেখায়। প্রবন্ধটি 'ট্রায়ের শহরের প্রমিথিউস' নামে ছাপা হলো। মার্ক্সের জন্মনগরী ট্রায়ের। গ্রিক পুরাণমতে, প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন এনে এগিয়ে নিয়েছিলেন মানবসভ্যতাকে। তেমনি মার্ক্সও তাঁর চিন্তা দিয়ে জগৎ বদলে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। এই সাযুজ্য তুলে ধরতেই লেখক মার্ক্সকে ট্রায়ের শহরের প্রমিথিউস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রিক পুরাণে পাওয়া যায়, প্রমিথিউস নশ্বর পাথর হতে হলেও শক্তিমান গ্রিক দেবতা জিউসের দাসত্ব না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। মার্ক্সও পুঁজিবাদের অধীনে সৃষ্ট মানব দাসত্ব যেমন করতে অস্বীকার করেন, তেমনি তিনি সেই দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে নতুন মানবসমাজ গড়ার স্বপ্নও দেখেছিলেন।

মার্ক্সের এসব প্রত্যয়ই ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্ম নিয়েছে বিশ্বব্যাপী নানা মুক্তির সংগ্রাম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব। সারা দুনিয়া কাঁপানো সেই বিপ্লব ছিল মার্ক্সের দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। বাস্তবায়ন-কৌশলে ভুলত্রুটিসহ নানা কারণে সেই বিপ্লবের ফলে জন্ম নেওয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি। কিন্তু বিপ্লবের যে ঢেউ জন্ম নিয়েছিল, তা থেমে থাকেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া আরও নানা জায়গায় জন্ম নিয়েছিল বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গ। মার্ক্সবাদের সঙ্গে ধর্মের একটি আপাতবিরোধ থাকলেও আমরা দেখি মুসলিম-বিশ্বে মার্ক্সবাদ কেমন ছাপ ফেলে গেছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় ইরানের কথা। সেখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক হিসেবে ধরা হয় আলি শারিয়াতিকে। তিনি মার্ক্সবাদের নিগূঢ় অর্থের সঙ্গে একমত হলেও ধর্মের ব্যাপারে মার্ক্সের চিন্তার সঙ্গে দ্বিমত করেছেন। কিন্তু সেই মতবিরোধ কতটুকু যুক্তিসংগত ছিল, তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। মার্ক্সের চিন্তা মার্ক্সবাদ রূপে বিকশিত হওয়ার পেছনে অনেকের অবদান রয়েছে। মার্ক্সবাদের সব বক্তব্যই যে মার্ক্সের দেওয়া এমন নয়। এই পার্থক্যের জের ধরে আরেকজন ইরানি তাত্ত্বিক আসেফ বায়াত আলি শারিয়াতির যুক্তিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। লেখাটি পুরোনো হলেও এর প্রাসঙ্গিকতা আজও রয়ে গেছে। সেই বিবেচনায় আসেফ বায়াতের লেখাটি আমরা বাংলায় অনুবাদ করে ছাপছি।

মার্ক্সের চিন্তাকে উপজীব্য করে উপমহাদেশেও বিপ্লবের ঢেউ লেগেছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মার্ক্সের চিন্তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু মার্ক্স নিজেও ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদের সমালোচনায় সরব ছিলেন। মার্ক্সের সেসব লেখাজোখার আলোকে মোফাখ্খারুল ইসলাম তৈরি করেছিলেন তাঁর প্রবন্ধটি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও মার্ক্সের লেখনী নিয়ে এই প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করে ছাপা হলো।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ পার করে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিচারে অগ্রগতি হলেও তার সুফল সর্বজনীন হয়নি। উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে বৈষম্যের চালচিত্র। আসলে বৈষম্য দুনিয়াজোড়া এক মারাত্মক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাই মার্ক্সবাদের আলোচনা আসলে বৈষম্যের আলোচনাই। বৈষম্যের শিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই মার্ক্সের প্রলেতারিয়েত। তাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও বৈষম্যের চালচিত্র তুলে এনেছেন অধ্যাপক এম এম আকাশ।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে মার্ক্সবাদ কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে বিতর্কও চলছে পুরোদমে। আজকের বৈশ্বিক সমস্যায় মার্ক্সবাদ কীভাবে কাজে লাগবে, সে নিয়ে রয়েছে অনেক আলোচনা। তাই মার্ক্সের জন্মভূমি জার্মান দেশে মার্ক্সকে কীভাবে দেখা হচ্ছে, তা জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মুহাম্মদ তানিম নওশাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত লেখাজোখার আলোকে কার্ল মার্ক্সের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে লিখেছেন এই সংখ্যায়।

মার্ক্সবাদের আলোকে জীবন গড়ার অনেক নায়ক আমাদের দেশেও জন্মেছেন। তাঁদেরই একজন নিবেদিতা নাগ। আজীবন সংগ্রামী এই নেত্রী প্রয়াত হয়েছেন ২০১৩ সালে। ২০১৮ সালের ৪ আগস্ট তাঁর জন্মশতবর্ষ পূরণ হলো। মালেকা বেগম দুই কিস্তিতে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। মার্ক্সের দুই শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যা। তাই এই সংখ্যায় বাংলার এই মার্ক্সবাদী নারী নেত্রীর জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর লোভ সংবরণ করা দায়। সেই লক্ষ্যেই মালেকা বেগমের নেওয়া এই সাক্ষাৎকারটি ছাপছি। সেই সঙ্গে এই আলোচনায় উঠে আসা কিছু বামপন্থী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে জানানোর উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকারের শেষে কিছু টীকা যুক্ত করা হয়েছে।

সারা দুনিয়াতেই বৈষম্যের পাশাপাশি অন্যতম বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে পরিবেশের সংকট। এ বিষয়ে কার্ল মার্ক্সের চিন্তা নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। অনেকেই মার্ক্সকে দেখেন পরিবেশের ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তি হিসেবে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু মার্ক্সবাদী উত্তর দিয়েছেন এর আগে। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বলা যেত না যে মার্ক্স নিজে আসলেই পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে মার্ক্সের কিছু ব্যক্তিগত নোটবুক। এগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক। সেখানে রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনায় মার্ক্স কীভাবে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তার প্রমাণাদি পাওয়া যায়। জাপানি মার্ক্সবাদী পণ্ডিত কোহেই সাইতো তাঁর সাম্প্রতিক *কার্ল মার্ক্স'স ইকোসোশ্যালিজম* গ্রন্থে সেই বিষয়গুলো সবিস্তারে তুলে এনেছেন। এই সংখ্যায় সাইতোর বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন খলিলউল্লাহ্।



মার্ক্সবাদ ও মানবজাতির আদর্শগত ভবিষ্যৎ

আবুল কাসেম ফজলুল হক

১. চলমান আদর্শগত বাস্তবতা

প্রায় চার দশক ধরে পৃথিবীতে আদর্শগত (ideological) শূন্যতা বিরাজ করছে এবং পুরোনো পরিত্যক্ত সব সংস্কার-বিশ্বাসের ও ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটছে। জনগণের জন্য মার্ক্সবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলা হয়েছে। ফলে এগুলো আর আদর্শরূপে কার্যকর নেই। এ জন্যই সৃষ্টি হয়েছে আদর্শগত শূন্যতা। আদর্শের অবলম্বন ছাড়া চলমান অপব্যবস্থা, দুর্নীতি, জুলুম-জবরদস্তি ও অসামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে মানুষ অসহায় বোধ করছে। আদর্শগত শূন্যতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল ধর্মের পুনরুজ্জীবন দেখে ১৯৮০-র দশক থেকেই অনেকে উদ্বেগের সঙ্গে বলে আসছেন, ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ঘুরছে।

দুনিয়াব্যাপী ইতিহাসের চাকাকে আবার সামনের দিকে ঘোরানোর কথা বলে যাঁরা তৎপর হয়েছেন, তাঁরা ধর্মের ও ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিবাদী আন্দোলন চালিয়েছেন। ইসলামপন্থীদের তাঁরা বলছেন মৌলবাদী আর ইসলামকে বলছেন মৌলবাদ। মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন ইসলামপন্থীদের জন্য উসকানিমূলক হয়েছে এবং তাতে ইসলামপন্থীরা উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়েছেন আর ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতি দ্রুততর হয়েছে। যাঁরা ইতিহাসের চাকাকে আবার সামনের দিকে ঘোরানোর কথা বলেন, গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র নিয়ে তাঁরা অল্পই চিন্তা করেন। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার কথা খুব বলেন এবং মৌলবাদবিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, দুর্নীতিবিরোধী ও নারীবাদী আন্দোলন করেন।

এর মধ্যে কোনো কোনো মহল থেকে প্রচার করা হয় যে ধর্ম ও আদর্শের (grand narratives) দিন শেষ। রাষ্ট্রও গুরুত্বহীন হয়ে গেছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। আর বিশ্বায়ন, বৈশ্বিক রাষ্ট্র, বৈশ্বিক নাগরিক, উদারনীতিবাদ, বিরাজনৈতিকীকরণ

(নৈরাজ্যবাদ), বহুত্ববাদ, এনজিও, সুশীল সমাজ সংগঠন ইত্যাদি কথা ক্রমাগত উচ্চারিত হয়। জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্রকে গড়ে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না।

উনিশ শতকে রুশ দার্শনিক মিখাইল বাকুনিন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-আন্দোলনের ধারায় নৈরাজ্যবাদ প্রচার করেছিলেন। Syndicalism-এর সঙ্গেও নৈরাজ্যবাদের ধারণা যুক্ত হয়েছিল। এখন বিরাজনৈতিকীকরণ দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিশ্বায়নবাদীদের অঘোষিত কর্মনীতি। নোয়াম চমস্কি চলমান বিশ্বায়নের ও সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচক হয়েও ফেবিয়ান নৈরাজ্যবাদকে এবং বাকুনিনের চিন্তাধারাকে সামনে আনছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের শুরুতে এই সব মতাদর্শ মার্ক্স ও মার্ক্সবাদীদের দ্বারা অবাস্তব কল্পনা (utopian) বলে বিবেচিত হয়েছিল।

আমার মত এই যে, কিছু লোকে প্রবলভাবে ধর্মের অবসান চাইলেই ধর্ম অবসিত হবে না। সভ্যতার বিকাশে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রতিটি ধর্মই উন্মেষপর্বে ও প্রথম পর্যায়ে নিপীড়িত জনগণের জন্য কল্যাণকর ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি ধর্মই কায়েমি স্বার্থবাদীদের দ্বারা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বেলায়ও একই ধরনের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ধর্মের কিংবা আদর্শের অবলম্বন ছাড়া চলতে পারে না। আদর্শহীন বাস্তবতায় ধর্মকে শেষ করে দেওয়ার জন্য যতই চেষ্টা করা হচ্ছে, মানুষ ততই ধর্মের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। গণতন্ত্রকে পুনর্গঠিত কিংবা নবায়িত করে সর্বজনীন গণতন্ত্রে রূপ দিলে এবং জনগণের জন্য প্রাণশক্তিসম্পন্ন আদর্শ রূপে সামনে আনা হলে ঘটনাপ্রবাহ সম্মুখগতি লাভ করবে।

মানুষ জন্মগতভাবে যে জীবন ও জীবনপরিস্থিতি লাভ করে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। সে উন্নততর জীবন ও উন্নততর পরিবেশ আকাঙ্ক্ষা করে। বিশেষ বাস্তব অবস্থায় থেকে সে তার চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি দিয়ে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে উন্নত অবস্থার কল্পচিত্র তৈরি করে। বহুজনের অভিপ্রেত এই কল্পিত বাস্তব সর্বজনীন কল্যাণকামী কোনো কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সমন্বিত রূপ নিয়ে হয়ে ওঠে আদর্শ। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি এমনিভাবে সৃষ্ট আদর্শ। বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আদর্শ রূপ নেয়। রাজনৈতিক আদর্শের পরিচয় প্রকাশ পায় রাষ্ট্রব্যবস্থার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, বিধিবিধানের, ভবিষ্যৎ চিন্তার, কর্মসূচির ও কার্যপ্রণালির মধ্য দিয়ে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত উন্নতিশীল অস্তিত্বের অপরিহার্য অবলম্বন আদর্শ। বাস্তব ও আদর্শ বিকাশশীল। আদর্শ, কর্মসূচি, নেতৃত্ব ও ঐক্য অবলম্বন করে চললে সাধারণ মানুষ, জনগণ, শক্তিশালী হয়; আর এসবের অবলম্বন ছাড়া তারা দুর্বল ও অসহায় থাকে। আদর্শহীন অবস্থায় জনসাধারণ অবাধে শোষিত,

বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়। আদর্শ অবলম্বন করে তারা নিজেদের থেকে নিজেদের জন্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করে সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতারণা থেকে পর্যায়ক্রমে মুক্তি পেতে পারে। আদর্শের প্রশ্নে কায়েমি স্বার্থবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি আর জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এক হয় না।

কায়েমি স্বার্থবাদীদের ছাড়া বাকি সবার জন্যই আদর্শ অপরিহার্য। জনগণ আদর্শের অবলম্বন চায়, আদর্শের নামে প্রতারণা চায় না। আদর্শ বাস্তবায়িত হয় পর্যায়ক্রমে আদর্শ অভিমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রও লোপ পাবে না, টিকে থাকবে। রাষ্ট্রের বিকল্প নেই। নেতৃত্ব সৃষ্টি করে সবার কল্যাণে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত ও নবায়িত করতে হবে।

আদর্শের দিন কখনো শেষ হবে না। ধর্মের অলৌকিক বিষয়গুলোকে দূরে রেখে আদর্শের সঙ্গে ধর্মের তুলনা করলে ধর্ম ও আদর্শের রূপ ও প্রকৃতিকে প্রায় এক রকম দেখা যায়। অতীতে ধর্মীয় ও আদর্শগত সব প্রচেষ্টাই কেবল ব্যর্থ হয়েছে এমন বলা যাবে না। কিছু না কিছু সাফল্য প্রতি ক্ষেত্রেই আছে। অতীতে যেসব কাজে মানুষ ব্যর্থ হয়েছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হওয়ার কারণ আছে। মানুষের নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা অফুরন্ত। মানবসমাজ সীমাহীনরূপে শোধনীয়। একজনে যা পারে না, বহুজনে মিলে তা পারে। এক জেনারেশনে যা সম্ভব হয় না, বহু জেনারেশনের চেষ্টায় তা সম্ভব হয়। বিজ্ঞান উন্নতির মূল অবলম্বন। বিজ্ঞানের সঙ্গে চাই প্রগতিশীল নৈতিক চেতনা। চলতি উত্তেজনা ও উপস্থিত অস্থিরতা থেকে মুক্ত হতে হবে। আদর্শ উদ্ভাবন ও অবলম্বন এবং পর্যায়ক্রমে আদর্শ অভিমুখী কর্মসূচি নিয়ে আদর্শ বাস্তবায়ন করে চলতে হবে। অভিপ্রেত নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য জনসাধারণকে চেষ্টা চালাতে হবে। জনসাধারণের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে সেনাসহযোগে সংঘটিত কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর এবং ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে সংঘটিত ইসলামি বিপ্লবের পর মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দেখা দেয় নতুন প্রতিযোগিতা। তখন আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে তালেবান এবং আরও কয়েকটি জঙ্গিবাদী গ্রুপ (Armed Islamic Fundamentalist Groups)। তখন যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের সহায়তা করে এবং তালেবানরা যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের দ্বারা ক্রমে সমগ্র আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। তারপর দেখা যায়, কাবুলের তালেবান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতি অবাধ্য হয়ে উঠেছে। তখন যুক্তরাষ্ট্র কাবুলে মোল্লা ওমরের তালেবান সরকারকে এবং অবাধ্য তালেবানদের শায়েস্তা করার জন্য সামরিক অভিযান চালাতে থাকে। সে অবস্থায় চলমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, ২০০১ সালে কোনো অজ্ঞাত শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের গর্বের ধন টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে।

তারপর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে একে একে আফগানিস্তানে, ইরাকে, লিবিয়ায়, সিরিয়ায় চালায় সামরিক আক্রমণ। তার প্রতিক্রিয়ায় আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ায় দেখা দেয় জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড (Armed Islamic Fundamentalism)। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একদিকে আছে সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুসারীরা; অপর দিকে আছে ইসলামপন্থীরা, যারা মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী বলে অভিহিত হচ্ছে। এ অবস্থায় ইতিহাসের চাকা সামনের দিকে ঘোরানোর জন্য বিভিন্ন দেশে দেখা যাচ্ছে মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশ, মিলিটারি, আইন-আদালত, জেলখানা, ফাঁসিকাষ্ঠ ইত্যাদি নিয়ে ভীষণ সক্রিয়তা এবং আগ্রাসী সামরিক আক্রমণ ও গণহত্যা। সবকিছুর কেন্দ্রীয় পরিচালনায় দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যরূপে আছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাদের অনুসারীরা। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ন্যাটোর আগ্রাসী উপস্থিতি; সামরিক আক্রমণ, গণহত্যা ও জবরদখল বজায় রেখে বিশ্বশান্তি আশা করা হচ্ছে!

মানুষের ধর্মবোধ, আদর্শবোধ ও ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নকে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি দিয়ে বিচার করা হচ্ছে না। ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থী আন্দোলনকারীদের দিক থেকে ধর্মপন্থীদের প্রতি কেবল বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করা হচ্ছে। সভ্যতার বিকাশে ধর্মের ও আদর্শের ভূমিকা নিয়ে কিছুই ভাবা হচ্ছে না। দুনিয়ার কোথাও আদর্শগত পুনর্গঠনের (ideological reconstruction) কোনো প্রবণতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থীরা ইসলামপন্থীদের অভিহিত করে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, অন্ধকারের জীব ইত্যাদি বলে, আর এর প্রতিক্রিয়ায় ইসলামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থী আন্দোলনকারীদের বলে নাস্তিক, ইসলামের শত্রু, মুরতাদ ইত্যাদি।

দুনিয়াব্যাপী ইসলামপন্থীদের এই পুনরুজ্জীবন মূলত সাম্রাজ্যবাদীদের এবং সাম্রাজ্যবাদ অনুসারী গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়াজাত। সাম্রাজ্যবাদীরা পরিকল্পনা করেই এভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধর্মপন্থীদের জাগাতে চেয়েছে। এই জাগরণে প্রকৃত ধর্মবোধ অল্পই আছে। নানা স্বার্থে পরিকল্পিত উসকানিমূলক কাজের দ্বারা ক্রমাগত ইসলামপন্থীদের সক্রিয় করা হয়েছে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ১৯৮০-র দশকের শুরু থেকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যম বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা বেতার তরঙ্গে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রচার করে মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন। তিনটি আন্দোলনই অবলম্বন হয় বিরাজনৈতিকীকরণের। মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ধর্মপন্থী শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং রাজনীতিতে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারীবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একদিকে উচ্চশ্রেণির ও উচ্চ-মধ্যশ্রেণির কিছু নারী অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদে, জাতীয় সংসদে, প্রশাসনব্যবস্থায়, বিচারব্যবস্থায় ও শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করেন;

অপর দিকে বৃহত্তর সমাজে অসামাজিক কার্যকলাপ ও নারী নির্যাতন বেড়ে যায়। নারীবাদী আন্দোলনের কোনো কোনো বক্তব্যের দ্বারা ধর্মপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে উসকানি পায় এবং সক্রিয় হয়। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির প্রতি জনসাধারণকে সহিষ্ণু করে তোলে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ধর্মপন্থীদের কোনো সর্বাঙ্গীণ বক্তব্য নেই। একালে কোনো ধর্ম অবলম্বন করে তা সম্ভবও নয়। নারীবাদের বক্তব্য মানববাদের (humanism) প্রতিকূল। মানববাদকে সুষ্ঠু ধারায় বিকশিত করা দরকার। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের বক্তব্য নেতিবাচক—ন্যায়নীতিবিমুখ। গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে আদর্শবোধ, আদর্শসন্ধিৎসা ও আদর্শনিষ্ঠা অল্পই আছে। তাঁরা আদর্শনিষ্ঠা ত্যাগ করে অবলম্বন করেছেন সুবিধাবাদ ও ভোগবাদ। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদেরই অনুসারী। চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা কি এখন বিকাশমান কোনো আদর্শ অবলম্বন করে চলছে? ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থীদের মধ্যে চলছে তীব্র স্বার্থের সংঘাত। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বার্থান্ধ ও জয়-পরাজয়মূলক। এতে ন্যায়, সত্য, সুন্দর, প্রগতি, সভ্যতা ইত্যাদির কোনো বিবেচনা নেই।

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে মানবজাতির সামনে বিরাট আশার বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল মার্ক্সবাদ। ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ক্রমে মার্ক্সবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে চলছিল। সভ্যতার বিকাশে মার্ক্সবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে মার্ক্সবাদ ও মার্ক্সবাদীদের অবস্থা কেমন? আর মানবজাতির আদর্শগত ভবিষ্যৎই বা কী?

সাম্রাজ্যবাদীরা কি গণতন্ত্রী? গণতন্ত্রী থেকে কি সাম্রাজ্যবাদী হওয়া যায়? সাম্রাজ্যবাদীরা কি জাতীয়তাবাদী? জাতীয়তাবাদী থেকে কি সাম্রাজ্যবাদী হওয়া যায়? এগুলো মুক্তিকামী জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের প্রতি সব সময়ই দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদীদের সীমাহীন লোভ। এই লোভ চরিতার্থ করার জন্য কর্তৃত্বের প্রয়োজনে একসময় তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসলামের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিল। আফগানিস্তানে কমরেড তারাকির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লব (১৯৭৮) এবং ইরানে খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লব (১৯৭৯) ঠিক ওই সময়েই সাধিত হয়েছিল। দুটি বিপ্লবই ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তাতে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খর্ব হয়েছিল। আফগানিস্তানে কথিত এই কমিউনিস্ট বিপ্লবকে জনগণ মেনে নেয়নি। সে অবস্থায়ই সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকারকে রক্ষা করার জন্য এক লাখেরও বেশি সৈন্য পাঠিয়েছিল। মুসলিম জনগণের ওপর মার্ক্সবাদ চাপিয়ে দেওয়ার এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়ই আফগানিস্তানে আত্মপ্রকাশ করেছিল তালেবান এবং আরও কয়েকটি জঙ্গিবাদী

সংগঠন (Armed Islamic Fundamentalist Organization)। তালেবানরা তখন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পায় এবং ক্রমে এতটাই শক্তিশালী হয় যে তারা গোটা আফগানিস্তান দখল করে এবং মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে কাবুলে তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তখন তারা আর সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি অনুগত থাকেনি (তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নেয়)। ধর্মীয় শক্তির পুনরুজ্জীবনের ও জঙ্গিবাদের উত্থানের পেছনে এক দিকে আছে প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ; অপর দিকে আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বিশ্বব্যাংক, ইউনেসকো, ইউনিসেফ প্রভৃতি শক্তির সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। ব্যাপার কেবল ধর্মীয় ও আদর্শগত নয়, স্বার্থগতও। বাস্তব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিচার না করে কেবল ইসলামকে দায়ী করে সমস্যাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়।

একসময় ধর্মের নামে অধর্ম দেখে এবং বিকাশশীল জগতে ধর্মের বিকাশহীনতা দেখে আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দেখে লোকে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু গত প্রায় চার দশকের মধ্যে অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে।

সমাজতন্ত্রের নামে বিভিন্ন দেশে যা চলেছে, তা দেখে সমাজতন্ত্রের প্রতি লোকে আস্থা হারিয়েছে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন লোপ পেয়েছে। মার্ক্সবাদের প্রতিও লোকের আর কৌতূহল দেখা যাচ্ছে না। মতান্ধ মার্ক্সবাদীদের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, মার্ক্সবাদ মতাদর্শ হিসেবে আর কার্যকর নেই। বিশ্বাসের দৃঢ়তা দিয়ে সত্যের প্রমাণ হয় না। উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আফগানিস্তানে, ইরাকে, লিবিয়ায়, সিরিয়ায়, বাংলাদেশে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আরও অনেক দেশে এখন যা চালানো হচ্ছে, তাতে খুব কম লোকেই কথিত উদার গণতন্ত্রে আস্থা রাখতে পারছেন।

কেবল নির্বাচন দ্বারা সরকার গঠিত হলেই গণতন্ত্র হয় না। মুসোলিনি, হিটলার, সালাজার, ফ্রাঙ্কো নির্বাচিত শাসক ছিলেন। নির্বাচনকালে তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই গণতন্ত্রী ছিলেন না। নিরেট ক্ষমতালিপ্সা ছিল তাঁদের চালিকাশক্তি। নির্বাচন গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত বটে, তবে গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত আরও আছে। কেবল নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। বিভিন্ন দেশে চলমান গণতন্ত্র ক্রমেই বেশি করে গণবিরোধী রূপ নিচ্ছে। কায়েমি স্বার্থবাদীরা গণতন্ত্রের নামে হুজুগ সৃষ্টি করে, ভাঁওতা-প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হীন স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে। দুর্নীতি বাড়ছে। একসময় ধর্মের নামে যেমন অনাচার দেখা গিয়েছে, এখন গণতন্ত্রের নামে সেই রকম অনাচার দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপ ও কোল্ড ওয়ারের পর সমাজতন্ত্রবিরোধীরা আশা করেছিলেন গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগ দেখা দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টোটা। চলমান গণতন্ত্রের কিংবা চলমান সমাজতন্ত্রের প্রতি এখনো যাঁরা আস্থা পোষণ করেন, তাঁদের অনেকে

অন্ধবিশ্বাসী, অনেকে কায়েমি স্বার্থবাদী, অনেকে সুবিধাবাদী, অনেকে ভণ্ড। সুস্থ স্বাভাবিক আদর্শবোধ ও আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে চিন্তা ও কাজ করেন এমন মানুষ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোন দেশে কজন আছেন?

জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কেও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা এখন দুর্লভ। সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি অসহিষ্ণু—তারা বিশ্বায়নে উৎসাহী। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রায় সব কেন্দ্রে এখন কর্তৃত্বশীল আছে কায়েমি স্বার্থবাদীরা, সুবিধাবাদীরা ও ভোগবাদীরা। এই অবস্থার মধ্যেই দুনিয়াব্যাপী জনসাধারণ ঝুঁকছে পরিত্যক্ত পুরোনো সব সংস্কার-বিশ্বাস ও ধর্মের দিকে।

বর্তমান আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কের মধ্যে আছে আধিপত্য ও নির্ভরশীলতা, প্রবল ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, যুদ্ধবিগ্রহ। প্রবল রাষ্ট্রগুলো তৎপর আছে national superiority complex নিয়ে, আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে তারা ঠেলে দিচ্ছে national inferiority complex-এ। প্রবল রাষ্ট্রগুলোর কূটনীতি, বাণিজ্যনীতি, ঋণনীতি, প্রচারনীতি, প্রযুক্তিনীতি ও গোয়েন্দানীতি একান্তভাবে প্রবল রাষ্ট্রগুলোরই অনুকূলে এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর প্রতিকূলে। রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরে আছে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ধনতন্ত্র, প্রবলের ভোগবাদ ও দুর্বলের বঞ্চনা (সর্বত্র জুলুম-জবরদস্তি, অপব্যবস্থা ও দুর্নীতি)। প্রশাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রতারণামূলক নীতি কার্যকর আছে কেবল প্রবলদের স্বার্থে। দুর্বল রাষ্ট্রগুলো পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বব্যাংক দ্বারা। লেখক-শিল্পী-চিন্তকদের মধ্যে intellectual honesty বা প্রগতিশীল intellectual character বলে কোনো কিছুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। চলমান এই ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গঠনমূলক উল্লেখযোগ্য কোনো চিন্তাভাবনার সন্ধান পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুর্বলরা শক্তিশালী হতে পারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে—নিজেদের থেকে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের জন্য ভালো নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে দুর্বল জনগণের মধ্যে এই চেষ্টা দরকার। নতুন প্রযুক্তি বিস্তারের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের পর এই বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দরকার যে সর্বজনীন কল্যাণে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২. উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি এবং অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্য বৃদ্ধি

বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও শ্রমশক্তির কল্যাণে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন অনেক বেড়েছে। সিনথেটিক ফাইবারের ফলে কাপড়ের উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। ফলে সারা দুনিয়ায় শ্রমিক-কৃষকেরা এখন ভাত-কাপড়ের অভাব থেকে কিছুটা মুক্ত। আর মধ্যবিত্তরাও আর্থিক দিক দিয়ে আগের তুলনায় কিছুটা ভালো আছে। ধনী লোকদের কাছে ধন-সম্পদ আগের তুলনায় অনেক বেশি জমা হচ্ছে।

অপর দিকে দেখা যায়, উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন—সব শ্রেণির মানুষই মানবিক গুণাবলি হারিয়ে চলছে। উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনী-গরিবের বৈষম্য বাড়ছে, সামাজিক অবিচার বাড়ছে, জুলুম-জবরদস্তি বাড়ছে, মাদকাসক্তি বাড়ছে, অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে, হত্যা-আত্মহত্যা বাড়ছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে, সমাজে অদৃষ্টবাদীর (fatalist) সংখ্যা বাড়ছে, দৃষ্টবাদীর (positist) সংখ্যা কমছে, সমাজের সংহতি (integrity) কমছে, শিথিলতা (alienation) বাড়ছে, দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে জাতীয় হীনতাবোধ (national inferiority complex) বাড়ছে। ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বৈষম্য আগের তুলনায় দ্রুততর গতিতে বাড়ছে। ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের চর্চাকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখিত হচ্ছে বিনোদনের জন্য; কিংবা নানা বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব অবলম্বন করে যেসব তত্ত্ব উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে। সাহিত্যে প্রাণশক্তির নিদারুণ অভাব, সৃষ্টিশীলতা দুর্লভ। মহৎ সাহিত্যের কিংবা ক্লাসিকের প্রতি লেখক-পাঠক—কোনো মহলেই আগ্রহ নেই। আগ্রহ আছে কেবল বিনোদনে। দুনিয়াব্যাপী কায়েমি স্বার্থবাদীদের হীন উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতিকে এমন করে ফেলা হয়েছে যে এর ভেতর থেকে চলমান রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য এমন সব শিক্ষিত লোক তৈরি হচ্ছে, যারা গতানুগতিপ্রিয় ও প্রগতিবিমুখ এবং সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষণের সম্পূর্ণ অনুকূল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে জিজ্ঞাসা নেই, অনুসন্ধিৎসা নেই, জ্ঞানস্পৃহা নেই, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ও প্রগতির প্রবণতা নেই—আছে কেবল স্বার্থপরতা। সবকিছু চলছে অতি দ্রুতগতিতে—বলা যায় যন্ত্রের গতিতে। দীর্ঘস্থায়ী মূল্যের কোনো কিছুর প্রতি কারও কোনো আগ্রহ নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা চলছে গণবিরোধী রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে। জনগণ জাগ্রত নয়, ঘুমন্ত। প্রচারমাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে কায়েমি স্বার্থে। প্রচারমাধ্যমের শক্তি অপরিসীম।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থাকে উন্নত করা গেলে এত দিনে সব রাষ্ট্রের সব মানুষ নিরাপদ সম্মানজনক জীবনের অধিকারী হতো। সম্ভাব্য উন্নততর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার কথা ভাবতে গেলে বর্তমান ব্যবস্থার বীভৎস রূপই সামনে আসে। এই বীভৎসতাকে অতীতের ব্যাপারে পরিণত করে উন্নততর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবিলম্বে চিন্তা ও কর্মের নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

৩. সভ্যতার সংকট

ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) পর থেকে মানবজাতি তিনটি আদর্শ সামনে নিয়ে অগ্রসর

হচ্ছিল : ১) গণতন্ত্র, ২) সমাজতন্ত্র ও ৩) জাতীয়তাবাদ। এসবের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল রেনেসাঁসের স্পিরিট।

গণতন্ত্রকে ১৯৮০-র দশকে 'উদার গণতন্ত্র' নাম দিয়ে পরিণত করা হয়েছে নির্বাচনতন্ত্রে। নির্বাচন নিয়ে চিন্তা ছাড়া গণতন্ত্র বিষয়ে এখন আর কোনো চিন্তাই নেই। জনগণের জন্য এটা বঞ্চনামূলক। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ নির্বাচন করার সামর্থ্যও এখনো অর্জন করেনি।

সমাজতন্ত্র ১৮৪০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ক্রমে মার্ক্সবাদে রূপ নেয়। মার্ক্সবাদের বিকাশ ও পরিণতি সুবিদিত।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সূচনার পর ফিউডাল যুগের আঞ্চলিকতার অবসান ঘটানোতে ও দৈশিক ঐক্য সৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদের ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক রাষ্ট্র। অপর দিকে এশিয়া-আফ্রিকায় উপনিবেশ দেশসমূহের স্বাধীনতাসংগ্রামে জাতীয়তাবাদের ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরে এর সম্পূরক হিসেবে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিকতাবাদ। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন মূলনীতিগুলোর একটি ছিল 'জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ'। জাতি, জাতিরাষ্ট্র, জাতীয় ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনধারার স্বাভাবিক অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য জাতিসংঘ তার মূলনীতিতে গ্রহণ করেছিল জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ। কিন্তু বাস্তবে লগ্নিপুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের ফলে জাতিসংঘের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ সফল হয়নি, সাম্রাজ্যবাদ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে এবং আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদনির্ভর হয়েছে। আজকের বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদেরই উচ্চতর স্তর; বিশ্বায়ন হলো উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমন্বিত বিকশিত রূপ। বিশ্বায়নের নেতৃত্বে আছে জি-সেভেন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপান—এই সাত রাষ্ট্রের গ্রুপ। জাতিসংঘ আসলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর সংঘ। বিশ্বব্যাংক হয়ে উঠেছে বিশ্বসরকার। সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয়তাবাদের প্রতি অসহিষ্ণু। জাতীয়তাবাদের ধারণাকে নানা কৌশলে তারা বিভ্রান্তিকর রূপ দিয়ে অকার্যকর করে রেখেছে।

এভাবে সৃষ্টি হয়েছে আদর্শগত শূন্যতা। কর্ম ও চিন্তার মূলধারায় রেনেসাঁসের স্পিরিটও কার্যকর নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। এর মধ্যেই পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে পুরোনো পরিত্যক্ত সব সংস্কার-বিশ্বাস ও ধর্ম।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালিতে সূচিত রেনেসাঁসের স্পিরিট অবলম্বন করে যে চিন্তাধারা আঁকাবাঁকা পথ ধরে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে ক্রমে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ও বিকশিত হয়ে চলছিল, বিশ শতকের শুরুতেই তা সংকটে পড়ে। দুই বিশ্বযুদ্ধ

পশ্চিমের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা অভিহিত হয়েছে সভ্যতার সংকটের অভিব্যক্তি বলে।

এই সংকটের কালেই একে একে সংঘটিত হয় রুশ বিপ্লব (১৯১৭), চীন বিপ্লব (১৯৪৯)—উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে পূর্ব ইউরোপের ১১টি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং একে একে উপনিবেশ দেশসমূহের স্বাধীনতা লাভ। সেই পর্বে মার্ক্সবাদের প্রভাবে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের স্বার্থে দুনিয়াব্যাপী অনেক কিছু বদলে যাচ্ছিল। তখন মানবজাতির বৃহত্তর অংশে আশা সৃষ্টি হয়েছিল যে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে, অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মার্ক্সবাদ বিকাশশীল থাকবে এবং মানবজাতি এই মতবাদ অবলম্বন করে সংকট থেকে মুক্ত হবে এবং ন্যায়ভিত্তিক প্রগতিশীল সমৃদ্ধিমান ভবিষ্যতের অধিকারী হবে। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপের ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে দেখা দিয়েছিল কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা এবং সেই ধারণা নিয়েও আশাবাদ ছিল। রেনেসাঁস, মার্ক্সবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের চিন্তার বাইরে ছিল সুবিধাবাদ ও নৈরাশ্যবাদ। রাজনীতিতে ধর্ম তখন পরিণত হয়েছিল নিতান্ত গৌণ ব্যাপারে। পরিত্যক্ত পুরোনো সংস্কার-বিশ্বাসের ও ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কোনো লক্ষণ তখন দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এক দিকে মার্ক্সবাদী ব্যবস্থা, অপর দিকে কথিত ফ্রি ওয়ার্ল্ড বা উদারনৈতিক ব্যবস্থা (দুয়ের মধ্যে যে বিরোধ ও প্রতিযোগিতা চলছিল, তা অভিহিত হয়েছে 'কোল্ড ওয়ার' বলে)। আদর্শগত এই যুদ্ধে মার্ক্সবাদ বেশি দূর এগোতে পারেনি। ১৯৯১ সালের ৩০ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার আইনসভায় আইন পাস করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিলুপ্ত করে এবং ১৫টি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। ১৫টি রাষ্ট্রই তখন রাষ্ট্রীয় আদর্শ মার্ক্সবাদ ত্যাগ করে এবং ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র গ্রহণ করে। এর ঠিক আগে পূর্ব ইউরোপের ১১টি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে মার্ক্সবাদ ত্যাগ করেছিল এবং ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র গ্রহণ করেছিল। পরিবর্তিত রাষ্ট্রগুলো মার্ক্সবাদবিরোধী, সমাজতন্ত্রবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ক্রমে ভেতর থেকে বদলে যাচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার দাবি করছে যে চীন সৃজনশীল পদ্ধতিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং চিন্তাধারা অবলম্বন করে চলেছে। চীনা নেতারা চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্র অবলম্বনের কথা বলছেন। কিন্তু বাইরে থেকে বলা হচ্ছে, চীন ক্রমে পুঁজিবাদের পথ ধরে চলছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মার্ক্সবাদ আকর্ষণহীন, আবেদনহীন মতবাদে পর্যবসিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে বিকশিত করা হয়নি, সাম্রাজ্যবাদ প্রবল হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কর্তৃত্বের প্রয়োজনে সুকৌশলে

ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল অনেক কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের বাইরেও।

তবু এখনো বিভিন্ন দেশে অনেকের মধ্যে অন্ধবিশ্বাসরূপে মার্ক্সবাদ টিকে আছে। শোষণমুক্ত সমাজের কথায় এখনো তরুণদের অনেকের মুগ্ধতা আছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, মার্ক্সবাদ আবার পুনরুজ্জীবিত হবে। তাঁদের চিন্তা ও বিশ্বাস বাস্তব-ভিত্তিহীন, সৃষ্টিশীলতাহীন, প্রগতিচেতনাহীন। সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন বিলুপ্ত হলো, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা বোঝার কোনো চেষ্টাও তাঁদের নেই। যেসব কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে গেল, সেই কারণগুলো দূর করার কোনো উপায় আছে কি না, তা-ও ভাবা হচ্ছে না। অনেকে অভ্যাসবশত মার্ক্সবাদ ধরে আছেন। তাঁদের মধ্যে সৃষ্টিশীল প্রবণতা নেই। তাঁদের বলা যায় অভ্যাসের দাস। অনেকে নানা সুবিধার জন্য মার্ক্সবাদ ধরে আছেন। তাঁদের বলা যায় সুবিধাবাদী কপট মার্ক্সবাদী। অনেকেই এখন সাম্রাজ্যবাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মার্ক্সবাদী। সাম্রাজ্যবাদীরা মার্ক্সবাদকে প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য দুর্বল অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে চায়। আগে মার্ক্সবাদীরা ছিলেন মস্কোপন্থী, পিকিংপন্থী; এখন তাঁরা হয়েছেন ওয়াশিংটনপন্থী—বিশ্বব্যাংক তাঁদের পরিচালক, এনজিও ও সিএসও তাঁদের অবলম্বন। স্বদেশের, স্বজাতির ও আত্মশক্তির ওপর তাঁদের আস্থা ছিল না, নেই। যাঁদের চিন্তা ও কাজে সৃষ্টিশীলতা আছে, গতিশীলতা আছে, আন্তরিকতা আছে, মূল্যবোধ ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে, যাঁদের ওপর আস্থা রাখা যায়, যাঁদের সঙ্গে সংগঠনভুক্ত হয়ে কাজ করা যায়, তেমন মার্ক্সবাদী কোথায়?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাউন্টার-রেনেসাঁসরূপে দেখা দেয় আধুনিকতাবাদ (modernism); এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনতিপরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে কাউন্টার-রেনেসাঁসরূপে দেখা দেয় উত্তরাধুনিকতাবাদ (postmodernism)। মানবতাবিরোধী মানব পরিস্থিতিতে এসবের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী শিক্ষিত লোকদের মনোজগতে বিরাজ করছে শূন্যবাদ (nihilism) কিংবা নৈরাশ্যবাদ (pessimism)। কায়েমি স্বার্থবাদীরা অবশ্য সর্বত্র নিজেদের আশাবাদী বলে আত্মপরিচয় দিয়ে চলেছেন।

৪. মার্ক্সবাদের অনুশীলন ও ভবিষ্যৎ

আজ পরিবর্তিত বাস্তবতায়, গতানুগতিক চিন্তার বাইরে গিয়ে, পক্ষপাতমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, মার্ক্সবাদী নেতা-কর্মীদের সংগঠনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি মার্ক্সবাদের প্রয়োগযোগ্যতা বিচার করা হয়, তাহলে কী দেখা যায়? মার্ক্স ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারাকে পরিণত করা হয়েছে ধর্মে। মার্ক্স-এঙ্গেলস চেয়েছিলেন তাঁদের চিন্তাধারা বিজ্ঞানসম্মতরূপে বিকাশশীল ও কার্যকর থাকুক। তাঁরা কখনো চাননি তাঁদের

চিন্তাধারা অপরিবর্তনীয় ডকট্রিন, কিংবা ডগমা, কিংবা ক্রিড, কিংবা রিলিজিয়নে পরিণত হোক। ১৯৬০-এর দশকে দেখা গেছে, মার্ক্স-এঙ্গেলসের মতাদর্শকে 'মার্ক্সবাদ', 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ', 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং চিন্তাধারা' ইত্যাদি নামে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নানা ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। কোনো ধর্মের ইতিহাসে ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে যা কিছু দেখা যায়, মার্ক্সবাদের ইতিহাসেও তা-ই দেখা গেছে। মার্ক্সবাদীরা তাঁদের বিরুদ্ধ শিবিরের অভিজ্ঞতা থেকে, আবিষ্কার-উদ্ভাবন থেকে কিছুই শিখতে চাননি, জানতেও চাননি। মস্কোর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র লন্ডন ও ওয়াশিংটন চালিয়ে যাচ্ছিল, মস্কো তা অল্পই বুঝতে পেরেছিল। লন্ডন ও ওয়াশিংটন কিন্তু মস্কো ও পিকিংয়ের খবর সব সময় যথাসম্ভব সংগ্রহ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে।

যেসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতায় যায়নি, সেগুলোতে দেখা গেছে পার্টি মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও সে-তুংয়ের উক্তিকে দেশ-কালনিরপেক্ষ অভ্রান্ত সত্য মনে করে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছে। ওই মনীষীদের ভাব বা চিন্তা অবলম্বন করে নেতা ও কর্মীরা নিজ নিজ দেশ-কালের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায় কাজ করতে নেমেছেন। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সে-তুংয়ের বক্তব্য অবলম্বন করে তাঁরা নিজ নিজ দেশের বাস্তবতায় কাজ করেছেন। ওই মনীষীরা কোন অবস্থায় কোন প্রয়োজনে কখন কোন কথা বলেছিলেন, মার্ক্সবাদীরা তা বিবেচনা না করে তাঁদের বক্তব্যকে দেশ-কালনিরপেক্ষ চিরন্তন সত্য গণ্য করে ভিন্ন দেশ-কালে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।

দুনিয়াব্যাপী মস্কোপন্থীরা মস্কোর পক্ষে এবং পিকিংপন্থীরা পিকিংয়ের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন এবং কাজ করেছেন। মস্কো ও পিকিংকে বিরূপ সমালোচনা থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা তৎপর থেকেছেন। অনেকে কৌতুক করে বলেছেন, 'এরা মস্কোতে বৃষ্টি পড়লে ঢাকায় বসে ছাতা ধরে', 'ওরা পিকিংয়ে বৃষ্টি পড়লে ঢাকায় বসে ছাতা ধরে।' এটা মার্ক্সবাদের সম্পূর্ণ ভাববাদী অনুশীলন। এতে কেবল ব্যর্থতার পর ব্যর্থতাই দেখা গেছে। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, মাওয়ের মত অনুযায়ী—প্রতিটি দেশের কমিউনিস্টদের কর্তব্য, নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উপলব্ধি করে কর্মসূচি ও কর্মনীতি নির্ধারণ করা। তারপর সেই কর্মসূচিকে ওই মনীষীদের দ্বারা প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা এবং প্রয়োজন হলে পরিমার্জন করে কর্মসূচিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া। বস্তুবাদী দ্বন্দ্বদর্শনের এই নীতি অবলম্বন না করে তাঁরা যা করেছেন, তা অবশ্যই মার্ক্সবাদের সম্পূর্ণ ভাববাদী অনুশীলন।

যেসব দেশে মার্ক্সবাদী বিপ্লব সম্ভব হয়নি, সেগুলোতে মার্ক্সবাদীরা সমালোচনাকে মনে করেছেন বিরোধিতা কিংবা শত্রুতা। গঠনমূলক সমালোচনাকেও তাঁরা

বিবেচনায় নেননি। সমালোচনা-আত্মসমালোচনার গুরুত্ব তাঁরা বুঝতেই চাননি। প্রায়ই তাঁরা তত্ত্বজ্ঞানে আচ্ছন্ন মন নিয়ে কাণ্ডজ্ঞানের পরিপন্থী কাজ করেছেন। চিন্তার বেলায় দ্বন্দ্বমূলক প্রগতির নীতি কমই অনুসৃত হয়েছে।

তাঁরা সব সময় অ্যান্টি-থেসিস অবলম্বন করে প্রতিবাদী ও নেতিবাদী (negativist) আন্দোলনে ব্যস্ত থেকেছেন; থেসিস কিংবা সিনথেসিস অবলম্বন করেননি। অথচ থেসিস কিংবা সিনথেসিস অবলম্বন করে কাজ করাই মার্ক্সবাদসম্মত, কেবল অ্যান্টি-থেসিস অবলম্বন করে কাজ করা অবশ্যই মার্ক্সবাদবিরোধী—সেটা প্রতিবিপ্লবীদের কাজ।

বাংলাদেশে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে অভিহিত বিপ্লববাদী কোনো কোনো দলে স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ কার্যকর ছিল। সূর্যসেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের (১৯৩০) পর, ব্রিটিশ সরকারের কর্মনীতির কারণে এই বিপ্লববাদীরা যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, তখন বিবেকানন্দের ত্যাগের আদর্শ কমিউনিস্ট পার্টিতেও বিস্তৃত হয়। বিপ্লববাদী সংগঠনে ও কমিউনিস্ট পার্টিতে ত্যাগ ব্যাপারটিকে করে তোলা হয় উদ্দেশ্য (end), ব্যাপারটিকে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় (means) রূপে রাখা হয়নি। বাংলা ভাষার দেশে ত্যাগ কথাটি মার্ক্সবাদীদের দ্বারা ক্রমাগত নানাভাবে মহিমান্বিত হয়েছে। ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে যে একেকজন মার্ক্সবাদী পরিণত হয়েছেন একেকজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীতে। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্টদের জন্য বিয়েশাদিও নিষিদ্ধ ছিল। কমরেড মণি সিংহ অনেক চেষ্টা করে পার্টির অনুমতি নিয়ে বিয়ে করেছিলেন। সেটা ছিল ব্যতিক্রম ঘটনা। কমরেড সত্যেন সেন, কমরেড রণেশ দাশগুপ্ত, কমরেড জিতেন ঘোষ, কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, কমরেড আবদুল হক, কমরেড দেবেন সিকদার প্রমুখের পরিচালনায় কাজ করতে গিয়ে আমার এ রকমই ধারণা হয়েছে। নিষ্কাম, আত্মনিগ্রহমূলক ত্যাগকে মহিমান্বিত করা ও লক্ষ্যে পরিণত করা মার্ক্সবাদবিরোধী ও নৈতিকতাবিরোধী।

জীবনপঞ্জি নিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, শুরু থেকেই বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চপর্যায়ের বেশ কিছু সদস্য কৈশোরকাল থেকেই ছিলেন অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নানা কারণে তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিকৃত হয়েছিল। তাঁদের প্রভাবে পার্টি বছরের পর বছর ধরে, দশকের পর দশক ধরে, ভুল, অস্বাভাবিক ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিপন্থী কর্মনীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ভারতে সিপিআই কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে কংগ্রেসের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিজের সত্তা হারিয়েছে। দলটি পরিচিত হয়েছে কংগ্রেসের লেজুড় বলে। বাংলাদেশে সিপিবি আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিজের সত্তা হারিয়েছে। সিপিবি পরিচিত হয়েছে আওয়ামী লীগের লেজুড় বলে।

১৯৭৫ সালে হঠাৎ বাকশাল গঠনের দ্বারা আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মর্মান্তিক পরিণতির মুখোমুখি হলো কেন? বাকশাল গঠনে ও 'দ্বিতীয় বিপ্লবে' শেখ মুজিবুর রহমানের সাথি ও সহায়ক কারা ছিলেন? বাকশাল তিনি সম্পূর্ণ একলা করেছিলেন—এ কথা কতখানি ঠিক? নেতৃত্বকালে সব সময় সব সিদ্ধান্ত কি তিনি একলাই নিতেন? বাকশাল গঠনে কমরেড মণি সিংহ তো ছিলেন শেখ মুজিবের সাথি হিসেবে।

১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে দুনিয়াব্যাপী মার্ক্সবাদীদের দেখা গেছে মস্কোপন্থী, পিকিংপন্থী, নকশালপন্থী, তিরানাপন্থী, মার্ক্সবাদী, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী, লেনিনবাদী, মাওবাদী, ইউরো-কমিউনিস্টস, নিও-মার্কসিস্টস ইত্যাদি ধারায় বিভক্ত। প্রতিটি ধারাই কেবল নিজেদের ধারাকে ঠিক মনে করেছে এবং অন্য সব ধারাকে ভুল বলেছে। কোনো কোনো ধারা অন্য কোনো কোনো ধারাকে সরকারের দালাল, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, সিআইএর দালাল ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করেছে। আপন সত্তা ভুলে গিয়ে বিদেশি কোনো পন্থার পন্থী হওয়া এবং সেই পরিচয় নিয়ে চলা—এর মধ্যে রয়েছে চরম মানসিক দীনতার পরিচয়।

বোধ-বুদ্ধির ও চিন্তার কিছু ধারা ছিল সম্পূর্ণ গোপন সশস্ত্র বিপ্লববাদী। এই ধারায় যাঁরা মার্ক্সবাদী বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা গণসংগঠন বিলুপ্ত করে কেবল গুপ্ত সংগঠন অবলম্বন করে কাজ করেছেন। কোনো কোনো গুপ্ত সংগঠন শ্রেণিশত্রু খতমের লাইন অবলম্বন করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা তাদের প্রতিপক্ষ মার্ক্সবাদীদেরও আদর্শগত শত্রু গণ্য করে প্রাণদণ্ড দিয়েছে। কোনো কোনো সশস্ত্র ধারা নিজেদের দলের ভেতরে অনৈক্য দেখা দিলে দলেরই কারও কারও বিরুদ্ধে আদর্শ-বিচ্যুতির কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে দলীয় বিধি অনুযায়ী প্রাণদণ্ড দিয়ে তা কার্যকর করেছে। এভাবেও কোনো কোনো দলের বেশ কিছু নেতা-কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। সরকারি দলের ও পুলিশের অত্যাচার তো ছিলই।

মার্ক্সবাদীরা দলীয় ঐক্য রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন এবং বারবার দল ভেঙেছেন। দলের মধ্যে নেতৃত্বের সমস্যার সমাধান তাঁরা অল্পই করতে পেরেছেন। দলকে ভুল পথগামী করার জন্য, দলে বিভেদ সৃষ্টির জন্য, দলকে দুর্বল করার জন্য কখনো কখনো সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর লোক, এমনকি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গুপ্তচর, দলের কর্মী হয়ে দলের নেতৃত্বে ঢুকে গিয়ে দলের সীমাহীন ক্ষতি করেছে।

মার্ক্সবাদী বিভিন্ন দল ও গ্রুপ তাদের কর্মীদের পড়ার জন্য যে পুস্তকের তালিকা দিয়েছে, তাতে কেবল মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও সে-তুংয়ের কিছু বই ও লেখার নাম থেকেছে। কোনো কোনো গ্রুপ এগুলোর সঙ্গে স্টালিনের কিছু লেখার নামও যুক্ত করেছে। তালিকায় দলের বা গ্রুপের নেতার লেখাও থেকেছে। এসবের বাইরেও যে পার্টির নেতা-কর্মীদের পড়ার, জানার ও বোঝার মতো অনেক বই ও লেখা দরকার,

তার কোনো স্বীকৃতি কোনো দলে বা গ্রুপেই থাকেনি। স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গেও পার্টির কর্মীদের পরিচিত করা হয়নি। পার্টির নেতারা কর্মীদের মনকে কঠোরভাবে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন নির্দিষ্ট কিছু ধারণার মধ্যে। পার্টির কোনো পর্যায়েই চিন্তার স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের (democratic centralism) কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে পার্টিতে কেবল কেন্দ্রীকরণ ও কর্তৃত্ববাদই দেখা গেছে, গণতান্ত্রিক কিছু দেখা যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভালো অনেক কিছু করা হলেও ৭৫ বছর রাষ্ট্রটি টিকে ছিল পুলিশি ব্যবস্থার ওপর। রাষ্ট্র সম্পর্কে লেনিনের *স্টেট অ্যান্ড রেভল্যুশন* বইতে এবং পরবর্তী আরও দুটি লেখায় যে বক্তব্য আছে তা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ও রাষ্ট্র বিলুপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা ও কাজ বাস্তবসম্মত হয়নি। স্টালিন এই চিন্তাধারা নিয়েই এগিয়েছিলেন, বিশ্বাসের বন্ধন অতিক্রম করে সৃষ্টিশীল যেকোনো প্রবণতাকে দমন করেছেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে এ রকম ধারণা নিয়ে আর এগোনো যাবে না।

চার দশক ধরে কোনো কোনো মহলে আন্তোনিও গ্রামসির চিন্তা অবলম্বন করে নিম্নবর্গের জন্য রাজনৈতিক তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। গ্রামসিপন্থীরা মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, মাওয়ের চিন্তার বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করেন। অবশ্য কখনো কখনো তাঁরা মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওয়ের নামও উল্লেখ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতদের একাংশে গ্রামসির চিন্তাধারার অনুসারী ড. রণজিৎ গুহের চিন্তার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। গ্রামসির চিন্তাধারায় মানবিক সম্পর্কের মনোগত কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, যা অন্য মার্ক্সবাদীদের চিন্তায় অল্পই আছে। জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতিরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদের বিবেচনা বাদ দিয়ে গ্রামসিপন্থীরা যে রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার করেন, তাতে সর্বাঙ্গীণ রাষ্ট্রচিন্তার অভাব আছে। এটা এখনো বাস্তব রাজনৈতিক অনুশীলনের আদর্শে রূপ নেয়নি। গ্রামসির চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্ব পায় এনজিও ও সিএসও মহলে। ইউরোপের কোনো কোনো রাষ্ট্রে গ্রামসিপন্থী রাজনৈতিক প্রচেষ্টা আছে। আজকের পৃথিবীতে যে আদর্শগত শূন্যতা বিরাজ করছে, তা পূরণে গ্রামসিপন্থীদের আগ্রহ দেখা যায় না। গ্রামসিপন্থীদের চিন্তারও কোনো বিকাশ দেখা যায় না।

৫. বাংলাদেশে মার্ক্সবাদের অনুশীলন

বাংলাদেশে মার্ক্সবাদী রাজনীতির অবস্থা বর্ণনা করে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝিতে কমরেড দেবেন শিকদার *কমিউনিস্ট জাহাজগুলিকে জলে ভাসাইবেন কারা?* নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, এ দেশে ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ আমলেও কোনো মার্ক্সবাদী পার্টি বা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠেনি। প্রথম জীবনে তিনি যুগান্তর দলের কর্মী ছিলেন,

পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬০-এর দশকের শেষে তিনি পিকিংপন্থী ধারায় সক্রিয় ছিলেন এবং পরবর্তী ভাঙা-গড়ার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কিছু আগে থেকে তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সে-তুং চিন্তাধারা অবলম্বন করে স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন দল গঠনে সক্রিয় থাকাকালে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং চিন্তাধারা অবলম্বন করে দল গঠনে সক্রিয় ছিলেন। ওই পুস্তিকায় ১৯৮০-র দশকের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের একেকটি কমিউনিস্ট পার্টি চরে আটকে যাওয়া একেকটি জাহাজের মতো অবস্থায় পড়েছে। কমরেড দেবেন শিকদার কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত সিপিবি থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পার্টির প্রধানের নামসহ ৪০টি কমিউনিস্ট পার্টির নাম-ঠিকানা উল্লেখ করেছেন এবং শেষে এদের বাইরেও নতুন পার্টি গঠনের দুটি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, 'কার সাধ্য এই চরে আটকে যাওয়া কমিউনিস্ট জাহাজগুলিকে জলে ভাসাইবেন?' এর চার-পাঁচ বছর পরে ৯০ বছরেরও বেশি বয়সে তিনি মারা যান। এর মধ্যে বাংলাদেশের গতিহীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কোনোটি কি গতিশীল হয়েছে? বৃদ্ধ বয়সে কমরেড দেবেন শিকদার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগে নতুনভাবে সঠিক মার্ক্সবাদী পার্টি গড়ে তোলার। তাঁর আগে এবং পরেও কেউ কেউ, চলমান মার্ক্সবাদী আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করে, চেষ্টা করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি বা সাচ্চা মার্ক্সবাদী পার্টি গড়ে তুলতে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি। শতাব্দীকাল ধরে কেন এমন হয়েছে? বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক দিকে আছে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ধারা, অপর দিকে আছে বিপ্লববাদী ও কমিউনিস্ট ধারা। এসবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ধারায় জাতির রাজনৈতিক চরিত্রের যে পরিচয় ফুটে ওঠে, তা কতখানি গৌরবজনক?

বাংলাদেশের রাজনীতিকে উন্নত করতে হলে মার্ক্সবাদীদের এবং মার্ক্সবাদীদের বাইরে যেসব দল আছে সেগুলোর বর্তমান রাজনৈতিক চরিত্র, অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। কী করে বাংলাদেশকে জনগণের শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা যাবে, সেটাই মূল প্রশ্ন। এখন বাংলাদেশকে আত্মনির্ভর, স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার কোনো প্রচেষ্টাই খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁরা জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক, কিন্তু পছন্দগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক, কিংবা যাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ওই সব রাষ্ট্রের নাগরিক করেছেন, বাংলাদেশকে রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার মানসিকতা তাঁদের কতখানি আছে?

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির (১৯৯১) পর বিভিন্ন দেশের মার্ক্সবাদীদের ভূমিকা দেখে মার্ক্সবাদ নিয়ে লোকের উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে গেছে এবং পার্টি ও গ্রুপের সংখ্যাও কমেছে। তা সত্ত্বেও এখনো বাংলাদেশে মার্ক্সবাদী বলে আত্মপরিচয় দেন এমন নেতা-কর্মী ও গ্রুপের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তা ছাড়া কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা মার্ক্সবাদী বলে আত্মপরিচয় দেন এবং কাজ করেন বিশ্বব্যাংকের কর্মনীতির বিশ্বস্ত অনুসারীরূপে। অনেক মার্ক্সবাদীই সিএসওতে ও এনজিওতে কর্তাব্যক্তিরূপে সক্রিয়। তাঁদের কাজ করতে হয় সাম্রাজ্যবাদীদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য।

বাংলাদেশে এখন যেসব মার্ক্সবাদী পার্টি ও গ্রুপ আছে, এ দেশের প্রায় শতবর্ষের মার্ক্সবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে সেগুলোর চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রম দেখলে সেগুলোকে সম্ভাবনাময় মনে করার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। দুনিয়াব্যাপী যে আদর্শগত শূন্যতার কথা এই আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি, মার্ক্সবাদ দিয়ে তা পূরণের কোনো সম্ভাবনা কি দেখা যায়? মার্ক্সবাদীদের মধ্যে কর্মতৎপরতা কিছু দেখা গেলেও চিন্তা-ভাবনার ও কর্মপদ্ধতি পুনর্গঠনের বা নবায়নের বা সৃষ্টিশীলতার প্রবণতা দেখা যায় না।

৬. পরিবর্তিত বাস্তবতায় গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

তথ্যপ্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তির বিপ্লব, অন্যান্য প্রযুক্তির ও জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগান্তকারী অগ্রগতি আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপ ইত্যাদি কারণে দুনিয়াব্যাপী বাস্তব অবস্থা ও মানুষের মনমানসিকতা বদলে গেছে। কিন্তু জনস্বার্থে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার যে পুনর্গঠন ও নবায়ন দরকার, তা করা হয়নি। উৎপাদন ও সম্পদ বাড়ছে, পাশাপাশি অন্যায় বাড়ছে, ন্যায় কমছে। মানুষ মানবিক গুণাবলি হারিয়ে চলেছে। সভ্যতা, প্রগতি ও ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মানুষের কৌতূহল প্রায় লোপ পেয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এখন প্রায় সব ব্যাপারে অসহায়, নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব, ঘুমন্ত। তবে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তহীন স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা সৃষ্ট হুজুগে মাতে, ভাঁওতায় সাড়া দেয়। কায়েমি স্বার্থবাদীরা প্রায় সর্বত্র নতুন সব প্রযুক্তির মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। সব রাজনৈতিক আদর্শ হয়ে পড়েছে অকেজো। গণতন্ত্রে গণতন্ত্র নেই, সমাজতন্ত্রে সমাজতন্ত্র নেই, জাতীয়তাবাদে জাতীয়তাবাদ নেই, আন্তর্জাতিকতাবাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বিশ্বায়নের মতবাদ, যা সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। নেতিবাদ (negativism), শূন্যবাদ (nihilism) ও নৈরাশ্যবাদ (pessimism) দখল করে নিয়েছে রেনেসাঁসের ও আশাবাদের (optimism) স্থান। দুনিয়াব্যাপী সমাজে লোভ ও ভয় মানুষের চালিকাশক্তি, নৈতিক চেতনা নিষ্ক্রিয়।

পরিবর্তিত এই বাস্তবতায় শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের মুক্তির সমস্যা হয়ে পড়েছে অনেক বেশি জটিল। মুক্তি কি তারা চায়? সব রাষ্ট্রেই তাদের মুক্তির চেতনা ঘুমন্ত।

অপর দিকে উচ্চশ্রেণির লোকেরা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি জাগ্রত, সক্রিয় ও শক্তিশালী। বাস্তব অবস্থা এমন যে উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনো সামাজিক শক্তির পক্ষেই এখন আর্থসামাজিক-রাষ্ট্রিক কোনো পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে উচ্চশ্রেণির অবস্থা বিভিন্ন রকম। কোনো রাষ্ট্রেই উচ্চশ্রেণির সবার মানসিকতা এক রকম নয়। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিলে প্রতিটি রাষ্ট্রের উচ্চশ্রেণির বৃহত্তর অংশ সংগ্রামের প্রতি কমবেশি সহানুভূতিশীল হবে বলে আশা করা যায়। দুর্বলেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হতে পারে। তাতে পর্যায়ক্রমে ন্যায় বাড়ানো ও অন্যায় কমানো সম্ভব। যারা সম্পূর্ণরূপে কায়েমি স্বার্থবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থান্ধ অনুসারী, কেবল তাদের থেকে প্রগতিশীল কিছু আশা করা যায় না।

পরিবর্তিত বাস্তবতায় চলমান গণতন্ত্র, চলমান সমাজতন্ত্র, চলমান মার্ক্সবাদ, চলমান জাতীয়তাবাদ, চলমান বিশ্বায়ন ইত্যাদির কোনোটিই জনগণের উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার কিংবা উন্নত জীবনের অবলম্বন হতে পারে না। বিশ্বায়ন নামে যে কার্যক্রম জি-সেভেন, ন্যাটো, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘ চালাচ্ছে, তা সভ্যতার পরিপন্থী। বিশ্বায়নের মর্মে আছে নিওলিবারেলিজম বলে অভিহিত বৈশ্বিক আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণই কায়েমি স্বার্থবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের ধারক। এই বাস্তবতায় পৃথিবীর জাতিগুলোর জন্য এবং গোটা মানবজাতির জন্য প্রগতিপ্রয়াসী নতুন আদর্শ উদ্ভাবন করতে হবে। আদর্শ ছাড়া, আদর্শের কিংবা ধর্মের নাম ব্যবহার করে যেভাবে পৃথিবীর জাতিগুলোকে এবং বিশ্বব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হচ্ছে, তা মানবজাতির জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। জনগণের মুক্তির জন্য আজ নতুন আশাবাদ, নতুন আদর্শ, নতুন সংঘশক্তি, নতুন কর্মসূচি ও কর্মনীতি উদ্ভাবন ও অবলম্বন করতে হবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি নিয়ে অন্তত ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে হবে এবং অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে করণীয় স্থির করতে হবে। প্রয়োজনীয় নতুন আদর্শ উদ্ভাবন ও অবলম্বন করে চলমান বাস্তবতাকে পেছনে ফেলে উন্নত নতুন ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হতে হবে। এর জন্য সক্রিয়তা দরকার।

মার্ক্সবাদের ধারণা ও অনুশীলন এখন যেমন চলছে, তা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি ও শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব কিংবা মানবজাতির সমৃদ্ধিমান প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ কোনো কালেই সম্ভব হবে না। যে অচলতা বিরাজ করছে, তা কাটানোর জন্য সমন্বয়ের (systhesis) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আদর্শগত ও অনুশীলনগত প্রতিটি বিষয়ের মূলগত পুনর্বিবেচনা ও পুনর্গঠন লাগবে। সভ্যতার বিকাশে ধর্মের ভূমিকাও বিচার

করতে হবে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ১৯৮০-র দশক থেকে ইসলামপন্থীদের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থীরা যে বিরোধে মত্ত, তাতে লিপ্ত হয়ে মার্ক্সবাদীরা নিজেদের আদর্শগত সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন।

চিন্তায় কেবল অবরোহ (deductive) পদ্ধতি নিয়ে হবে না; আরোহ (inductive) পদ্ধতি অবলম্বনে আরম্ভ করে প্রয়োজনমতো অবরোহ পদ্ধতিতে যেতে হবে। বাস্তব অবস্থা বিচার করে, তথ্য অবলম্বন করে সত্য নির্ণয় করতে হবে। আরোহ পদ্ধতির কথা ভুলে গিয়ে মার্ক্সবাদের নীতিগুলোকে কার্যক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতির মতো অন্ধভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল করা হয়েছে।

৭. মার্ক্সবাদের মর্মবস্তু ও প্রয়োগ

আমাদের দেশে এবং আরও যেসব দেশে মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি, সেগুলোতে মার্ক্সবাদীদের দেখা যায়, বস্তুবাদকে মনে করেছেন নাস্তিকতা আর ভাববাদকে মনে করেছেন আস্তিকতা। কার্যক্ষেত্রে এ দেশে মার্ক্সবাদীরা পরিচিত হয়ে আছেন ইসলামবিরোধী ও নাস্তিকতা-প্রচারক বলে। ১৯৮০ সালের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারিত 'মৌলবাদের ধারণা' গ্রহণ করে এবং মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে মার্ক্সবাদীরা মুসলমান সমাজের বিরাগভাজন হয়েছেন। একই সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারিত নারীবাদের ধারণা গ্রহণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদ-পরিচালিত পুরুষতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হয়েও মার্ক্সবাদীরা আত্মপরিচয় হারিয়েছেন। নারীবাদী আন্দোলনের ফলে নারী নির্যাতন যে কমেছে, তা দেখা যায় না; বাস্তবে নানা কারণে নারী নির্যাতন অনেক বেড়েছে। বেকার সমস্যার এই দেশে মেয়েরা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি খুঁজতে গিয়ে এবং চাকরি করতে গিয়ে অনেক সময় দেহদানে বাধ্য হয়। পরিবার ক্ষয়িষ্ণু। পরকীয়-পরকীয়া, সোশ্যাল গার্ল, ফ্রি সেক্স রিলেশন, সাময়িক লিভ টুগেদার, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের পর হত্যা, আত্মহত্যা, ড্রাগ, নেশা ইত্যাদি এখন দ্রুত বাড়ছে। প্রসটিটিউশন কমছে। ফেসবুকের অপব্যবহার দ্বারাও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে। জাতীয় জীবনে কাম-ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো জাতির মধ্যেই কোনো চিন্তা নেই। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় নীরব। বাংলাদেশে এনজিও ও সিএসও মহলে দায়সারা কিছু প্রচারকাজ দেখা যায়। জাতীয় সংসদ সম্পূর্ণ নীরব। সব জাতির মধ্যেই কি এমন ঘটছে? অদূর ভবিষ্যতে পরিবার কি বিলুপ্ত হবে? মানুষের সমাজে কোনো রকম কাম-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন থাকবে না? বনের পশুর মতো স্বতঃস্ফূর্ত যৌন সম্পর্ক নিয়ে মানুষ কি ভালোভাবে চলতে পারবে? কাম-ব্যবস্থাপনা না থাকলে কি প্রেম থাকবে? প্রেম না থাকলে শুধু কাম থাকলে জীবন কেমন হবে? সন্তানাদির প্রশ্ন আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্ন আছে। উচ্চ ও উচ্চ-মধ্য শ্রেণির নারীদের ক্ষমতায়ন অবশ্য বেড়েছে। ক্ষমতায়ন মানে

রাজনীতিতে, প্রশাসনে, বিচারব্যবস্থায় ও শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ পদ লাভ। এই অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন ব্রিটিশ আমলের শেষ দিক থেকেই চলে আসছিল। বুর্জোয়ার জায়গায় পুরুষ আর প্রলেতারিয়েতের জায়গায় নারী বসিয়ে নারীবাদের তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে, আর বুর্জোয়া ব্যাপার বলে মানববাদের (humanism) ধারণাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের ধারণার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে পুরুষ ও নারীর পরিকল্পিত ধারণাকে। মার্ক্সবাদীরা ও এনজিওরা নারীবাদ যেভাবে প্রচার করেছে, তা দ্বারাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের ধর্মবোধ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের উসকানিতে চালানো হয়েছে দুর্নীতিবিরোধী উগ্র সব আন্দোলন, যার সুফল অল্পই দেখা গেছে। প্রচলিত আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে কেবল শাস্তি বিধান করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে ন্যায় বাড়ানোর ও অন্যায় কমানোর কোনো নীতি বা চিন্তা বা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন জাতীয় জীবনে রাজনীতির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে। মানুষ দিশেহারা ও হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। এসবে মত্ত হয়ে মার্ক্সবাদীরা নিজেদের রাজনীতি ও আদর্শ হারিয়েছেন।

সমাজতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য কোনো যুক্তিসংগত চেষ্টা বা আন্দোলন করা হয়নি। এখন কেবল সব দলের জন্য সমান সুযোগ, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আর অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, সব দলের অংশগ্রহণভিত্তিক নির্বাচনের উপায় সন্ধান করা হচ্ছে। নৈতিক চেতনা উন্নত করার এবং সুস্থ-স্বাভাবিক কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে না। বাংলাদেশে মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের কালে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে কাণ্ডকারখানা চালানো হয়েছে, তাতে বিরক্ত হয়ে ক্রমেই মানুষ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ছেড়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকে গিয়েছে। জাতীয়তাবাদী দুই দলেরই—বাঙালি ও বাংলাদেশি—গতি দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের স্থানীয় দূতাবাসগুলোর দিকে, ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের নির্দিষ্ট ডেস্কের দিকে। উচ্চ ও উচ্চ-মধ্য শ্রেণির লোকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাগরিক করে চলেছেন। এনজিও ও সিএসও বিদেশি সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে অবাধে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশের ভূভাগে জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে কীভাবে?

বস্তুবাদ, ভাববাদ ও ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার মধ্যে পড়ে আছেন মার্ক্সবাদীরা। বস্তুবাদ বিকাশশীল মতবাদ। সভ্যতার বিকাশে ধর্মেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সৃষ্টিশীল দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসী ও ভাববাদীও

আছেন। বস্তুবাদ, ভাববাদ ও ধর্ম-সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা পরিহার করে ইতিহাসের ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসব বিষয়ে ধারণাকে নবায়িত করা দরকার। মনে রাখতে হবে, 'কোনো বিষয়ের জ্ঞানই সেই বিষয়ের ইতিহাসের জ্ঞান ছাড়া পর্যাপ্ত ও কর্মোপযোগী হয় না।'

দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বস্তুজগতে যেমন, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের গবেষণাগারে যেমন, মানবসমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বব্যবস্থায় তেমন নয়। মানুষের মন বলে যে ব্যাপারটি আছে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদে অবশ্যই তাকে পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে—যা মার্ক্সবাদীরা প্রায় করেননি। সেভাবে দেখতে গেলেই দেখা যাবে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের প্রচলিত ধারণা নিয়ে আর সামনে এগোনো সম্ভব নয়। বস্তুবাদ, দ্বান্দ্বিক বিকাশতত্ত্ব (dialectics) ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণাকে বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বিকাশশীলরূপে দেখা সমীচীন। যে অবস্থা চলছে, তাতে বস্তুবাদের ধারণার নবায়নের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বিকাশতত্ত্বকেও নবায়িত করা দরকার। রাজনীতির প্রয়োজনে ইতিহাস সম্পর্কেও মার্ক্সীয় ধারণার পুনর্গঠন ও নবায়ন দরকার। মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদীরা মার্ক্সবাদীদের এসব বিষয়ের ধারণা জেনে নিয়ে মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে কাজ করে।

পুঁজি, পুঁজিবাদ, উদ্বৃত্ত মূল্য, শ্রেণি, শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণিচরিত্র, শ্রেণিসংগ্রাম, প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারিয়ান চরিত্র, বুর্জোয়া, বুর্জোয়া-চরিত্র, শ্রেণিচ্যুতি, শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব—এসব বিষয়ের ধারণারও আমূল পুনর্বিবেচনা দরকার। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ পরিহার্য। উদ্বৃত্তমূল্যের অবসান বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। নতুন অবস্থায় পুরোনো অনেক কিছু পরিহার করে এবং নতুন অনেক কিছু গ্রহণ করে এগোতে হবে। মানব প্রকৃতির বিষয়েও প্রচলিত ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। যেসব ধারণা মার্ক্সবাদীদের মধ্যে চালু আছে, সেগুলো নিয়ে একই চক্রে আবর্তিত হওয়া সম্ভব; অগ্রগতি, বৃদ্ধি, প্রগতি অসম্ভব। শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ত্যাগ করতে হবে। শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হলে শ্রেণিসংগ্রামের ধারণাও বদলে যাবে। পুঁজি ও পুঁজিবাদবিষয়ক ধারণারও পুনর্বিবেচনা ও পরিবর্তন দরকার। পুঁজিবাদের চেয়ে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ধনতন্ত্র অনেক বেশি বাস্তবসম্মত কথা। ধারণার পরিবর্তনের জন্য দরকার সৃষ্টিশীল প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। সৃষ্টিবিমুখ, প্রগতিবিমুখ বদ্ধবিশ্বাস নিয়ে কোনো সুফল হবে না।

বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত ও ক্যাপিটালিজমকে কেন্দ্র করে যেভাবে মুক্তিসংগ্রামের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা পরিবর্তন করতে হবে। রাজনৈতিক দল গঠনে গুরুত্ব দিতে হবে এবং দলকে রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। গঠনমূলক চিন্তা বাদ দিয়ে, জনবিচ্ছিন্ন থেকে, রাষ্ট্রক্ষমতায় না গিয়ে কেবল প্রতিবাদী আন্দোলন চালানো কোনো রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি নয়। শ্রেণিকে নয়, প্রতিটি

ঐতিহাসিক কালের জনজীবনের সমস্যাবলিকে কেন্দ্র করে আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনা করে দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করতে হবে এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে কর্মসূচি গ্রহণ করে, পর্যায়ক্রমে দ্বন্দ্ব নিরসনে বা সমস্যাবলির সমাধানে এগিয়ে চলতে হবে। দ্বন্দ্ব দেখতে হবে প্রতিটি ঐতিহাসিক কালের জনজীবনের সমস্যাবলিকে ভিত্তি করে। মুক্তি মানে সমস্যা থেকে মুক্তি। পর্যায়ক্রমে মুক্তি অর্জন করে এগোতে হবে। চিরকালের জন্য সব সমস্যা থেকে একবারে মুক্তি বা মোক্ষ বা পরমার্থ বা নির্বাণ লাভ বাস্তবে সম্ভব নয়। শ্রেণিকেন্দ্রিক ও শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার এখন আর কোনো আবেদন শ্রমিকদের কাছেও নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর মধ্যে নতুন জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি ও নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষের আচরণ বদলে গেছে। পুঁজিবাদের বিলুপ্তিকে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ধরে এখন আর এগোনো যাচ্ছে না। মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির অধীন হয়ে পড়েছে। এই অধীনতা থেকে মানুষকে মুক্ত হতে হবে। এর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি দৃষ্টিকে অনেক প্রসারিত করতে হবে। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার বাড়ানোর ও অপব্যবহার কমানোর উপায় সন্ধান করতে হবে। মার্ক্সবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র কিংবা কোনো নতুন আদর্শ—যা-ই হোক, আদর্শের পুনর্গঠন ও আদর্শ অবলম্বন করতে হবে। জনগণের জন্য আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।

বিপ্লব ব্যাপারটিকেও নতুনভাবে দেখতে হবে। যেকোনো অবস্থায় সহিংস বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে কাজ করা ঠিক নয়। বিপ্লব, বিপ্লবী পরিস্থিতি, বিপ্লবী শক্তি ইত্যাদি ব্যাপারকে গভীরভাবে বুঝে দেখতে হবে। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়েও অবশ্যই বিষয়টিকে বিশ্লেষণের ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তা করতে গেলে বিপ্লব সম্পর্কে আজকের মার্ক্সবাদীদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে। সর্বজনীন কল্যাণে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিপ্লব ও বিবর্তন সম্পর্কে ধারণাকেও পুনর্গঠিত ও নবায়িত করতে হবে। আজকের বাস্তবতায় দরকার চিন্তার জগতে বিপ্লব এবং আদর্শগত পুনর্গঠন ও পরম আশাবাদ সৃষ্টি। দুনিয়ায় নৈরাশ্যবাদের নয়, আশাবাদেরই ভিত্তি আছে। এর মধ্যে কর্মসূচি ও কর্মনীতি ঠিক করে কাজ করতে হবে। একইভাবে সর্বজনীন গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদকে বুঝতে গেলেও প্রচলিত ধারণারাজির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হবে। নতুন বাস্তবতায় পুরোনো চিন্তা ও পুরোনো অভ্যাস নিয়ে চলা যাচ্ছে না।

মার্ক্সবাদীরা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা যেভাবে বলেছেন, তা-ও ভুল। কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, তা নয়। মানবস্বভাবকে বুঝতে চেষ্টা করলেই এটা বোঝা যায়। ইতিহাস প্রমাণ করছে যে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা লাভ করলেই শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব

প্রতিষ্ঠা এবং সব সমস্যার সমাধান হয় না। পর্যায়ক্রমে মুক্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করে মুক্তি অর্জন করতে করতে এগোতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা অনন্তকালের সাধনা ও সংগ্রামের ব্যাপার। সেই লক্ষ্য ত্যাগ করা যাবে না। পর্যায়ক্রমিক মুক্তির ও সংগ্রামের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে হবে।

৮. চাই আদর্শগত সমস্যার সমাধান এবং নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা

ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতির জায়গায় সম্মুখগতি প্রতিষ্ঠা করা প্রকৃতপক্ষেই যাঁদের কাম্য, তাঁদের দরকার নতুন আদর্শগত হাতিয়ার। প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম, প্রচলিত অসাম্প্রদায়িকতা-সাম্প্রদায়িকতা, প্রচলিত গণতন্ত্র, প্রচলিত সমাজতন্ত্র, প্রচলিত মার্ক্সবাদ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের স্থানীয় দূতাবাসমুখী জাতীয়তাবাদ দিয়ে কোনো সুফল হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জি-সেভেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্বব্যাংক, ন্যাটো ও জাতিসংঘের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী নব্য-উদারতাবাদী বিশ্বায়নের বদলে আন্তরাষ্ট্রিক ফেডারেল বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠা করে জনস্বার্থে বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। তার জন্য আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ অবলম্বন করতে হবে। জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয় সরকার থাকবে, সেই সঙ্গে থাকবে বিশ্বসরকার। বিশ্বসরকার হবে জাতীয় সরকারগুলোর ঊর্ধ্বতন এক সরকার। বিশ্বসরকারের কাছে একটি সেনাবাহিনী রেখে সব রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করতে হবে। বিশ্বসরকারের কাছে কেবল আন্তরাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির এবং বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব থাকবে—বাকি সব দায়িত্বই থাকবে জাতীয় সরকারের বা জাতিরাষ্ট্রের সরকারের কাছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং নৈতিক উন্নতির কাজেও জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতার জন্য বিশ্বসরকার দায়িত্ব পালন করবে। জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশশীল থাকবে। মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদীরা বা বিশ্বায়নবাদীরা জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের ঘোর বিরোধী।

জনগণের দিক থেকে দুনিয়াব্যাপী শান্তির জন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং প্রস্তাবিত নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন (intellectual movement) দরকার। কোনো রাষ্ট্রের সরকারই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবে না। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভেতর থেকে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। সংগ্রামের ধারায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্বসরকার-বিষয়ক চিন্তাধারাকে বিকশিত করতে হবে। নতুন কালের মুক্তিসংগ্রামে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের এবং রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো মানে অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নয়। সৃষ্টিশীলতা অপরিহার্য। বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন কী করেছে,

কী করছে, কেন কীভাবে তারা বদলে গেল, তা থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পথ ও বিপথের পার্থক্য বুঝে পথ চলতে হবে।

দুনিয়াব্যাপী জাতিরাষ্ট্র পুনর্গঠনের জন্য প্রচলিত উদার গণতন্ত্রের পরিবর্তে গ্রহণ করতে হবে সর্বজনীন গণতন্ত্র বা শতভাগ মানুষের গণতন্ত্র। তাতে গণভিত্তিক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলকে এবং রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্র মানে কেবল সরকার নয়; ভূভাগ, জনগণ, সরকার, সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক দল (সবকিছু)। সর্বজনীন গণতন্ত্রে জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে জনগণের ভোটে দলভিত্তিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা। রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট মেয়াদে জনগণের কাছে জনগণের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির কর্মসূচি প্রচার করে দলীয় অঙ্গীকার ঘোষণা করবে। দল উন্নত রাজনৈতিক চরিত্র অর্জনের লক্ষ্যে কর্মসূচি ও কার্যক্রম অবলম্বন করবে। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও আদর্শ উদ্ভাবনের জন্য অবলম্বন করতে হবে আদর্শগত-প্রগতির নীতি। থেসিস-অ্যান্টিথেসিস-সিনথেসিসের চিন্তনপ্রণালি অবলম্বন করে এগোতে হবে—প্রয়োজন অনুযায়ী হয় থেসিস, না হয় সিনথেসিস অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। যেসব দেশে মার্ক্সবাদী বিপ্লব সম্ভব হয়নি, সেসব দেশে মার্ক্সবাদীরা কাজ করেছেন কেবল অ্যান্টিথেসিস অবলম্বন করে। যাঁরা উন্নততর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা কামনা করেন, তাঁদেরকে আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করে নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। রাজনৈতিক দলের কোনো বিকল্প নেই। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের এবং নারী ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর উন্নতির জন্য বাস্তবসম্মত ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। উচ্চশ্রেণির ভূমিকা বুঝতে হবে এবং উন্নত নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে তাদেরও যথাসম্ভব মর্যাদা দিয়ে সঙ্গে নিতে হবে। যারা বিদেশের দালাল, তাদের দূরে রাখতে হবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি সমস্যার সমাধান ও উন্নতির উপায় করা না হয়, তাহলে সংকট ঘনীভূত হবে এবং সহিংস কর্মকাণ্ড দেখা দেবে।

দল পরিহার করে, সরকারকে দুর্বল করে, উদারনীতিবাদ, বহুত্ববাদ, বিরাজনৈতিকীকরণ (নৈরাজ্যবাদ) অবলম্বন করে সামাজিক বা নাগরিক আন্দোলন দিয়ে ভালো কিছু করা যায় না। নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনবিমুখ চিন্তার বদলে চাই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনমূলক চিন্তাধারা। বহুত্ববাদের বদলে চাই বহুত্বমূলক ঐক্য কিংবা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বহুত্ব বা বৈচিত্র্য আর ঐক্য—দুটিতেই যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। নেতিবাদ, শূন্যবাদ ও নৈরাশ্যবাদের জায়গায় চাই আশাবাদ। অশুভবুদ্ধির কর্তৃত্বের জায়গায় চাই শুভবুদ্ধির কর্তৃত্ব। দৃঢ়তার সঙ্গে অশুভ বুদ্ধিকে দমন করে রাখতে হবে।

কেবল চিন্তা দিয়ে হবে না, কাজ করতে হবে। চিন্তা ও কাজ দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যখন যেখানে যেটার প্রয়োজন বেশি, তখন সেখানে সেটাতে বেশি গুরুত্ব

দিতে হবে। জনসাধারণ ঘুমিয়ে আছে বটে কিন্তু জাগবে। আশাবাদ সৃষ্টি করা গেলে পরিবর্তনবিমুখ মানুষ উন্নততর নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য পরিবর্তন সাধনে উন্মুখ হয়ে উঠবে। চাই নতুন জীবন এবং নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন উদ্যম, দৃঢ় সংকল্প ও কাজ।[১]

একটি ব্যক্তিগত কথা : ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকেই স্কুলে পড়ার সময় আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। তখন আমাদের দেশেও মস্কোর বিরুদ্ধে প্রচার ছিল ব্যাপক। ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে মার্ক্স-এঙ্গেলসের নির্বাচিত রচনাবলি, সেই সঙ্গে তাঁদের আরও কিছু লেখা, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে লেনিনের লেখা, লেনিনের *স্টেট অ্যান্ড রেভল্যুশন*, *ম্যাটেরিয়েলিজম অ্যান্ড এম্পেরিও-ক্রিটিসিজম*, সেই সঙ্গে আরও কিছু লেখা, স্টালিনের *লং লিভ দ্য ভিক্টোরি অব লেনিনিজম*, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কিছু লেখা এবং মাও সে-তুংয়ের রচনাবলি আমি নিবিষ্টচিত্তে পড়েছিলাম। গোর্কি ও লু সুনের কিছু লেখাও পড়েছিলাম। আমাদের দেশের ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দল-উপদলের মার্ক্সবাদীদের কিছু লেখাও পড়েছিলাম। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে মাও সে-তুংয়ের অনেক লেখা আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি। আমার রচনাবলিতে এর প্রভাব আছে। মাও সে-তুংয়ের লেখা তখন পশ্চিম বাংলায় ও বাংলাদেশে আরও অনেকে অনুবাদ করেছেন। *মাও সে-তুংয়ের জ্ঞানতত্ত্ব* নামে আমার একটি ছোট্ট বই আছে। 'মাও সে-তুংয়ের দ্বন্দ্বতত্ত্ব' নামে আরও একটি বই লেখার ইচ্ছা এখনো আমার আছে। মার্ক্সবাদকে মহান আদর্শরূপে আমি অনুভব করেছিলাম। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের চার বছর আগেই আমি প্রবেশ করেছিলাম। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর বাইরেও, পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে মার্ক্সবাদের প্রভাব আমি লক্ষ করেছিলাম। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তা করতাম। কিন্তু মার্ক্সবাদকে কখনো আমি ধর্মরূপে কিংবা অন্ধবিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিনি। গণসংগঠন বাদ দিয়ে সহিংস গোপন কোনো ধারার প্রতিও আমি কখনো আকর্ষণ বোধ করিনি। আমার আস্থা ছিল গণ-আন্দোলনে ও গণ-অভ্যুত্থানে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহাম্মদ লুতফর রহমান, বেগম রোকেয়া, কাজী আব্দুল ওদুদ, আবু সায়ীদ আইয়ুব, রাসেল, টলস্টয়, এরিখ ফ্রোম, জন ডিউই, হেগেল, ডারউইন, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন প্রমুখের কোনো কোনো লেখা পড়েও আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমি আমাদের দেশের মার্ক্সবাদী প্রায় সব দল-উপদলের নেতা-কর্মীদের কাছে মার্ক্সবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের কথা

প্রায়ই শুনেছি। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের আচরণ ভিন্ন রকম দেখেছি। রিভিশনিজম কথাটি শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়েছি। রাজনৈতিক কোলাহল ও উত্তেজনার মধ্যেও আমার নিঃসঙ্গ অবস্থান ও আদর্শবোধের কথা আমি আমার কোনো কোনো লেখায় ব্যক্ত করেছি। সব সময় আমি দলীয় সংকীর্ণতার, দলাদলির ও পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে সত্যনিষ্ঠ অবস্থানে থাকতে চেয়েছি। এ জন্য সত্যনিষ্ঠা পছন্দ করেন না এমন কিছু লোক সব সময় আমার নিন্দা করেছেন, এখনো করেন। মনে হয় আমার প্রগতিপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা পছন্দ করেন না। এর ফলে পদে পদে ক্ষতি স্বীকার করে আমাকে চলতে হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মার্ক্সবাদ ত্যাগ করে বিপরীত ধারায় চলে যাওয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া এবং বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোর মার্ক্সবাদ ত্যাগ করা ইত্যাদি ঘটনায় মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেকের মতো আমিও উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়েছি। আধুনিকতাবাদ ও নৈরাশ্যবাদ, উত্তরাধুনিকতাবাদ ও শূন্যবাদ, মানবজাতির আদর্শগত বিভ্রান্তি, বিশ্বায়ন ও সভ্যতার সংকট ইত্যাদি বিষয়ে এবং আদর্শগত পুনর্গঠন বিষয়ে আমি মত ব্যক্ত করে আসছি। আমার কোনো কোনো বইতে সেসব বিষয়ে আমার চিন্তার প্রকাশ আছে। চিন্তার সঙ্গে কাজের প্রয়োজন অনুভব করেছি। সব সময় আমি আমার চিন্তার বাস্তবায়ন চেয়েছি। *আটাশ দফা : আমাদের মুক্তি ও উন্নতির কর্মসূচি* নামে একটি বক্তব্য আমি ১২ বছর ধরে পুস্তিকা আকারে প্রচার করে আসছি। এতে বাংলাদেশের বিষয় ছাড়াও সাধারণভাবে জাতিরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির কিছু আগে থেকেই অনেকে আদর্শের দিন শেষ বলে মত প্রকাশ করে আসছেন। এই মত আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আমি ব্যক্তি, জাতি, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য আদর্শকে অপরিহার্য মনে করি। আদর্শহীন অবস্থা দ্বারা কিছু সময়ের জন্য কেবল স্বল্পসংখ্যক কায়েমি স্বার্থবাদী বৈষয়িক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারে; তাতে অধিকাংশ মানুষ সব দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মূল কারণ আদর্শিক শূন্যতা। আদর্শিক শূন্যতা কাটাতে হবে। বর্তমান লেখায় মূলত আমার অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। চিন্তার স্বাধীনতা আমার কাম্য। চিন্তার জগতে আমি এক নিঃসঙ্গ যাত্রী। চিন্তা ও কাজ কিংবা কাজ ও চিন্তাকে আমি অবিভাজ্য মনে করি। সাময়িক বিভাজন দরকার হতে পারে।

প্রবন্ধটি আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা অবলম্বনে তৈরি।



ট্রায়ের শহরের প্রমিথিউস

বদরুল আলম খান

এক

জার্মানির ট্রয়ের শহর। ইংরেজিতে একে ট্রেভেস নামে ডাকা হয়। শহরটি জার্মানি-লুক্সেমবার্গ সীমান্তের একেবারে কাছে। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এক লাখের মতো। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মোট জনসংখ্যা ছিল ঊর্ধ্বে ১১ হাজার। শহরের বুক চিরে বইছে মোজেল নদী। শুনেছি অপরূপ শোভা নাকি এই মোজেল উপত্যকার। তারই প্রচ্ছায়ায় ট্রায়ের শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৫ সালে। রোম সম্রাট অগাস্টাস নিজেই শহরটি নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। সে অবশ্য বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষার কথা ভেবে। সম্রাট একে তাঁর আঞ্চলিক রাজধানীও বানিয়েছিলেন। এর সবচেয়ে পুরোনো যে ক্যাথিড্রাল, সেটি নির্মাণ করেছিলেন সম্রাট কনস্টানটিনোপল। আর তাঁর নামকরণ মা সেন্ট হেলেনার নামে। কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে শহরের ক্যাথলিক ধর্ম বিশ্বাসীরা এই ক্যাথিড্রালের দিকে তাকাত, ভাবাই কঠিন। এর গেট অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করলেই দৃষ্টি আটকে যাবে খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শনের ওপর। যে লোহার কাঁটা দিয়ে যিশুখ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তার একটি এখনো এখানে সুরক্ষিত আছে। আরও আছে যিশুর গায়ের লম্বা সেই ঢিলেঢালা পোশাক, যে পোশাক তাঁর গায়ে ছিল শূলে চড়ানোর সময়। মূল্যবান এসব প্রদর্শনী সেন্ট হেলেনার চার দেয়ালে আশ্রিত আছে নানা ভাগ্যগুণে। প্রদর্শনীর সবই এসেছিল পবিত্র শহর জেরুজালেম থেকে। ট্রায়ের শহরের ওপর ধর্মের এই যে আধিপত্য, এগুলো বলতে গেলে খুঁটিনাটি। কিন্তু তার সঙ্গে আরও যোগ করতে পারি বাড়তি তথ্য। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় নগরপালের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং আর্চ বিশপ। অন্য কথায় শহরের ধর্মগুরু। ১৮১৮ সালের ৫ মে ভোররাতের

কথা। এই শহরে জন্ম নিল এক শিশুসন্তান। তার নাম রাখা হলো কার্ল মার্ক্স।

বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যেটে এই শহরে এসেছিলেন ১৭৯৩ সালে। কবির মনের ওপর শহর যে ছাপ ফেলেছিল, সেটি প্রকাশ পেল এভাবে 'ট্রায়ের শহর রাইনল্যান্ডের সবচেয়ে পুরোনো। কিন্তু তার চার দেয়ালের মধ্যে মানুষগুলো অবরুদ্ধ আছে ধর্মের কড়া অনুশাসনে। চার্চ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উপাসনা কেন্দ্র রয়েছে এর অলিগলিতে। নানা ধরনের ধর্মীয় সংগঠনের (অর্ডার) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও চোখে পড়বে। প্রতাপ নিয়ে আরও আছে নানা কনভেন্ট।' গ্যেটের ভাষ্য যা-ই হোক রক্ষণশীল এই ক্যাথলিক শহরের নিথর ডোবায় অনুকম্পন অনুভব না করলেও কয়েক বছরের মধ্যে শহরটি বদলে গেল। শহর থেকে দু-পা ফেললেই ফ্রান্স। সেখানে অভূতপূর্ব সব ঘটনা ঘটছে। ফরাসি বিপ্লব ইতিমধ্যে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সবকিছু উল্টেপাল্টে গেছে বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য গতির ধাক্কায়। ফরাসি বিপ্লবের বাহক নেপোলিয়ন গোটা ইউরোপে তাঁর দেশের বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিতে চান। উদ্দেশ্য পূরণে দখল করলেন জার্মানি। বিপ্লবের অগ্নি আভা ট্রায়ের শহরের গায়ে পড়তে দেরি হলো না। এমন এক প্রশান্ত বাতাস তার ওপর দিয়ে বয়ে গেল, যা জার্মান ঐতিহ্যের একেবারে বিপরীত। বদলে গেল রাইনল্যান্ডের পুরো চেহারা। গণতান্ত্রিক ধারণার শক্তিশালী প্রভাব জার্মান রাজতন্ত্রের ওপর প্রতিফলিত হলো এই প্রথম।

পরিবর্তন কত গভীর ছিল তা অনুভব করা সহজ। জার্মানিতে কেউ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা এর আগে শোনেনি। এবার শুনতে হলো। সংবিধানে সমঅধিকারের কথা ভাবাই দুরূহ। এবার সেই অধিকার এল একেবারে ফরাসি বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ থেকে। ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি? সে কথা তো জানা ছিল না। এবার জানা গেল। সঙ্গে এল ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা। নাগরিক সমঅধিকারের কথা বা প্রশাসনিক বিভাগ থেকে আইন বিভাগের পৃথক্করণের নীতিও বাদ পড়ল না। এসব বিপ্লবী কথাবার্তা যে আইনি দলিলে লিপিবদ্ধ ছিল, তাকে বলা হতো নেপোলিয়নিক কোড। নেপোলিয়নের দেশে সেই আইন ইতিমধ্যে চালু। এবার হলো জার্মানিতে। ১৮০৮ সালের দিকে রাইন অঞ্চল বলতে চুনোপুঁটি ধাঁচের ক্ষুদ্র মাঝারি মাপের শাসকদের বোঝাত। তার বদলে রাইন নদীর পশ্চিম অংশকে নেপোলিয়নের আদেশ বলে একক প্রশাসনিক এলাকায় আনা হলো। নাম দেওয়া হলো রাইনল্যান্ড। নেপোলিয়নের শাসন অবশ্য বেশি দিন টেকেনি। ১৮১২ সালে রাশিয়ার হাতে পরাজিত হওয়ার পর সারা ইউরোপের রাজা-বাদশারা জোট বাঁধলেন। নেপোলিয়নবিরোধী আন্দোলন প্রবল। ১৮১৫ সালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন। রাইনল্যান্ডের ভাগ্য মন্দ। আবার ফিরে এল প্রুশিয়া রাজতন্ত্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব। সেই সঙ্গে এল প্রুশীয় রক্ষণশীলতার শীতল ঢেউ। তবে এ কথা ঠিক

ফরাসি সম্রাট বিদায় নিলেও বিপ্লবের আদর্শ ও প্রশাসনিক পরিবর্তনগুলো বিনষ্ট হলো না; বরং দেখা গেল চিন্তার দুই শক্তিশালী ধারা জার্মানিতে স্থান পেয়েছে। একদিকে ফরাসি বিপ্লব থেকে জাত সমাজ বিবর্তনের ভাবনা, অন্যদিকে প্রুশীয় রাজতন্ত্রের অতিমাত্রিক ধর্মীয়-সামাজিক রক্ষণশীলতার ধারা।

এই দুই ধারার প্রতিফলন ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পেয়েছিল জার্মানির আপাত অপলিমাটিতে। সে সময়কার সবচেয়ে নামী দার্শনিক হেগেল অভিভূত হয়েছিলেন ফরাসি বিপ্লবে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের গভীরতা দেখে। তারই আলোকে দাঁড় করিয়েছিলেন সমাজ বিবর্তনের তত্ত্ব। তবে তাঁর তত্ত্বের বাইরের খোসাটা নিরেট ভাববাদী হলেও ভেতরের সারবত্তা ছিল সাংঘাতিকভাবে বৈপ্লবিক এবং অন্তঃরসে টইটম্বুর, যা এর আগে ইউরোপীয় ভাবনায় কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর দাবি, সামাজিক পরিবর্তন ঘটে মানুষের চেতনায়। আর সমাজদেহে যে পরিবর্তন লক্ষ করি, সেটি তার প্রতিফলন মাত্র। চেতনার বিবর্তন বলতে তিনি ব্যক্তি চেতনাকে বোঝেননি। তাঁর আগ্রহের সবটুকুই সমষ্টিবদ্ধ চেতনার আবর্তে বাঁধা। সমষ্টিবদ্ধ চেতনা তাঁর দর্শনে স্থান পেয়েছিল 'চূড়ান্ত ধারণা' বা অ্যাবসলিউট আইডিয়া নাম নিয়ে। এই অ্যাবসলিউট চেতনা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে নানা পথ পরিক্রম করেছে বলে হেগেলের সুদৃঢ় দাবি। তার প্রতিফলন থেকেই নানা সভ্যতার জন্ম—নানা দেশ ও অঞ্চলে। হেগেলের বিশ্বাস মতে, অ্যাবসলিউট চেতনা প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল চীনে। তারই প্রভাবে গড়ে উঠেছিল চীনা সভ্যতা। চীন থেকে অ্যাবসলিউট চেতনা এল ভারতবর্ষে। সেখানেও গড়ে উঠল বিশেষ এক সভ্যতা। তারপর পারস্য। সেখানেও জন্ম নিল আরও উন্নততর সভ্যতা। এভাবে ব্যাবিলন মিসরীয় ধাপ পেরিয়ে ওই চেতনা পৌঁছাল গ্রিস ও রোমে। সব শেষে তার চূড়ান্ত আশ্রয় খুঁজে পেল জার্মানির প্রুশিয়ায়।

হেগেলের দর্শনচিন্তার মধ্যে গভীর স্ববিরোধিতা ছিল। সেটি লক্ষ করতে সেকালের দার্শনিকেরা ভুল করেননি। বিবর্তনের প্রবাহকে হেগেল ঠিক ঠিকই চিহ্নিত করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট করেছিলেন পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত উৎসকে। তাঁর মতে, অ্যাবসলিউট চেতনা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নানা রূপ ও আকার ধারণ করে। যেকোনো বস্তু বা চেতনায় দুটি উপাদান আছে। হেগেলের এই দাবির পেছনে যুক্তি ছিল। দেখা গেছে একে অপরের বিপরীতের দ্বন্দ্বে জন্ম নেয় নতুন কিছু। নতুনের গর্ভে পুনরায় স্থান করে নেয় ভিন্ন দুই বিপরীত। নতুন করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সেই দ্বন্দ্বের নিরসনও হয়। এই দ্বান্দ্বিক ধারা অনুসৃত পথে সমাজ এগিয়ে যায়। হেগেলের স্ববিরোধিতা হচ্ছে পরিবর্তনকে যদি শাশ্বত ধরি তাহলে জার্মান রাজতন্ত্র অ্যাবসলিউট চেতনার চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল হতে পারে না। নব্য হেগেলপন্থী নামে যেসব প্রগতিশীল দার্শনিক জার্মানিতে বিশেষ সম্মান ভোগ করতেন, তাঁরা

হেগেলের এই দিকটিকে সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের বলা হতো নব্য এই কারণে যে হেগেলীয় দর্শনের অনুসারী হলেও তাঁরা তাঁর বিরোধিতা করতে পিছপা হননি। বলা বাহুল্য, মার্ক্সের চেতনার প্রারম্ভিক উন্মীলনে নব্য হেগেলীয় দর্শনের আলোকচ্ছটার অবদান অপরিসীম। কিন্তু সেটি সম্ভব হলো কেবল বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার্লিনে যাওয়ার পর। দর্শনের প্রতি মার্ক্সের আকৃষ্ট হওয়ার সূত্রপাত সেখানেই ঘটে। শহরটি ছিল নব্য হেগেলীয়দের ঘাঁটি। নানা ক্লাব বা আলোচনা সভায় তাত্ত্বিক আক্রমণের মূল লক্ষ্য হেগেলের রক্ষণশীল দিক। তবে তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা তাঁকে প্রশংসা করেননি। বস্তুত, সত্যি কথাটা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব উদ্ভাবন তাঁর হাতেই হয়েছিল। সেটি তাঁর সমালোচকেরা উল্লেখ করতে ভোলেননি। মার্ক্সের বাবার কাছে পুত্রের এই দর্শনপ্রীতি ছিল সবিশেষ আতঙ্কের। কিন্তু তাঁর অসন্তোষের প্রতি যুবক মার্ক্স ভুলেও কর্ণপাত করেননি।

মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক দিকটি হেগেলের কুজ্‌ঝটিকা সমাচ্ছন্ন দর্শনের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঠিকই। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার বস্তুবাদী উপাদান এসেছিল আরেক জার্মান দার্শনিকের চিন্তা থেকে। সেই দার্শনিকের নাম ফয়েরবাখ। ফয়েরবাখ হেগেলের শক্ত ভক্ত ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের সবকিছুকে হেগেল যেভাবে আত্মচেতনার আলোকে দেখার উপদেশ দিয়েছিলেন, ফয়েরবাখ সেটি পছন্দ করেননি। হেগেলের ভাববাদকে একধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে দেখার উপদেশবাক্য তাঁর লেখায় প্রতিনিয়ত চোখে পড়ত। হেগেলকে একহাত দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, মানুষের ব্যক্তিসত্তার মূলে রয়েছে একেবারে নির্ভেজালভাবে তার জৈবিক দিক। সেটিই তার আসল পরিচয়। তার চেতনার ভুবন যদি ধরি তাহলে সেখানে যা হচ্ছে, তা ওই জৈবিক সত্তার প্রতিফলন মাত্র; অর্থাৎ হেগেলের দর্শনকে ফয়েরবাখ একেবারে উল্টে দিলেন। সমালোচনাকে আরও একটু এগিয়ে নিতে তিনি দাবি করলেন, ধর্ম মানুষের বস্তুজগতের চাওয়া-পাওয়াকে প্রকাশ করে ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করে। সৃষ্টিকর্তার মধ্যে মানুষ যে পবিত্রতার আবরণ দেখে, সেটি আসলে মানুষের নিজ চরিত্রেরই প্রতিফলন। ফয়েরবাখের এই অকাট্য বস্তুবাদকে মার্ক্স পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হননি।

মার্ক্সের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎ কিন্তু গড়ে উঠেছিল একেবারে ছোটবেলা থেকে। ট্রয়েরের যে বাড়িতে মার্ক্স-পরিবার বসবাস করত, তার পাশেই ছিল শহরের সম্ভ্রান্ত এক পরিবার। নাম ব্যারন ভন অয়েস্ফালেন। সেই পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটির সঙ্গে মার্ক্সের বাবার বন্ধুত্ব ছিল। বাবার সঙ্গে মার্ক্স প্রায়ই ওই বাড়িতে যেতেন। এসব তাঁর ছোটবেলাকার কথা। বাড়ির নিচের তলায় বিশাল এক লাইব্রেরি। প্রাথমিক জ্ঞান প্রস্তুতির একেবারে মোক্ষম এক স্থান। এই লাইব্রেরির সুপরিসরতায়

মার্ক্স হারিয়ে যেতেন। পড়তেন শেক্সপিয়ার, লর্ড বাইরনের লেখা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আগ্রহের মাত্রায় বৃদ্ধি ঘটল। পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত হলেন ওই বইয়ের ভুবনে। শেক্সপিয়ারের অনেক রচনার অংশবিশেষ তাঁর মুখস্থ। অসাধারণ এই কথাশিল্পীর অপ্রধান চরিত্রগুলো সম্পর্কেও মার্ক্সের জ্ঞানের প্রখরতা চোখে পড়ার মতো। তাঁর কিশোর মনোজগতে আরও স্থান পেয়েছিল গ্রিক দর্শনের দ্যোতনা। গ্রিক পৌরাণিক রচনা হোমার এবং *ইলিয়াড* তো বটেই। ভালো লাগার জগতে স্থান করে নিল গ্রিক দর্শনের প্রাচীনকাল। থালেস ডেমোক্রিটাস বা অন্যরা। প্লেটো অ্যারিস্টটলের দর্শনও বাদ পড়ল না। তবে তাঁর আগ্রহের পরিধি যে কেবল বইয়ের জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। এখানে তিনি প্রেমে পড়েছিলেন ব্যারন ভন অয়েস্তফালেনের কন্যা জেনির সঙ্গে। একদিন রাতে জেনির কাছে খবর এল মার্ক্স পালিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন। জেনি মার্ক্সের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করলেন। দুজনকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ছুটল ট্রায়ের শহর থেকে দূরে। অনেক পরে উদ্ধার হলো তাঁদের পরিকল্পনা। প্রতীক্ষার সাধনা সফল হলো। মার্ক্সের স্ত্রী জেনি তাঁর চেয়ে চার বছরের বড় হলেও মার্ক্সের মধ্যে জেনি দেখেছিলেন প্রমিথিউসের মন। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন চুরির নাটকে মানব সমাজ যেভাবে উপকৃত হয়েছিল, মার্ক্সের বৈপ্লবিক বিজ্ঞতার মধ্যে জেনি দেখেছিলেন পৌরাণিক সেই চরিত্রের অমৃতময় প্রতিচ্ছবি। মার্ক্সের আবেগ স্রোতের অস্থিরতা নির্বাপিত হলো অনেক দেরিতে যদিও।

তবে এ কথা ঠিক যে মার্ক্সের বাবা এবং মায়ের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক বৈষম্য ছিল প্রবল। বাবা ছিলেন অনেকটা পণ্ডিত গোছের। আর সেই সঙ্গে ছিল আভিজাত্যের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছায়া। যে বাড়িতে মার্ক্সের জন্ম, সেটি ৬৬৪ নম্বর ব্রুকারগাস রোডের দোতলা এক বাড়ি। মার্ক্সের বয়স ১৮ মাস হতেই পরিবারটি ১০ বেড রুমের বিশাল বাড়িতে গিয়ে উঠল। পাশেই মার্ক্সের বাবার বেশ কয়েকটি আঙুরখেত। আইনের ওপর বিশেষজ্ঞ হলেও তার বাইরেও আগ্রহের ব্যাপ্তি কম ছিল না। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে তিনিও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শেক্সপিয়ারের অনেক রচনা ছিল মুখস্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার, রুশোর রচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো হুবহু বলতে পারতেন। জ্ঞান আভিজাত্যের এ ধারাটি মার্ক্স ঠিকই পেয়েছিলেন তাঁর বাবার থেকে। অন্যদিকে মা হেনরিয়েটা ছিলেন অর্ধশিক্ষিত। বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে কী হচ্ছে, কিছুই খেয়াল করতেন না। মাঝেমধ্যে মা লিখতেন, 'বাবা মার্ক্স, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করো। কারণ, স্বাস্থ্য এবং মনের আনন্দ একেবারে সম্পর্কিত। তোমার পড়ার ঘর যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। সাবান আর স্পঞ্জ ব্যবহার করে ঘর পরিষ্কার রাখবে।' অবাক হই না যখন শুনি মার্ক্স সারা জীবন মায়ের থেকে সহনীয় দূরত্ব বজায় রাখতে সচেতনতার

ঘাটতি দেখাননি। বাবার সঙ্গেই ছিল তাঁর মূল সম্পর্ক। তাও পুরোপুরি সম্প্রীতির সম্পর্ক বলা যাবে না। বাবা যখন মারা গেলেন তাঁর শেষকৃত্যে মার্ক্স এলেন না ইচ্ছে করেই। মায়ের প্রায়োগিক জ্ঞানকে অবশ্য খাটো ভাবা যায় না। তাঁর স্বাক্ষর মেলে নানা উদাহরণে। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। মা খবর পেলেন পুত্র অর্থনীতির ওপর ক্যাপিটাল নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। মা মন্তব্য করলেন, 'বাবা, শুনলাম তুমি পুঁজির ওপর একটি বই লিখেছ। তা বেশ ভালো। তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি বরং পকেটে কিছু পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা করো।' পুঁজির শক্তিশালী প্রভাব থেকে দূরে মার্ক্সের বাস ছিল লন্ডনের একেবারে দরিদ্র এলাকায়। প্রুশীয় সরকারের এক গুপ্তচর একদিন মার্ক্সের বাসায় হাজির। তাঁর বর্ণনায় বাসস্থানের চিত্রের আংশিক বর্ণনা পাওয়া গেল। তিনি লিখলেন, 'দেখি বাসাটা একেবারে সস্তা এবং বাজে এলাকায়। মাত্র দুটো রুম। ড্রয়িংরুমের মাঝখানে ওয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা পুরোনো আমলের একটি টেবিল। তার ওপর জমা রয়েছে খবরের কাগজ, বই আর পাণ্ডুলিপি। পাশে শিশুদের খেলার জায়গা। আরও রয়েছে স্ত্রীর সেলাইয়ের সরঞ্জাম। ছুরি, চায়ের কাপ ইত্যাদি। কালির দোয়াত, পাইপ, ছাইদানিও রয়েছে। একটি চেয়ার চোখে পড়ল। তার তিনটি পা। বাকিটা খোয়া গেছে। অন্য এক টেবিলেরও ওই একই দশা। সেখানে রান্না রান্না খেলছে তার তিন সন্তান।'

দুই

১৭ বছর বয়সে মার্ক্স বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পড়তে গেলেন। সে অবশ্য বাবার চাপাচাপিতে। এখানে লক্ষ করা গেল মার্ক্সের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কিছু দিক। নিজ বাসস্থানের সামনে কয়েক রাত মাতলামির বিষয়টি প্রতিবেশীদের নজর এড়িয়ে গেল না। তাদের অভিযোগ পুলিশেরও কানে পৌঁছাল। মার্ক্সকে খাটতে হলো এক দিনের জেল। বাবা এসে মার্ক্সকে বাসায় পেলেন না। ছেলে ফিরলেন গভীর রাতে। ঘরে ঢুকেই দেখলেন সবকিছু এলোমেলো। তথৈবচ। পা ফেলার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। চারদিকে বই-কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ছাইদানিতে সিগারেটের বহু অবশিষ্টাংশ। তবে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নিয়ম ছিল। চিন্তাজগতের যে ধারাবাহিকতা ইতিমধ্যে তাঁর তাত্ত্বিক গর্ভে পরিপক্ব হচ্ছে, তার প্রতিফলন বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছিলেন ওই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্স বেশি দিন থাকেননি। বাবাকে অশেষ দুঃখে ভাসিয়ে মার্ক্স এলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার আইনশাস্ত্র নয়, প্রশ্রয় পাওয়ার ব্যাকুলতায় দর্শনশাস্ত্র তাঁর ধ্যানে স্থান করে নিল। গভীরভাবে তিনি হেগেলীয় দর্শন সম্মোহনে ডুব দিলেন। দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্র হিসেবে বার্লিনের পরিচিতি

ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকালের অনেক দার্শনিকই নব্য হেগেলীয় ধারার অনুসারী। তাঁদের ধারণা হচ্ছে, জার্মানির নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে সামাজিক সবকিছুকে সমালোচনা করে। সমালোচনা প্রতিরোধ বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ তীব্র করতে হবে। সেভাবেই আসবে সামাজিক পরিবর্তন। বলাই বাহুল্য, ভাবনার ধারাটি পুরোপুরি হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল।

বার্লিনে থাকাকালে মার্ক্স দুটি বিষয় নিয়ে ভেবেছিলেন। একটি হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম সে সময় প্রুশীয় রাজতন্ত্রের মূল আদর্শ ছিল। তার রক্ষণশীল দিককে ব্যবহার করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হতো। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা মার্ক্স পরিবারকে প্রভাবিত করেছিল বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। তাঁর বাবার উদাহরণ এ ক্ষেত্রে কোনোভাবেই মামুলি না। ইহুদি হওয়ার কারণে তাঁর ওকালতি পেশার ওপর রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছিল। অথচ আইনশাস্ত্রই ছিল তাঁর প্রাণ। শেষমেশ ধর্মান্তরিত হয়েই রক্ষা করতে হলো পেশার মর্যাদা। মার্ক্সের জন্মের ঠিক এক বছর আগে বাবা বাধ্য হয়ে লুথারীয় ধর্মে দস্তখত করলেন। যে গির্জায় গিয়ে তিনি ধর্মান্তরিত হলেন ছয় বছরের মার্ক্সকেও নেওয়া হলো ওই একই চার্চে। বালক মার্ক্সও গেলেন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। মায়ের দিক থেকে ধর্মের লক্ষণীয় প্রভাব অজানা থাকতে পারে। কিন্তু পরিবারের পূর্বসূরিদের অনেকেই ছিলেন ইহুদি ধর্মযাজক। সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মযাজক এরোন লো বা মোজেজ লো ট্রায়ের শহরের রাবাইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁর কন্যা শাজে মার্ক্সের পিতামহ। শাজের স্বামী ট্রায়ের শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ফরাসি এক শহরে রাবাইয়ের দায়িত্ব পালন করেন। নাম মার্ক্স লিয়ুই। শাজে ও লিয়ুই তাঁদের সন্তানের নাম রেখেছিলেন হেচশেল বা হেনরি। তিনিই মার্ক্সের বাবা। লুথারীয় ধর্ম অবশ্য শহরের অধিকাংশের ধর্ম ছিল না। কিন্তু প্রভাবশালী বেশ কিছু নগর সদস্য ওই ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ট্রায়ের ক্যাসিনো ক্লাব নামে এলায়িত পরিবেশে আড্ডা দেওয়ার একটি স্থান ছিল। মার্ক্সের বাবা এবং ব্যারন ভন ওয়েস্তফাল সেখানে যেতেন। আলাপ হতো নানা বিষয় নিয়ে। তর্ক-বিতর্ক হতো। পারিবারিক ঐতিহ্যে ধর্মীয় শিকড় শক্ত থাকা সত্ত্বেও জীবনের প্রথম থেকে নাস্তিক হিসেবেই মার্ক্স পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর পিএইচডি থিসিসটি ছিল গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস এবং এপিকুরাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। শুষ্ক বিষয় হলেও সেখানে তিনি দর্শনকে ধর্মের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন।

মার্ক্সের নানা ঝোঁকের মিশেলে অন্যতম ক্ষেত্র ছিল মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ আর সাম্যঘেরা টলমলে নতুন স্বপ্ন। বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে মার্ক্সের ধর্মতত্ত্ব থেকে পৃথক করা কঠিন। ধর্মের প্রতি মানুষ কেন আকৃষ্ট হয় তার কারণ তিনি খুঁজেছিলেন বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির মধ্যে। মনস্তাত্ত্বিক মাধুর্য ঠিকরানো এই

অনুভূতির ভূমিকা জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, বিষয়টিকে নিয়ে তিনি অনুধ্যান করেছিলেন। পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর বড় অভিযোগ হচ্ছে ওই সমাজে মানুষ নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়। উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হয় উৎপাদিত পণ্য থেকে। স্বীয় জীবনেও বিচ্ছিন্নতা অনুষঙ্গ হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল। দেশত্যাগ দিয়ে তাঁর শুরু। যৌবনের প্রারম্ভে বাধ্য হলেন জার্মানি ত্যাগ করতে। সে অবশ্য প্রুশীয় সরকারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরার কারণে। প্রথমে ফ্রান্স। পরে বেলজিয়াম। সবশেষে ইংল্যান্ডে। পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বেদনাদায়ক অনুভূতিও তাঁকে আঘাত করেছে একবার নয়, বহুবার। ৩৬ বছর না যেতেই মার্ক্সের বাবা মারা গেলেন। মারা গেলেন তিন ভাই ও এক বোন। এর দুই বছর পর মারা গেলেন আরেক বোন। পরবর্তী সময়ে নিজের সন্তানদের মৃত্যুর গভীর বেদনার সঙ্গে যুঝতে হলো। যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মার্ক্স তেমন কোনো সম্পর্ক রাখতেন না। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শীতল এবং দূরের। দেশহীন এই ব্যক্তিটি মারা গেলেন ভিনদেশে। অ্যাঙ্গেলসকে লেখা কোনো এক চিঠিতে মার্ক্স জানিয়েছিলেন, 'সেই হচ্ছে সবচেয়ে ভাগ্যবান, যার পারিবারিক কোনো যোগাযোগ নেই।'

ধর্মসংক্রান্ত মার্ক্সের উন্মাদনার পরিস্ফুটন এই বিচ্ছিন্নতার সঙ্গেই সম্পর্কিত। ১৮৪৪ সালে মার্ক্সের বয়স ২৬ বছর। হেগেলের *ফিলোসফি অব রাইট* নামের লেখাটির সমালোচনা করতে গিয়ে মার্ক্স বললেন, ধর্ম হচ্ছে অপিয়াম।[১] মাইকেল লোয়ি নামে এক মার্ক্সীয় গবেষক ইতিহাস ঘেঁটে অবশ্য দেখিয়েছেন ধর্ম সম্পর্কে প্রায় সমধর্মী উক্তি সেকালে দুর্লভ বলা যাবে না। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, ফয়েরবাখ, ব্রুনো বাওয়ার বা কবি হেনরিখ হেইন প্রমুখ ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কটাক্ষের সুরে মার্ক্সের প্রিয় কবি হেইন লিখেছিলেন, 'আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই সেই ধর্মে, যা মানুষের নিপীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু মাত্রায় আফিমী ঝিমানি ঢোকায়। কিছু মাত্রায় ভালোবাসার আশা এবং বিশ্বাসের আলো দেখায়।'[২] মোজেস হেস নামে আরেকজন লিখেছেন, 'অপিয়াম যেভাবে পীড়াদায়ক রোগে উপশম দেয়, ধর্মও তেমনি দাসত্বের নিরানন্দ চেতনার উপশম হিসেবে কাজ করে।'[৩] সমসাময়িক ঘটনাবলির প্রতি মার্ক্সের প্রখর দৃষ্টি শাণিত ছিল জানি। যে সময় তিনি এই উক্তি করেছিলেন, সে সময় আফিমের যুদ্ধ চলছে চীনের সঙ্গে ব্রিটেনের। বেঙ্গল থেকে আফিম নিয়ে ব্রিটেন চীনে বিক্রি করে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাবি স্বর্ণের মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে। অসহনীয় ক্ষতির মুখে পড়ল চীনা অর্থনীতি। নাঞ্জিং শহরে খ্রিষ্টানগোষ্ঠীর প্রভাবের তীব্রতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে চীনা জাতীয়তাবাদীরা খ্যাপা। সেই অজুহাতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজকীয়

নৌবাহিনী আনল। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাল। আফিম যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য, সেখানকার খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের রক্ষা করা। ঐতিহাসিক ঘটনাটি ধর্মকে আফিম বলার ক্ষেত্রে মার্ক্সকে কোনো মাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছিল কি না, জানি না। তবে চিত্তাকর্ষক হচ্ছে মার্ক্সের মন্তব্যের প্রতি যে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল কবি হাইন, ব্রুনো বাওয়ার বা ফয়েরবাখের মন্তব্যের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া সে তুলনায় ছিল নস্যি মাত্র। কারণটি এই হতে পারে যে মার্ক্স কেবল ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করে ক্ষান্ত দেননি। বলেছিলেন দার্শনিকেরা এ পর্যন্ত পৃথিবীকে কেবল ব্যাখ্যা করেছেন নানাভাবে। প্রয়োজন তাকে বদলে দেওয়া। মার্ক্সের গবেষণায় দর্শনশাস্ত্রকে বদলে দেওয়ার অস্ত্রে পরিণত করার আবেগময় আকুতি ছিল। এ ধরনের কথা তাঁর আগে কেউ বলেননি, ভাবেনওনি।

তবে মার্ক্সের ধর্মসংক্রান্ত সমালোচনার অংশবিশেষ না পড়ে তাকে দেখতে হবে একেবারে নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে। মার্ক্স প্রগাঢ় আশ্লেষের ভয়ে বিচলিত না হয়ে দাবি করছেন, ধর্ম এমন এক চেতনা, যেখানে জীবনের সত্যিকার হতাশা এবং সংকট প্রতিফলিত হয়। ধর্মকে মানুষ আরও দেখে সমাজসংকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অস্ত্র হিসেবে। ধর্ম নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস। হৃদয়হীন এক জগতের হৃদয়। মমতাহীন জগতের মমতা। কিন্তু সেই সঙ্গে ওই মমতাহীন জগতের সমালোচনা বা প্রতিবাদের ভাষাও কিন্তু ধর্ম। ফলে ধর্মকে মার্ক্স কেবল শোষিত মানুষের হতাশার প্রতিবিম্ব হিসেবেই ভাবেননি। দেখেছেন প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে। চিন্তার এ ধাঁচটি মার্ক্স গড়ে তুলেছিলেন নব্য হেগেলীয় ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে। তবে এই ভাবনাবিন্যাস যে ফরাসি এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়নের ভাবনা থেকে যে বহু দূরে, তার সুস্পষ্টতা একেবারে পাকাপোক্ত। ধর্মকে ওই কালের দার্শনিকেরা এত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেননি। তাঁদের হাতে ওই স্বর্গীয় আভা ছেটানো চৈতন্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ধর্মগুরুদের কারসাজি হিসেবে। মার্ক্স সে পথ মাড়াননি। ধর্মকে নাকচ না করে তার দ্বিমুখী চরিত্রের ওপর অপত্য স্নেহ ঢেলেছিলেন।

আফিম উক্তিটি ছাপানোর দুই বছর পর মার্ক্স এবং অ্যাঙ্গেলস *দ্য জার্মান আইডিওলজি* নামে একটি কাজ শেষ করেন। এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে মার্ক্স অপেক্ষা করছেন। কিন্তু প্রকাশক ছাপাতে নারাজ। জটিল বিষয় নিয়ে লেখাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি কতটুকু আকর্ষিত হবে, তা নিয়ে প্রকাশক উদ্বিগ্ন। তৎকালীন ভিন্ন দার্শনিক ধারাকে মতান্তরে কলঙ্কলিপ্ত করার প্রচ্ছন্ন অনুবেদন থাকলেও মার্ক্স কিন্তু কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বিশাল দার্শনিক ক্যানভাসে। দেরি হলেও কাজটি যখন ছাপা হয়ে বেরোল, দেখা গেল মার্ক্সের ধর্মসংক্রান্ত ধারণায় বেশ বড় ধরনের রদবদল এসেছে। ধর্মকে এবার তিনি দেখছেন আদর্শ হিসেবে। মানুষের আধ্যাত্মিক জগৎ বা চেতনার অন্যতম অংশ হিসেবে। ঠিক যেভাবে দেখি

দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা মূল্যবোধের মতো মানবিক দিকগুলো। মার্ক্সের কথা হচ্ছে, ধর্মকে সামাজিক সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন কোনো চেতনা হিসেবে ভাবা ভুল। ধর্ম সমাজচেতনারই বিশেষ স্তর। সমাজ বিকাশের প্রতিটি ধাপে কোনো বিশেষ চেতনা আধিপত্যকারী চেতনা হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রাচীন রোমে বিশেষ প্রাধান্য ছিল রাজনীতির। তার সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণও ছিল। মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে ক্যাথলিক ধর্মের দাপট ছিল; যা থেকে বোধগম্য যে সমাজের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে বিশেষ চেতনা সেই সমাজের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে। ধর্ম ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের এই বিশেষ ধরনটি কিন্তু হেঁয়ালিপনায় হোক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক শৈথিল্যের কারণেই হোক হেগেল বা ফয়েরবাখের নজরে আসেনি। মার্ক্সের ধর্মসংক্রান্ত চিন্তার স্বকীয়তা কিন্তু এখানেই।

মার্ক্সের মনের পরিকাঠামোয় ধর্ম নিয়ে যে আগ্রহ, সেটি অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে *দ্য জার্মান আইডিওলজি* লেখার পর। তবে মার্ক্সের বন্ধু অ্যাঙ্গেলস বসে থাকেননি। ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় তিনি ছিলেন অনেক বেশি উৎসাহী। ধর্মসংক্রান্ত চিন্তার ফলিত প্রয়োগ ভাবনায় সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন ধাপে তার দেহে কী কী বিবর্তন আসে, সেটিই তাঁর উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাঙ্গেলস ধর্মকে দেখেছিলেন সংস্কৃতির অংশ হিসেবে। ধর্মের সঙ্গে সংযোগ থাকে বিশেষ সামাজিক শ্রেণির। ধর্ম বিশেষ শ্রেণি স্বার্থ রক্ষা করে—এ-ই ছিল তার স্বতঃসিদ্ধতা। খ্রিষ্টধর্মের উৎপত্তিকালে ওই ধর্ম দাসশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছে। রোম সাম্রাজ্যের অধীনে ওই একই ধর্ম সর্বসমাচ্ছন্ন হয়ে পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় আদর্শে। আবার মধ্যযুগে পালন করেছে সামন্ত আদর্শের করা প্রহরীর দায়িত্ব। ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী কোনো সংস্থা হিসেবে ভাবা ঠিক নয়। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর যে শ্রেণি বিভক্তির রেখা এঁকে দেয়, সেটিই ছিল তাঁর মনোযোগের মূল ক্ষেত্র। ইউরোপে লুথারীয় সংস্কারের সঙ্গে কী কারণে নিম্নস্তরীয় ধর্মযাজকেরা যুক্ত হয়েছিলেন, আবার কী কারণেই বা ওই সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত যাজকগোষ্ঠী, সেই পার্থক্যকে অ্যাঙ্গেলস বুঝতে চেয়েছিলেন। আঞ্চলিক ভিন্নতার সঙ্গে ধর্মের দায়িত্বে প্রকারভেদ তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা পাশ্চাত্যের তুলনায় ভিন্ন কেন, সেই জিজ্ঞাসা থেকে নিজেকে অপসৃত করেননি। পাশ্চাত্যে ধর্মীয় ব্যানার পুরোনো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে। যত প্রচ্ছন্নভাবেই হোক, ধর্মীয় সংস্কার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোকে নির্দয়তার সঙ্গে আক্রমণ করে। খ্রিষ্টধর্মের অধীনে সংগঠিত আন্দোলন কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহায়ক। ধর্মীয় স্লোগান সেখানে প্রায় অগোচরে প্রয়োগ করা হয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের অনুষঙ্গ হিসেবে। 'প্রাচীন খ্রিষ্টান

ধর্মের ইতিহাসে' ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনীতির ভূমিকার যুগলবন্দী দিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বিভেদ রেখা এঁকেছিলেন।

পবিত্র ইসলাম ধর্মের ওপর অ্যাঙ্গেলসের মন্তব্যে মুনশিয়ানা আছে। ইসলাম ধর্ম তার উন্মেষ মুহূর্তে কেবল প্রাচ্যের জন্যই উপযোগী—এ ধরনের মন্তব্য রেখে তিনি দেখিয়েছেন ওই ধর্মের জন্মই হয়েছিল আরব জাতির কথা মাথায় রেখে। সেখানে একদিকে শহুরে মানুষ, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে বেদুইন সমাজ। শহুরে মানুষ ধনী, বিত্তশালী কিন্তু ধর্মীয় বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে উদাসীন। বেদুইনরা দরিদ্র কিন্তু বিশুদ্ধবাদী। তারা ধনসম্পদকে হিংসা করে, আবার তার প্রতি লোভ-লালসা যে নেই, তা নয়। তারা মেহেদি বা কোনো ধর্মীয় নেতার পেছনে সমবেত হয় ধনসম্পদের অধিকারীদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রকৃত ধর্ম ও ধর্মীয় আইনের প্রতি সম্মান দেখায়। পুরস্কার হিসেবে অবিশ্বাসীদের সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চায়। ১০০ বছর পর দেখা যায় তারাই আবার আগের অবিশ্বাসীদের স্থানটি পূরণ করছে। পুনরায় নতুন কোনো ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে। আবার সেই একই খেলা শুরু হয় প্রথম থেকে। প্যাটার্নটির লক্ষণীয় উপস্থিতি দেখা যায় সুদানে ব্রিটিশবিরোধী মেহেদির আন্দোলনে অথবা স্পেনে মুসলিম অভিযানকালে। অ্যাঙ্গেলসের বিশ্বাস 'প্রাচ্যে সামাজিক আন্দোলন ধর্মীয় চাদরে আবৃত হলেও তার কারণটি অর্থনৈতিক। আন্দোলন সেখানে ফলপ্রসূ হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি প্রাচ্যে অপরিবর্তিত থেকে যায়। পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় আন্দোলনে ব্যানার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ধর্ম পুরোনো জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে আক্রমণ করে। পুরোনো ব্যবস্থার উৎখাত সম্ভব হয় মধ্যবিত্তের অগ্রণী ভূমিকার কারণে। আধুনিকীকরণের নায়কত্বের বোঝা তাঁর কাঁধে। সেই পুরোনো সামন্তবাদী কাঠামোকে প্রতিস্থাপন করে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সমাজ এগিয়ে যায় এভাবে' (Engels, 1979: 483:40)।

তিন

ধর্মসংক্রান্ত মার্ক্সীয় ভাবনা কিন্তু কোনো বৃত্তায়নে স্থির ছিল না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেখানে বড় মাপের পরিবর্তন আসে। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে ধর্মের আন্তসম্পর্কের যে ধাঁচটি মার্ক্সের সময় সর্বসমাচ্ছন্ন ছিল, সেটি উল্টে গেছে। মার্ক্সের সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল সমাজ যতই আধুনিক হবে, ধর্মের আকর্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পাবে তত বেশি করে। ডুরখেইম, মার্ক্স ও ওয়েবারের মতো বাঘা বাঘা সব পণ্ডিতজন দাবিটি করেছিলেন। আধুনিক সমাজে ধর্মের প্রতি সর্বব্যাপী নির্লিপ্ততার দিকটি জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছিলেন। শব্দটি হচ্ছে ডিসএনচান্টমেন্ট। ওয়েবার ভালো করেই

জানতেন আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে কারণে রহস্য বা ম্যাজিক বা ধর্মের ভূমিকা ওই সমাজে পছন্দ করার কথা নয়। আধুনিকতার চাপে মানুষের মোহমুক্তি ঘটে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণও কমে আসে। ইউরোপে সে সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আধুনিকতার বাহক হিসেবে ধরা হতো। গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে মধ্যবিত্তের হাতে ধর্মের প্রতিস্থানিক প্রভাব খর্ব হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথমে রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু করে। তারপর এনলাইটেন্টমেন্ট আন্দোলন সফল হয়। পরে তাঁরই হাতে ঘটে যায় বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আর শিল্পবিপ্লব। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলো সমাজে আধুনিকতার শক্ত ভিত গড়তে সাহায্য করে। আধুনিক জীবনধারার উন্মেষ ঘটিয়ে ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণি অস্তায়মান সূর্যের মতো হেলে পড়া ধর্মের প্রভাব থেকে নিজেকে পৃথক করে। ধর্মনিরপেক্ষতা ইউরোপীয় জীবনে প্রধান ধারা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আধুনিক সমাজে ধর্মের ভূমিকা হ্রাস পাওয়ার তত্ত্বটি এভাবেই গড়ে উঠেছিল। তত্ত্বের বরাত দিয়ে অনেকে ভেবেছিলেন উন্নতশীল বিশ্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি আধুনিকতার বাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। কিছু দেশে সেটি যে সত্য হয়নি, তা নয়। কিন্তু আজ সেই চিন্তাবিন্যাসটি বুড়িয়ে গেছে। উন্নতশীল বিশ্ব চলছে ঠিক উল্টো পথ ধরে। ধর্মের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির শক্তিশালী আদর্শিক আঁতাত গড়ে উঠল কী কারণে, কী কারণেই-বা ধর্মই তার আদর্শগত খোরাক মেটাচ্ছে এবং অনীহার বদলে ধর্মের প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছে মধ্যবিত্তের গভীর আনুগত্য, সেটি ভাবনার বলয়কে প্রসারিত করে।

মধ্যবিত্তের এই আদর্শিক দিক পরিবর্তনের মূল কারণ তার আত্মপরিচয়গত সংকট। যে পথে উন্নতশীল দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি তার আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে চেয়েছিল, সে পথ বিশেষ কাজে দেয়নি। তারা আধুনিক সমাজ গড়তে চেয়েছিল; কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তিনটি কারণে। প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পর যাঁদের হাতে আধুনিক সমাজ গড়ার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তাঁরা সমাজকে আধুনিক করে গড়তে পারেননি। আধুনিক বলতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বুঝি। নারী-পুরুষের সমতামূলক সম্পর্ককে বুঝি। বুঝি সামাজিক সমতাভিত্তিক জাতিভেদহীন সমাজকে। বুঝি উদারনীতির ভিত্তিতে সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলাকে। এর কোনোটিই নব্য স্বাধীন দেশগুলোতে বাস্তবায়িত হয়নি। গণতন্ত্রের বদলে জন্ম নিয়েছে নানা বর্ণের স্বৈরশাসকের। ইরাকে সাদ্দাম হোসেন, ইরানে রেজা শাহ পাহলভি, পাকিস্তানে আইয়ুব খান, সিরিয়ায় আসাদ পরিবারের মতো আরও অনেকে। তাঁরা স্বৈরাচারী কায়দায় শাসন করেছেন। সামাজিক সমতা নিয়ে ভাবেননি। তাঁদের শাসনামলে মুষ্টিমেয় মানুষ বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয়েছেন। সামাজিক সমতাসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। সমাজকে উদার করা সম্ভব হয়নি।

ক্ষমতায় টিকে থাকতে ধর্মের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে আঁতাত করেছেন। ফলে নিজেরাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন উদারনীতির বিকাশে। নারীরা নিগৃহীত হয়েছে লিঙ্গপরিচয়ের কারণে। নিষ্ঠুর রাষ্ট্রকাঠামো টিকিয়ে রাখতে শাসকগোষ্ঠী মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রের কারাগার পূর্ণ হয়েছে শাসকগোষ্ঠীর সমালোচকদের দিয়ে। যে রাষ্ট্রকে আত্মপরিচয়ের মূল উৎস হিসেবে ভাবা হয়েছিল, যে রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে মানুষ বলেছে আমি যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সে রাষ্ট্র আমার আবেগের মূল্য দেয়নি। এই ব্যর্থতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে রাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্পর্ক। তা থেকে জন্ম নিয়েছে সত্তা চেতনার সংকট। সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে আদর্শগত বিভ্রান্তি। আধুনিক জীবনকে ভাবা হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসবোধ বিরোধী। আধুনিকবাদী আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রও ব্যর্থ হয়েছে। নাস্তিকতার দাবি তুলে সমাজতন্ত্র বাষ্পায়িত আদর্শের মর্যাদা কুড়িয়েছে। আধুনিক হওয়ার সব প্রচেষ্টা শেষ বিচারে সংকট দিয়ে শেষ হয়েছে।

আত্মপরিচয়গত সংকট কেন দেখা দিল, তার ঐতিহাসিক কারণও কম গুরুত্বের নয়। ঔপনিবেশিক শাসকেরা যখন এসব অঞ্চল ত্যাগ করেন, তখন তাঁরা নিজেদের মতো করে বিভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করে দিয়ে যান। সেই রাষ্ট্র গঠনে স্থানীয় মানুষের কোনো ভূমিকা ছিল না। থাকলেও যৎসামান্য। মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর। জন্মের নেপথ্যে কাজ করেছিল ব্রিটিশ এবং ফরাসি ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের শুরুটা প্রথম মহাযুদ্ধকালে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অন্যতম প্রধান শত্রু অটোমান সাম্রাজ্য। সেখানকার অধিকাংশ এলাকা ওই সাম্রাজ্যের হাতে। যুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্য ও জার্মানির পরাজয় নিশ্চিত বুঝে অটোমান সাম্রাজ্যমুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র কেমন হবে তা-ই নিয়ে বিজয়ী দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশ—ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপন পরিকল্পনা আঁটে। কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের মহানায়ক ছিলেন ব্রিটিশ কর্নেল স্যার মার্ক সাইকেস ও ফরাসি কূটনীতিক ফ্রান্সোয়া পিকট (Sykes-Picot Agreement in 1916)। অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর জন্ম নেওয়া সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, লিবিয়া, আলজেরিয়া তার মানুষের হাতে গড়ে ওঠেনি। তাদের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল ব্রিটিশ ও ফরাসিদের হাতে। স্থানীয় পরিচয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, ভাষাভাষী-জাতিপরিচয়কে গুরুত্ব না দিয়ে। ভৌগোলিক অবস্থানকে উপেক্ষা করে। ওই গোপন চুক্তির কথা কেবল ফাঁস হয়েছিল ১৯১৭ সালে। রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের রাজনৈতিক সহযাত্রী ট্রটস্কি ২৪ নভেম্বর ১৯১৭ সালে ওই চুক্তি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন জারের নথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে। লেনিন চুক্তিকে 'ঔপনিবেশিক চোরদের মধ্যকার সমঝোতা' বলে ধিক্কার জানিয়েছিলেন (দ্য এগ্রিমেন্ট অব দ্য কলোনিয়াল থিভস)। খবরটি ওই দিনে মস্কোর *ইজভেস্তিয়া* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

তবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র আঁকার ষড়যন্ত্র একেবারে এলোপাতাড়িভাবে হয়নি। ব্রিটিশ কূটনীতিকেরা ইচ্ছামতো আঁকলেও সেখানে তেল এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দিকটি তাঁরা উপেক্ষা করেননি। সে সময় ইরানের তেলখনিগুলো নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশরা। ফরাসি-ব্রিটিশ গোপন চুক্তিতে ইরাক ব্রিটিশদের দখলে থাকার কথা। এদিকে ব্রিটিশের শত্রু জার্মানরা ছিল টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির প্রধান অংশীদার। ইরাক দখলের পর ব্রিটিশরা ওই কোম্পানিকে ইরাকি পেট্রোলিয়াম কোম্পানি নামে নামকরণ করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ প্রায় একচেটিয়াভাবে চলে আসে ব্রিটেনের হাতে। চুক্তির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রতিবাদ যে করেননি, তা নয়। প্রতিবাদ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নেতা মধ্যপ্রাচ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন অভিন্ন আদর্শ দিয়ে। কখনো নাসেরবাদ, কখনো বাথ আদর্শে আরব প্রজাতন্ত্র গড়ার নানা প্রচেষ্টা তারই অংশ। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ভন্ডুল হয়ে গেছে অভ্যন্তরীণ বা আন্তদেশীয় কোন্দলের কারণে। আজ মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ পাচ্ছে নানাভাবে। ইরাকে জাতিগত বিরোধ তুঙ্গে। শিয়া-সুন্নি বিরোধ ছাড়াও রয়েছে কুর্দি বা ইয়াজেদি জাতিগোষ্ঠীর অসন্তোষ। যে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র জাতির আত্মপরিচয়ের পূর্ণ স্বীকৃতি দেয় না, সেই রাষ্ট্রকে নিজেদের বলে ভাবা কঠিন। একই সমস্যায় জর্জরিত সিরিয়া। সেখানে ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ২০টি সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল ওই জাতিগত সমস্যার কারণে। ক্ষমতাসীনেরা রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছে। নতুন দেশের স্বাক্ষর হিসেবে নতুন পতাকা উড়েছে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং কৃত্রিমতা ঢেকে রাখা যায়নি। আজ তার খেসারত দিচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার ধারক এই বিপুল জনগোষ্ঠী।

ভারতীয় উপমহাদেশে জাতিরাষ্ট্রের সংকট একই কারণে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাগ হলো। বাংলা ও পাঞ্জাব ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হলো। ডুরান্ড লাইন এঁকে আফগানিস্তানকে ভাগ করা হলো। একাংশ পড়ল পাকিস্তানে। বাকিটা আফগানিস্তানে। একজনের রান্নাঘর থাকল পাকিস্তানে আর শোবার ঘর আফগানিস্তানে। ব্রিটিশ ভারতের পররাষ্ট্রসচিব স্যার মর্টিমার ডুরান্ড ১৮৯৩ সালে দৈর্ঘ্যে ২ হাজার ৬৪০ কিলোমিটার লম্বা ওই লাইন টেনে আফগানিস্তানের পুশতুনস্থানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তানকে বেশ কয়েকটি প্রদেশের ভার ব্রিটিশ ভারতের হাতে তুলে দিতে হয়। তার মধ্যে সোয়াত, চিত্রাল, চাগি। আরও ছিল বেলুচিস্তান। বিনিময়ে আফগানিস্তান পেল নুরিস্তান, আসমারসহ কিছু প্রদেশ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর আফগানিস্তান পাকিস্তানের কাছে পাঠানদের আন্তনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করলেও পাকিস্তান বা

ব্রিটেন রাজি হয়নি। ওই ইস্যু আজও দুই দেশের আত্মপরিচয়গত সমস্যার মূল কারণ। উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিমবিদ্বেষ স্থায়ী রূপ নিয়েছে ওই ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের কারণে। তারই কারণে ঘটছে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ঘটনা, ট্রেনে আগুন ধরিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রী হত্যা, গুজরাটে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা। বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে নিপীড়ন সে-ও ওই ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িকতার প্রলম্বিত রূপ। দেশ বিভাগের কলঙ্ক এখানে শেষ হয় না। কয়েক লাখ হিন্দু-মুসলিম হত্যা, কয়েক কোটি মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার নিদারুণ দুঃখের কাহিনি ওই ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে। তাকে হিন্দু-মুসলিম সহিংসতার ঘনায়িত মেটাফর বললে ভুল হবে না। এ অঞ্চলের মানুষ কোথাও সঠিক জাতিপরিচয় নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে না। সেই পরিচয়ের সংকট দিন দিন আরও গভীর হচ্ছে। বিকল্প হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মের প্রতি আবেদন।

আফ্রিকার চিত্রটি ভিন্ন না। সেখানেও উপনিবেশবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে রেখে গেছে নানা জটিলতা। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ১৮৮৪-৮৫ সালের দিকে। জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক ষড়যন্ত্রের প্রধান গুরু। ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়ে ওই বছর তিনি এক সম্মেলন ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য—কীভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে আফ্রিকার সম্পদকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করা যায়। যে সিদ্ধান্ত ওই সম্মেলনে নেওয়া হয়েছিল তার ওপর নির্মিত হয়েছিল আফ্রিকার রাষ্ট্রকাঠামো, প্রতিটি দেশের সীমানা। সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল জার্মানি, হল্যান্ড, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পর্তুগাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কারণ, লাইবেরিয়ার ওপর তার স্বার্থ ছিল। আরও অংশ নিয়েছিল রাশিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইতালি, তুরস্ক। আফ্রিকা থেকে কোনো প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। যদিও উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকাকে সভ্য করা, খ্রিষ্টান ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়া এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বলা হয়, ইউরোপের যেকোনো দেশ আফ্রিকার যেকোনো অঞ্চলের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকার রাখে, যদি তার সামরিক বাহিনী সেই অঞ্চলে অবস্থান করে এবং স্থানীয় কোনো আফ্রিকান নেতার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। যেসব আফ্রিকান রাজা বা গোত্রনেতা ওই জাতীয় চুক্তিতে সই করেন, তাঁরা জ্ঞাত ছিলেন না কিসে তাঁরা সই করছেন। অথচ চুক্তি সই করে ইংল্যান্ড হাতে পেল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কায়রো পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল। ফ্রান্সের ভাগ্যে জুটল পশ্চিম আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া থেকে চাদ, গ্যাবন ও কঙ্গো। বেলজিয়াম পেল কঙ্গোর একাংশ। পর্তুগালের হাতে এল মোজাম্বিক ও এঙ্গোলা। ইতালির ভাগে সোমালিয়া ও ইথিওপিয়া। জার্মানির জন্য বরাদ্দ হলো নামিবিয়া ও তানজানিয়া। উপনিবেশ শাসন শেষ। আফ্রিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠল স্থানীয়

মানুষের পরামর্শ বাদে। জাতিগত চরিত্রকে গুরুত্ব না দিয়ে। ভাষাকে আমলে না নিয়ে। ভাষাভিত্তিক, জাতিভিত্তিক সংকটের প্রেক্ষাপটে গৃহযুদ্ধ আর আন্তদেশীয় সংঘাত স্থায়ী রূপ নিল। তার সমাধান হিসেবে মানুষ দেখল ধর্মকে।

সংকটের তৃতীয় উৎস বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের কারণে স্থানীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। শক্তিশালী দেশের সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় সংস্কৃতি তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে। শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী দেশ অন্য সংস্কৃতির ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। প্রভাবশালী দেশ বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপকে বুঝলে চলবে না। প্রতিবেশী দেশ ভারতও এ ক্ষেত্রে কম শক্তিধর নয়। তার সংস্কৃতি প্রভাবিত করছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে। সংস্কৃতির সঙ্গে মাটির (sense of place) সম্পর্ক বিলুপ্ত হচ্ছে। বিলুপ্তির দুটি কারণের একটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী টোনিজ (১৮৮৭-১৯৭১) সমাজকে নিয়ে এক অদ্ভুত কাজ করেছিলেন। সমাজকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন কী কারণে প্রাক্-আধুনিক সমাজে (Gemeinschaft) মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং উষ্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। আধুনিক সমাজে (Gesellschaft) সম্পর্কের ধরন অস্থায়ী, হালকা, অগভীর, চুক্তিভিত্তিক ও স্বার্থভিত্তিক। বস্তুগত উন্নতির কারণে আধুনিক সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। সেই বিচ্ছিন্নতা আরও ঘনীভূত হচ্ছে বিশ্বায়নের কারণে। বিশ্বায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পাঁচটি প্রবাহ। সেই প্রবাহগুলো মানুষকে তার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। আধুনিকতাকে আমরা গ্রহণ করছি তার পূর্বশর্ত আমাদের সমাজে আছে কি না, না ভেবে। যারা দেশ ত্যাগ করে বিদেশে উন্নত জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তাদের মধ্যেও আত্মপরিচয়ের সংকট দিন দিন প্রবল হচ্ছে। দেশের মাটিতে যে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং জন্মভূমির ওপর শক্ত দাবি তারা ভোগ করত, তার সুযোগ নতুন দেশে নেই। বিদেশি সংস্কৃতির প্রতীক, জীবন এবং চালচলন সবই আত্মচেতনাকে আঘাত করছে কেবল প্রবাসে নয়, স্থানীয় পর্যায়ে। আধুনিক সংস্কৃতির সাহচর্য থেকে দূরে সরে এসে মানুষ আঁকড়ে ধরছে ধর্মকে।

নৃবিজ্ঞানী আপাদুরাই (Appadurai 1990: 4) বিশ্বায়নের কারণে সৃষ্ট প্রধান প্রবাহগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে এই বিচ্ছিন্নতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। একটি প্রবাহ মানুষকে (Ethnoscapes) এক স্থান থেকে নিচ্ছে অন্য স্থানে। এরা ভ্রমণকারী, উদ্বাস্তু, অভিবাসী, অতিথি শ্রমিক। আরও আছে অগণিত মানুষ, যারা সর্বক্ষণিকভাবে গতির সঙ্গে বাঁধা। মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হচ্ছে নানা কারণে। গ্রাম থেকে মানুষ স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে শহরে। উদ্বাস্তুরা জন্মভূমি ছেড়ে যাচ্ছে উন্নত দেশে। অতিথি শ্রমিক গ্রাম ছেড়ে আশ্রয়

নিচ্ছেন বড় শহরে। মানব শ্রমের এই স্রোতোধারা কেন তীব্র আকার ধারণ করল, তার মূলে কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজির চরিত্রগত পরিবর্তন দায়ী। আন্তর্জাতিক পুঁজি তার সুবিধামতো স্থান বদলাচ্ছে। পুঁজির বাসভূমি নির্ভর করছে মুনাফার পরিমাণ কোথায় বেশি। এই অস্থিতিশীল জীবনে মানুষের কল্পনার কোনো স্থায়িত্ব নেই। সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানের যোগাযোগ নেই। সংবাদ এবং তথ্যের ক্ষেত্রেও চলছে (Mediascapes) একই ধারা। সেই সঙ্গে আছে আদর্শের প্রবাহ (Ideoscapes)। নানা আদর্শের চাপে আমাদের মন প্রভাবিত। প্রবাহগুলো বিশ্বযোগাযোগকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বটে। কিন্তু জন্ম দিচ্ছে বিচ্ছেদের। নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন এবং ছায়াছবির মাধ্যমে বহু চিত্র মানুষের সামনে হাজির হচ্ছে ক্রমাগত। সেগুলো মূলত বিজাতীয়। স্থানীয় জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না। প্রতিফলিত করছে খণ্ডিত বাস্তবতাকে (Tomlinson, 2012:148) অথবা এমন বাস্তবতাকে, যা অন্য দেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া। ইউরোপীয় বা আমেরিকার আদর্শের প্রচার, সে দেশের ধারণা, প্রত্যয় (concepts & images) বিশ্বজনীন হিসেবে চালিয়ে দিলেও অন্যান্য সমাজে তার ভিত অত্যন্ত দুর্বল। স্থানীয় শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে তার অভ্যন্তরীণ যুক্তি হারিয়ে ফেলছে (lack of internal logic)। মিডিয়া চলচ্চিত্র যে ধরনের কল্পিত এবং মিথ্যা জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছে (Simulacra), তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে পাচ্ছি উল্টো ফল। এই অভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বাহ্যিক বৃদ্ধি হলেও বিলুপ্তি ঘটছে স্থান (sense of place) সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি। যে বিশ্বে আমরা বাস করছি, সেই বিশ্ব যেন শিকড়হীন এক বাস্তবতা।

এই পরিস্থিতিতে ধর্মই আজ আত্মপরিচয়ের মূল উৎস। মানুষ আধুনিক কালের নেতাদের কথা শুনতে চায় না। তারা পূর্বপুরুষের ইতিহাস খুঁজতে চায়। নিজ ঐতিহ্য ধারণ করতে চায়। দেশীয় বীরদের আদর্শকে প্রতিফলিত করতে চায়। এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মীয় এবং গোত্রভিত্তিক আত্মপরিচয়। ধর্মকে ঘিরে গড়ে উঠছে নানা আন্দোলন, যেগুলোর পুরোটাই আধুনিকতাবিরোধী। প্রবণতাটি কেবল যে বিশেষ কোনো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, তা নয়। ইসলামি রাষ্ট্র নির্মাণের স্লোগানে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ভাঙনের অশনিসংকেত রয়েছে। সেই সংকেত কেবল জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রকে না, রাষ্ট্রের বহুজাতিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে উদ্ধত। সংখ্যালঘুর বিষয়কে প্রধান ইস্যু করে তাদের নির্মূল করার পরিকল্পনা আঁকা হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের মূল ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে নতুন ধাঁচের রাষ্ট্র গড়ে তোলা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ঠিক সেই ধাঁচে বাংলাদেশে চলছে হিন্দুদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র। সুন্নিপ্রধান দেশ চাইছে শিয়াদের উৎখাত

করতে। ইয়াজেদিদের ধ্বংস করতে। কুর্দিদের বিতাড়িত করতে। ওই একই চিত্র লক্ষ করি ইরানের শিয়া বিপ্লবে। সেখানেও সংখালঘুদের ওপর নেমে এসেছে নিপীড়ন। ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজেপির উদ্দেশ্য একই। মিয়ানমারে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রোহিঙ্গাদের উৎখাত করতে চায়। পাকিস্তানে সুন্নিরা মোহাজিরদের উৎখাত করতে প্রস্তুত। আফগানিস্তানে হাজারা সম্প্রদায়কে দেশান্তরিত করা সুন্নি সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। শিয়াপ্রধান দেশকে সুন্নিমুক্ত করা, সুন্নিপ্রধান দেশকে শিয়ামুক্ত করা, ইউরোপকে মুসলিমমুক্ত করা আজ সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এসবই ঘটছে ধর্মের আবরণে।

চার

বাংলাদেশে ধর্মের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায় শ্রেণিগত অবস্থান কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে সেটি দেখার বিষয়। অন্যান্য দেশের মতো এখানেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেশীয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে অবিযুক্ত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে মধ্যবিত্ত অতীতে নিরন্তরভাবে কাজ করে গেছে। ১৯৫২ সালে তার পেশিশক্তি তেমন ছিল না বলেই ধারণা করি। অথচ হাতে গোনা কিছু শহুরে শিক্ষিত যুবক রুখে দিয়েছিল পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকে। রক্ত ঝরিয়ে রক্ষা করেছিল বাংলা ভাষাকে। ষাটের দশকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশ নিয়ে মুক্ত করে দেশমাতাকে। ক্ষুদ্র আয়তনের সেই শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি দাপটের সঙ্গে সমাজের কর্ণধার হয়ে কাজ করল রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে। তার হাত ধরে গড়ে ওঠে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা; তার অনুপ্রাণন থেকে জন্ম নেয় স্বাধীন দেশের স্বপ্ন, স্বপ্ন বাস্তবায়নের নানা কলাকৌশল। সত্যিই যখন বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো, তখন তার ঘাড়ে চাপল তাকে আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ করার গুরুদায়িত্ব। কিন্তু কালের শাশ্বত ধারা থেমে নেই। এই শ্রেণির শক্তি আজ ক্ষয়িষ্ণু। সমাজকে দেওয়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব সে পালন করেছে জাতি পরিচয়ভিত্তিক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়ে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতিরাষ্ট্রের বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ আমাদের দেশে শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু তার ভিত এখনো প্রবলভাবে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। শক্ত স্তম্ভ বলতে বুঝি একুশে ফেব্রুয়ারিকে। ভাষা আমাদের জাতি পরিচয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রধান স্তম্ভ। দিনটি বাঙালি মননে দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। স্বাধীনতা দিবসকেও আমি জাতীয় ঐক্যের স্তম্ভ হিসেবে ভাবি। ওই দিনটি জাতির জীবনে অনন্য এক ঘটনা। তাকে ঘিরে

জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসও আবেগময় একটি দিন। রাজনৈতিক আন্দোলনের আরও কিছু মাইলফলক আপামর জনগণের কাছে স্বীকৃত। তাদের ঘিরে রাষ্ট্রের ইতিহাস শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে। ছয় দফা আন্দোলন, গণহত্যা দিবস, বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস সেই আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম। বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পয়লা বৈশাখ পালিত হয় দেশ-কাল-পাত্রনির্বিশেষে। রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের জীবনে বড় স্থান দখল করে আছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও স্থান করে নিয়েছে কিছুটা হলেও। জাতি পরিচয়ের এই সব দিক সুবিন্যস্ত কাঠামোর মধ্যে সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে যেভাবেই হোক বেড়ে উঠছে। তবে এই সাফল্য আমাদের পূর্ণ স্বস্তি দেয় না। এই প্রাপ্তিগুলোকে নস্যাৎ করার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আছে। তাদের মধ্যে ইসলামি পরিচয়ভিত্তিক কিছু গোষ্ঠী প্রধান। ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকে তারা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে। স্বাধীনতাযুদ্ধকে তারা দেখে ভারতের ষড়যন্ত্র হিসেবে। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার অপরাধকে তরলীকৃত করে মৃতের সংখ্যা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসকে পালনযোগ্য দিন মনে করে না। পয়লা বৈশাখ পালন তাদের মনঃপূত না। রবীন্দ্রনাথকে নজরুলের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ রচনা করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে তারা চায় মোল্লাতন্ত্র। জাতি পরিচয়ভিত্তিক যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তার বদলে তারা বাংলাদেশকে চায় ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে।

কীভাবে এই শক্তির উদয় হলো, সেটি বুঝতে হলে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ধর্মের প্রতি আমাদের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে। সেই পরিবর্তন এল বিশ্বায়নের প্রতিফল হিসেবে। বিশ্বায়ন আন্তদেশীয় যোগাযোগ বাড়িয়ে মানুষকে গা-ছোঁয়া দূরত্বে আনল। মানুষ দেশত্যাগী হলো। মহাসমুদ্রের সুনামির মতো স্বদেশের ঘাঁটি ছেড়ে জনপ্রবাহ আছড়ে পড়ল মধ্যপ্রাচ্য বা আরও কোনো দেশের উপকূলে। পরিবেশের চাপে বৃদ্ধি পেল ধর্মের বাহ্যিক দিকের প্রতি আনুগত্য। পোশাক-আশাকে, ধর্মীয় কর্তব্য পালনে। এই বিশাল শ্রমশক্তির ধর্মাচার, জীবন প্রথা, জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি আর ধর্মীয় সচেতনতার ঝরনাধারা সময়ের ব্যবধানে পৌঁছে গেল বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুজনের কাছে। একই সঙ্গে সৌদি আরব বা গালফ দেশগুলোর অর্থসহায়তায় গড়ে উঠল মাদ্রাসাশিক্ষার বিশাল নেটওয়ার্ক। সেখানে স্থান পেয়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সন্তান, যাদের পক্ষে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া নানা কারণে কঠিন। আরও লক্ষ করি, মধ্যবিত্তের মনোজগতের বিবর্তন। অর্থের দিক থেকে যারা বিত্তশালী, তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরণে তারা এগিয়ে এল উদার হাতে। স্কুলের বদলে নির্মাণ করল

মাদ্রাসা। অঢেল আর্থিক সহায়তা দিল মসজিদ নির্মাণে। এভাবে দেশজুড়ে সৃষ্টি হলো ধর্মীয় আবেশের বিশেষ এক ধারা, রক্ষণশীলতার বিস্তৃত বলয়, যা এগিয়ে চলেছে অপ্রমত্ত গতিতে।

এই প্রবাহের অন্তরালে জন্ম নিয়েছে নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরা গ্রামের বাসিন্দা, শহরের নয়। তাদের মধ্যবিত্তের মর্যাদা দিতে শহর এখনো ইতস্তত করে। কারণ, মধ্যবিত্তের আবাসস্থল বলতে এতকাল শহুরে মধ্যবিত্তকে বোঝানো হয়েছে। আজ এই শ্রেণির অঙ্কুরিত উপস্থিতি চার দশক ধরে ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে। তার কল্যাণে আমরা শ্রমশক্তি পাঠিয়েছি মধ্যপ্রাচ্যে। এমন পরিবার বাংলাদেশে নেই, যাদের সন্তানসন্ততিরা প্রবাসে নেই। সেই দেশত্যাগীদের ভূমিকা সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করা সহজ হতে পারে। কিন্তু তার সামাজিক প্রভাব কী অপরিসীম, সেটি আজও উপলব্ধি করিনি পরিপূর্ণভাবে। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ শুনেছি তাদের প্রেরিত অর্থ থেকে। ন্যূনতম খাওয়া-পরার চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি অর্থ তারা পাঠায় স্বদেশে। সেই চুইয়ে পড়া ঐশ্বর্যের কল্যাণে গ্রামের ঘরে ঘরে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, এসেছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। জন্ম নিয়েছে নতুন মধ্যবিত্তের। যে কাজটি এখনো বাকি সেটি হচ্ছে, বৃহত্তর সমাজে তার স্বীকৃতি। সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতির বাসনা (রাজনৈতিক ও সামাজিক) তার অন্তরে যে নেই, তা নয়। বস্তুত অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে সেটি আজ অনেক বেশি তীব্র। আজ তারাই মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় বাহিনী।

গ্রামীণ এই নব্য মধ্যবিত্ত এখনো নবীন। পরিবর্তনের প্রধান শক্তি হিসেবে সুপ্ত। কিন্তু তার সমষ্টিবদ্ধতা ক্রোধান্বিত আগ্নেয়গিরির মতো। বিস্ফোরিত হতে যে প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ শক্তি মজুত করতে হয়, সেই শক্তি এখনো তার গহ্বরে ঠিক ঠিক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু প্রস্তুতি যে চলছে না, তা বলি কী করে। নব্য মধ্যবিত্তের অগ্রবাহিনী হিসেবে রয়েছে মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্রদের সুশৃঙ্খল বাহিনী, যাদের শৃঙ্খলাবোধ সামরিক বাহিনীর মতো নিখুঁত। যারা আদেশ পালনের অপেক্ষায় থাকে। আদেশকে জীবন দিয়ে মান্য করে। ঠিক ওই গুণাবলির কারণেই কিন্তু তাদের সমগোত্রীয় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ১৯৭৯ সালের বিশ্বকাঁপানো ইরানের ইসলামি বিপ্লবের অগ্রবাহিনী হিসেবে সফল হয়েছিল। যে শক্তির বলে আফগান তালেবানরা ধরাশায়ী করেছিল মুজাহিদিনদের, সেটিও পাকিস্তানের হাক্কানি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্কের কল্যাণে। ফলে শক্তির কথাই যদি ভাবি তাহলে ভুল হবে যদি এদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে অবমূল্যায়ন করি। যদি ধারণা করি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখা কীভাবে আঁকা হবে, সেটি নির্ভর করছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির (শহুরে নব্য মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ নব্য মধ্যবিত্ত) অভ্যন্তরে শক্তির ভারসাম্য কোন দিকে গড়াবে তার ওপর।

বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখানে গ্রামীণ নব্য মধ্যবিত্তের পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে নব্য শহুরে মধ্যবিত্ত। আমাদের দেশে শ্রম সস্তা। সেই সুসংবাদটি বাকি পুঁজিবাদী বিশ্বে অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই শ্রম এমনই সস্তা যে তার মূল্য বিদেশে বিক্রি হওয়া বোতলজাত জলের চেয়েও কম। সস্তা শ্রমশক্তির আকর্ষণে বিমোহিত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেশ ত্যাগ করে পাড়ি দিল আমাদের মতো গরিব দেশে। প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যে বৈশ্বিক রূপ নিলেও আমাদের ক্ষেত্রে এটি ঘটল কিছুটা বিলম্বে। বিদেশ থেকে এল কাঁচামাল, পুঁজি ও যন্ত্রপাতি। দেশীয় মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণি ওই পুঁজি এবং কাঁচামালের সঙ্গে স্থানীয় শ্রমকে যুক্ত করে বিগত চার দশকে ফুলেফেঁপে উঠল। বিপুল সম্পদের মালিক হলো। যে অবকাঠামো তারা গড়ে তুলল, তার কল্যাণে জন্ম নিল নব্য মধ্যবিত্তের এক শ্রেণি। এরা শহরের বাসিন্দা। এদের হাতে গড়ে উঠতে দেখি আধুনিক পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার নানা অঙ্গন, যার মধ্যে রয়েছে বিদেশি স্টাইলে নির্মিত হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুডের দোকান, মার্কিন বা পশ্চিমা ধাঁচের জীবনযাপনের বহুবিধ উপকরণ। এভাবে আমরা জড়িয়ে পড়ি বিশ্বায়নের আবর্তে। শহুরে মধ্যবিত্তের প্রতি অবিচার করা হবে যদি তাকে মূল্যায়ন করি কেবল নেতিবাচক অর্থে। আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার একাংশ আধুনিকতার প্রভাবে বেড়ে উঠছে। ফলে আদর্শ হিসেবে ওই আধুনিকতার ছোঁয়া স্থান করে নিচ্ছে তার মননে। যদিও ওই মনন এখনো অনেকটা অপরিপক্ব, বহুলাংশে দোদুল্যমান, অগঠিত ও অনিশ্চিত। ফলে আদর্শিক শূন্যতার যে কৃষ্ণকায় গহ্বরে শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনযাপন, সেই শূন্যতা তাকে নপুংসক করে রেখেছে। জানা নেই কীভাবে সেটি পূরণ হবে। এভাবে আমাদের দেশে স্থান করে নিয়েছে পৃথক দুই শ্রেণি। একদিকে রয়েছে ভাসমান আধুনিকপন্থী ভুঁইফোড় এক সমাজ, যারা বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যাদের ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি ওই পুঁজির ওপর নির্ভরশীল। এদেরই বিপরীতে রয়েছে গ্রামীণ নব্য মধ্যবিত্ত। বিদেশে খেটে খাওয়া শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধি। গ্রামীণ মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের বোঝা নিয়ে শহুরে মানুষের কাছে যারা মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত। এভাবে গড়ে উঠেছে সামাজিক বিভক্তির শক্ত দেয়াল। সেই সঙ্গে একে অপরকে প্রতিরোধ করার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা এখনো হয়তোবা রয়ে গেছে ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে।

ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশের জন্য একটি উপযোগী রাজনৈতিক আদর্শের প্রয়োজন হয়। সেই ধরনের আদর্শিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বহুদিন ধরে আমাদের দেশে লক্ষ করেছি। আদর্শের দিক থেকে গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সঙ্গে পুরোনো মধ্যবিত্তের চারিত্রিক ভিন্নতা গভীর বলেই ধরে নিতে পারি। সত্তর দশকে শহুরে মধ্যবিত্তের আদর্শের খুঁটি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। যে নব্য

গ্রামীণ মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটল, সেই শ্রেণি ওই আদর্শে বিশ্বাস করে না। তার আত্মপরিচয় এবং সামাজিক অবস্থানকে সে নির্দিষ্ট করেছে ধর্মকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। যে আদর্শিক সংকট বাংলাদেশে আত্মপরিচয়ের সংকটে রূপ নিয়েছে বলে ধারণা করি, তার সমাধান হিসেবে তারা ধর্মকে দেখে। বাংলাদেশকে তারা গড়তে চায় নতুন ধাঁচে। নতুন ধাঁচে গড়তে হলে প্রয়োজন শক্তিশালী রাজনৈতিক আশ্রয়ের। দেশে নানা ধরনের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল আছে। তাদের দলীয় ইশতেহার আমাদের জ্ঞাত। কিন্তু সেগুলো আমাকে নিবিড়ভাবে উৎসাহিত করে না। অধিকাংশ ধর্মীয় দল শহুরে মধ্যবিত্তের একটি অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই অংশের মনে সমাজ পরিবর্তনের স্পৃহার অভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ অংশটি নানা দূষণে আক্রান্ত। ভোগবাদী শহুরে জীবন তার রাজনৈতিক অনুভূতিশীলতাকে দুর্বল করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তার জীবনে বিলাসিতা বা স্বাচ্ছন্দ্যের ঘাটতি নেই। তাদের পক্ষে আন্দোলনমুখর হওয়া বা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া কতটুকু বাস্তবসম্মত, সে বিষয়ে রয়েছে সংশয়। নিজেদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিকে আরও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে তারা আন্দোলনী হবে, এর সম্ভাবনাও আমি দেখি না। ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত, রাজনৈতিক মতপার্থক্য তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে বিঘ্নিত করে না। রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হওয়ার সক্ষমতা ইসলামি দলগুলোর নেই। তাদের গায়ে একাত্তরের দূষণ লেগে রয়েছে। তা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো উদ্যোগ তারা কখনো নেয়নি। অতীতে বাংলাদেশকে তারা কেবল বিরোধিতা করেনি, তার স্বীকৃতি নেই তাদের রাজনৈতিক ঘোষণাপত্রেও। নেই দুষ্কর্মের অনুসূচনা। অথচ সেই দূষণ জাতির জীবনে কলঙ্ক হয়ে আছে। সবকিছুর ওপরে রয়েছে পবিত্র ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীল ব্যাখ্যাশ্রিত রাজনৈতিক মতাদর্শ। সেটি উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেয়।

গ্রামীণ নব্য মধ্যবিত্তের আশ্রয়স্থল বলতে আমি বুঝি বাংলাদেশের আড়াই হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে গড়ে ওঠা দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী এক বাহিনী। তার নাম হেফাজতে ইসলাম। গ্রামের নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাব্যবস্থার সঙ্গে তারা যুক্ত। মানুষের কাছে তাদের ভাবমূর্তি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা হলেও কলুষতামুক্ত। তারা রাজনীতির চর্চা করে না বলে কথিত। তাদের অবস্থানটি সমাজে কতটুকু স্বীকৃত, জানি না। অনেকে অভিযোগ করবেন তারা জামায়াতে ইসলামী বা শিবিরেরই সমগোত্র। রাজনৈতিক সংকট মুহূর্তে তারা ঝুঁকবে তাদের দিকে। বাংলাদেশকে যারা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে, যাদের মন বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি আন্দোলিত করে না, তাদের জন্য হেফাজতে ইসলাম নিঃসন্দেহে এক অনন্য ব্যতিক্রম। এই শক্তির ঘনত্ব

কতটুকু তার আভাস দেশবাসী ইতিমধ্যে পেয়েছে বলে ধারণা করি। এবার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হেফাজতে ইসলামের লাখ লাখ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করল। রাজধানীতে তারা এল ইসলাম ধর্ম রক্ষার দাবি নিয়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বাংলাদেশের ব্লগার। নারীদের 'অশালীনতা'র বিরুদ্ধে তারা ক্ষুব্ধ। সঙ্গে আরও যুক্ত করল বেশ কিছু দাবি। এই দাবির মধ্যে শাসনতন্ত্রে আল্লার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা—এই ঘোষণা শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যেকোনো উক্তির শাস্তি হতে হবে মৃত্যুদণ্ড। নাস্তিক ও ব্লগারদের বিরুদ্ধে নিতে হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা। বন্ধ করতে হবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। স্কুলে ইসলামিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আহমদিয়াদের অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। মিডিয়ায় ইসলামপরিপন্থী খবর ছাপা নিষিদ্ধ করতে হবে। সব মিলিয়ে দাবির সংখ্যা মোট ১৩। দাবিগুলো সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হোক, সেটি তারা চায়। তবে তাদের প্রতিবাদ কেবল দাবিগুলোর মধ্যে সীমিত নয়। তারা চায় ইসলামপন্থী সরকার। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ধারণায় নাস্তিক ও নাস্তিকতাকে উৎসাহিত করে। সে কারণে ওই সরকারের উৎখাত তাদের কাম্য। এমন প্রকটভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন আর কখনো উত্তপ্ত হয়নি। উত্তেজনা আর আশঙ্কা শেষ হলো বটে। বিরোধিতার আগুন থেকে গেল ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে। এক গুমোট পরিস্থিতি টিকে আছে ঠিক সমুদ্রে নিম্নচাপের আগমুহূর্তের মতো। ধর্মীয় শক্তির শক্তিশালী অন্তঃস্রোত সমাজদেহে বইছে। উদ্দেশ্য জাতিপরিচয়ভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে প্রতিস্থাপন করা। তাদের শক্তির কাছে আজ নতজানু বাংলাদেশ সরকার। যদিও জানি না সেটি কতটুকু রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে বা কতটুকু তার অভাব থেকে। যা-ই হোক, সব মিলিয়ে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগত। আর ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় নিয়ে শহরের নব্য মধ্যবিত্ত ক্রমাগত নিমজ্জিত হচ্ছে আদর্শগত সংকটে।

ধর্ম ও আধুনিকতা নিয়ে এটিই অবশ্য শেষ কথা নয়। জানি ধর্মকে রাজনীতির মুখ্য ভূমিকায় আনার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নই দায়ী। কিন্তু ওই বিশ্বায়নই আবার ধর্মীয় শক্তির অভ্যন্তরে জন্ম দিচ্ছে সুগভীর পরিবর্তন। সেই ধারায় ধর্মের সামাজিক অবস্থান প্রশ্নের বাইরে নেই। মানতে হবে বিশ্বায়নের কারণে আমাদের সমাজ ভোগবাদী সংস্কৃতির মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে। প্রতিটি শ্রেণির জীবনে সেই সংস্কৃতি নানা ধরনের আঁচড় রেখে যাচ্ছে। কেবল শহুরে আধুনিকমনা মধ্যবিত্ত তার প্রভাবে আক্রান্ত হচ্ছে না। ধর্মীয় সংগঠন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, বিমা, বহির্বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে গড়ে তুলেছে বিশাল নেটওয়ার্ক, তারাও

হচ্ছে প্রভাবিত। ভোগবাদী এই সংস্কৃতি খাদ সৃষ্টি করছে তাদের জিহাদি চরিত্রে। ভোঁতা হয়ে আসছে তাদের ধার। ধর্মীয় জিহাদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বের হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বার্থ। ধর্মকে তারা ব্যবহার করছে পোশাকি আবরণ হিসেবে। এতে করে তীব্রতর হচ্ছে গ্রামের সঙ্গে শহরের বিভেদ। গ্রামীণ মধ্যবিত্তের ধর্মীয়করণ প্রক্রিয়া শহরের তুলনায় এখনো বিশুদ্ধ বলেই ধারণা করি। বিশ্বায়নের প্রভাব গ্রামীণ জীবনে তেমন গভীর প্রভাব রেখে যায়নি। ধর্মকে তারা পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ হিসেবে ভাবে। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের বাস্তবায়ন-স্পৃহা তাদের মধ্যে অনেক বেশি তীব্র বলেই মনে করি। তবে এই অভ্যন্তরীণ স্পৃহা থেকে আবার তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে ফ্যাসিবাদ ও জঙ্গিবাদ।

এরই উল্টো আরেকটি প্রবণতা লক্ষণীয়। ধর্মনিরপেক্ষ শহুরে জীবন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, তারা বাম বা সেন্টার বাম রাজনীতি থেকে ক্রমাগত সরে আসছে ধর্মীয় ডানের দিকে। প্রবণতাটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে লক্ষ করা কঠিন নয়। ক্ষমতায় অবস্থান করে তারা আঁতাত করছে ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হেফাজতে ইসলাম। চলমান ধর্মীয় আবহের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে। তারই প্রভাবে বদলে যাচ্ছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক। দেশের গঠনতন্ত্রে আসছে পরিবর্তন। সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাইকোর্টের ভাস্কর্য। ফলে ধর্মের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আজ মুষ্টিমেয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে নেই। ধর্মের জিম্মাদারি নিতে শুরু করেছে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি। তবে উভয় ক্ষেত্রে সত্য কথাটি হচ্ছে—ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকের প্রতি না যত, তার চেয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রতি দেওয়া হচ্ছে বিশেষ প্রাধান্য। ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতার সংকট এখানেই শেষ হয় না। আধুনিকতার সংকট হচ্ছে দেশের মাটির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার ঘাটতি। আধুনিকতার সবটুকুই আমরা পেয়েছি অনুকরণ থেকে। আধুনিকতা এখানে স্থান পেয়েছে খোলস হিসেবে। তার সামাজিক ও দার্শনিক উপাদানগুলো সমাজজাত নয়। আধুনিকতার নামে অনুকরণ করছি পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক জীবনকে, যে জীবন নিজেই গভীর সংকটে নিমজ্জিত। ফলে আত্মপরিচয়ের বিশুদ্ধতা বা আত্মসত্তার প্রকৃত চরিত্র নিয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠী বলি আর আধুনিকমনা মধ্যবিত্তের কথা বলি—উভয়েই সংকটাচ্ছন্ন। যদি তা-ই হয়, তাহলে আধুনিকতা ও ধর্মের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা আছে কি? জানি সেই সমঝোতা আদৌও সফল হবে কি না, নির্ভর করছে যতটুকু না আমাদের ইচ্ছার ওপর, তার চেয়ে ক্ষমতার ভারসাম্য কোন দিকে ঢলবে, তার ওপর। গ্রামীণ নব্য মধ্যবিত্ত রাজনৈতিকভাবে আরও শক্তি সঞ্চয় করে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে? নাকি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ নিয়ে ভাবে, নিয়ন্ত্রণ করবে দেশীয় সমাজকে?

ধর্মের সামাজিক ভূমিকায় এই দিক পরিবর্তন আশঙ্কা করা গেলেও এটি কি অপ্রত্যাশিত নয় যে ধর্মকে এবার সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া হবে? মার্ক্সবাদ বা অন্যান্য সামাজিক মুক্তিবাদী আদর্শের সঙ্গে ধর্মের সাদৃশ্যের কথা কেউ কখনো গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছে কি না, জানি না। হয়তো এঙ্গেলসের নাম কিছুটা এ ক্ষেত্রে আনা সম্ভব। কারণ যা-ই হোক, তাঁর ভাবনাবিন্যাসে আদি খ্রিষ্টধর্ম মুক্তির আদর্শের মর্যাদা পেয়েছিল। তবে আধুনিক কালে ধর্মযাজকেরা কীভাবে লক্ষ করলেন যে ধর্মকে সামাজিক সমতাবাদী আন্দোলনে নামানো মোটেও গর্হিত কাজ নয়? চিন্তার জগতে তো বটেই, সামাজিক মুক্তির ক্ষেত্রে এ কিন্তু এক অদ্ভুত মোড় পরিবর্তন। আমি লিবারেশন থিওলজি নামে একটি বিশেষ আন্দোলনের কথা ভাবছি। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ ছিল, আন্দোলনটি প্রথমে দানা বাঁধে লাতিন আমেরিকায়। যারা তার সঙ্গে যুক্ত, তাদের অধিকাংশই ধর্মযাজক ঘরানা থেকে আসা। আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিক গুস্তাভ গুটিয়েরেজ (পেরু) রাজধানী লিমার ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রিমাক নামের এক বস্তিতে দরিদ্র ছিন্নমূল জনগণের মধ্যে কাজ। তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাস ফুটে ওঠে *আ থিওরি অব লিবারেশন* (১৯৭৩) এবং *দ্য পাওয়ার অব দ্য পুওর ইন হিস্টোরি* (১৯৮৩) নামের দুটি লেখায়। গুটিয়েরেজের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বেশ বড়সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ধর্মযাজকের দল। তাঁদের একজন ছিলেন হোসে মিগুয়েল বোনিজো। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বুনন *টুয়ার্ডস আ ক্রিস্টিয়ান পলিটিকাল এথিকস* (১৯৮৩) একেবারে ভিন্ন। মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা ধর্মের নৈতিক দায়িত্ব। হোসে পরফিরিও মিরান্দার (মেক্সিকো) লেখা *মার্ক্স অ্যান্ড দ্য বাইবেল*-এ (১৯৭৪) রচনাশৈলীর চমৎকার প্রদর্শনী ওই একই ধারাবাহিকতায়। মার্ক্সবাদের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত এর পাতায় পাতায়। অন্য আরও যেসব খ্যাতিমান ধর্মযাজক এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ধর্মযাজক ফ্রেই বেত্তো একজন। তাঁর লেখা *ফিডেল অ্যান্ড রিলিজিয়ন* একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ধর্মের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনো বৈরিতা তিনি দেখেননি।

ফ্রেই বেত্তোর হাতে শ্রমিক-কৃষক অনুপ্রাণিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। একটি বিশেষ আন্দোলন এই লিবারেশন থিওলজির আওতায় নিকারাগুয়া হ্রদের কাছে সলেন্তিনেম নামে দ্বীপে গড়ে ওঠে। দরিদ্র কৃষক ও জেলেদের মধ্যে খ্রিষ্টের সমতার বাণী প্রচার করে সমাজ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আন্দোলনটির আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভূমিকা মোহিত করার মতো। প্রতি শনিবার চার্চে পবিত্র বাইবেলের অংশবিশেষকে সামাজিক সমতার আলোকে ব্যাখ্যা করা।

মাঝেমধ্যে বাইবেলের সেন্ট লুক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে কেন ধর্ম শোষিতশ্রেণির মুক্তির আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। 'নাজারেথের যিশুখ্রিষ্ট' নামে অংশটি বলছে 'ভগবান আমাকে (যিশুকে) নির্বাচিত করেছেন গরিবদের সাহায্য করার জন্য। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন হৃদয়ে নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্তকে আরোগ্য করতে। বন্দীদের মুক্ত করতে। অন্ধজনকে আলো দান করতে। নিপীড়িতদের মুক্ত করতে।' সমতাভিত্তিক আদর্শের ধারক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মীয় বাণীর সাদৃশ্য দেখিয়ে মানুষকে সমবেত করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এ কাজটিই কিন্তু মার্ক্সবাদেরও আদি কথা। জানি প্রখ্যাত মার্ক্সীয় চিন্তাবিদ আন্তনিও গ্রামসি আদর্শকে অর্গানিক ও নন-অর্গানিক ভাগে ভাগ করেছিলেন। যেভাবে শাসকশ্রেণি ধর্মসহ অন্যান্য আদর্শিক উৎসকে 'ওয়ার অব পজিশনস'-এ ব্যবহার করে, ঠিক সেভাবে গ্রামসি চেয়েছিলেন মেহনতি মানুষের মুক্তির আন্দোলনে ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অংশ নেওয়াকে। মার্ক্সবাদ ও লিবারেশন থিওলজি যে অভিন্ন, তা বলছি না। কিন্তু লিবারেশন থিওলজির মধ্যেই কিন্তু গ্রামসির তাত্ত্বিক অবস্থানের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কিছুটা হলেও।

রাজনৈতিকভাবে লিবারেশন থিওলজির সার্বিক সাফল্য কতটুকু, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে আন্দোলনের মর্মকথা খ্রিষ্টধর্মের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে অন্যান্য ধর্মে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। ইরানের শাহবিরোধী বিপ্লবে শিয়া ইসলাম মুক্তির ধর্মতত্ত্বে পরিণত হওয়ার দিকটি ছিল লিবারেশন থিওলজির বড় সাফল্য; যদিও প্রশ্ন থেকে যায়, একটি মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবনাকে কীভাবে লিবারেশন থিওলজি নামে দস্তখত দেওয়া সম্ভব। তবে পরিণতি যা-ই হোক, লিবারেশন থিওলজি শাহের স্বৈরশাসনকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। নানা আদর্শের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে এই ধারা। তার আদর্শিক কাঠামোর মূলে একটিইমাত্র কথা, পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে ইরানি সমাজকে মুক্ত করতে হবে। পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত আধুনিকতার সঙ্গে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটানোর মূল কাজটি করেছিলেন জালাল আল দিন আহমেদ (১৯২৩-৬৯) নামের একজন ইরানি দার্শনিক। ইরানের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সাহিত্য দিয়ে ইরানকে গড়ে তুলতে হবে—এই ছিল তাঁর মূল কথা। 'ওয়েস্টটক্সিকেশন' নামে একটি লেখায় তাঁর দাবি, পশ্চিমা বিশ্ব জুয়া, বার, দেহ ব্যবসা, হেরোইন, মাদকদ্রব্যের ব্যবহারকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ধরে। কিন্তু তাঁর মতে, এই কু-অভ্যাসগুলো ইরানের সনাতনী ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করছে। তিনি অনুভব করেছিলেন, ইরানি সমাজের প্রাচীন প্রথা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বাদ ও খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে পশ্চিমা আধুনিকতার দ্বন্দ্বটি মামুলি নয়। একেবারে গোড়ায়। পশ্চিমাকরণ আসলে তো একধরনের রোগ। সেই রোগ থেকে মুক্তি পেতে তিনি

নিৎসের আধুনিক যন্ত্রবাদী সভ্যতার সমালোচনার সঙ্গে মার্ক্সের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বকে যোগ করেছিলেন। পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে আক্রমণ করেছিলেন। সঙ্গে আরও যোগ করেছিলেন আলরেয়ার কামু, পল সার্ত্রে, ফ্রানৎসজ কাফকার মতো দার্শনিকদের তত্ত্ব।

জার্মান দার্শনিক হাইদেগারের ভাবনা কিন্তু শিয়া মুক্তি আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল। *বিইং অ্যান্ড টাইম* (১৯২৭) নামের রচনায় হাইদেগারের কেন্দ্রীয় একটি প্রত্যয় 'অথেনটিসিটি' নিয়ে। আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা হারাচ্ছি, ভোগবাদী সমাজ নিজ সত্তাকে উপলব্ধি করার পথ রুদ্ধ করছে, মানুষ অনুকরণ করছে এমন সংস্কৃতি, যা তাদের নিজের নয়। তারা আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলছে। এই দাবিগুলো ইরানি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আহমেদ ফারদিদ (১৯০৯-৯৪) নামে প্রখ্যাত ইরানি দার্শনিক হাইদেগারের এই তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে ইরানি জনগণ তার আদি পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। ইরানের শাসক রেজা শাহ পাহলভি ইরানকে আধুনিক সমাজে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলেন। শিল্পায়নের কথা ভেবেছিলেন। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু আধুনিক সমাজের এই দিকগুলো এমন এক শ্রেণির জন্ম দিল, যারা ধর্ম এবং ইরানের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব রাখে। উদারনীতিবাদ, সন্দেহবাদ ব্যক্তি আচরণে অতিমাত্রিক স্বাধীনতা মানুষের মনকে বিষাক্ত করে। পরিমাপের দিক থেকে ইরানের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্ষুদ্র হলেও আধুনিকতাকে গ্রহণ করে বৃহত্তর সমাজকে তারাই কলুষিত করছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ হিসেবে আকৃষ্ট হচ্ছে ধর্ম এবং অতীত ঐতিহ্যের প্রতি। তাদের কাছে উদারনীতি নাস্তিকতার সমতুল্য। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশমাত্র। তাঁর মতে, একমাত্র শিয়া ইসলাম এবং শিয়া মসজিদগুলো পশ্চিমা প্রভাবে কলুষিত হয়নি।

তবে যদি বলি শিয়া ইসলামকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করলেন কে? সেখানে কিন্তু আলি শারিয়াতি (১৯৩৩-৭৭) একেবারে সবার ঊর্ধ্বে। তাঁর দর্শন পড়া মানে চমক বিস্ময়ে বুঁদ হয়ে যাওয়া। প্যারিসে থাকাকালে সার্ত্রে এবং ফাঁনোর দার্শনিক রচনাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন সত্যিকার সমাজতন্ত্র আর সত্যিকার ইসলামের মধ্যে কোনো বিভেদ না দেখে। ধর্মের মধ্যেই, অর্থাৎ সর্ষের ভেতরই তিনি ভূত দেখেছিলেন। একেবারে যাকে বলে নিশ্চিত হয়ে তিনি বললেন, একধরনের ধর্ম আছে, যেটি সত্য ধর্ম। তার চরিত্র বিপ্লবী এবং মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। তার বিপরীতে আছে মিথ্যা ধর্ম। বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোকে সে রক্ষা করে। সত্য আর মিথ্যা ধর্মের মধ্যে ভেদরেখা টানব কী করে? সেখানেই শারিয়াতির মুনশিয়ানা। তিনি বললেন, ধর্ম

আলোচনায় রেনেসাঁ-পরবর্তী কাল থেকে যে ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে, তাকে বাদ দিতে হবে। ধর্মহীনতা বনাম ধর্ম বা ধর্ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা এই বৈপরীত্য দিয়ে হবে না। বরং প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই দেখতে হবে তার কোন অংশ সত্য, কোনটি মিথ্যা। সেই যুক্তি ধরে শারিয়াতি বললেন, ইরানে দুই ধরনের ইসলাম আছে। একটি প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম, যা মিথ্যা। তার দায়িত্ব বিদ্যমান সমাজ ও তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট শাসকগোষ্ঠীকে রক্ষা করা। যাকে বলে নির্দয়তার উপাসক। অন্যটি সত্য ইসলাম, যা মুক্তির পক্ষে দাঁড়ায়।

সুতরাং তাঁর হাতে শিয়া ইসলাম দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। সাফাভিত শিয়া ইসলাম রেজা শাহের ক্ষমতাকে বৈধতা দিয়েছিলেন বলে তাঁর চরিত্র মিথ্যায় ভরা। ফলে গড়ে তুলতে হবে সত্য শিয়া ধর্ম। তাঁর ভাষায়, আলাভিদ শিয়া ইসলাম, যার রং লাল এবং বিপ্লবী। সাফাভিদ ইসলাম কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আবরণ গায়ে চড়াল, তার ক্রমান্বয়িক কাললিপি আছে। শুরুটা হলো সাফাভিদ বংশের (১৫০১-১৭২২) শাসনকাল থেকে। সে কারণেই ওই নাম। অটোমান শাসন থেকে মুক্তি পেতে সাফাভিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল (১৫০১-২৪) আন্দোলন শুরু করেন। নিজেকে সপ্তম শিয়া ইমামের বংশধর হিসেবে দাবি করে সুন্নি উপাসনাকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করেন। ধ্বংস হয় সুন্নি ইসলামের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির কবর। ইসলামের প্রথম তিন খলিফার বিরুদ্ধে প্রচার চলে। ১৫২৪ সালে ক্ষমতায় আসেন শাহ তাইমাস (১৫২৪-৭৬)। তিনি এবার মোল্লাদের ওপর পবিত্র কোরআন ও শারিয়া বিশ্লেষণের দায়িত্ব দিলেন। সাফাভিদরা অটোমান সুলতান বায়েজিদ-২-এর সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ৯ রবিউল আউয়াল খলিফা ওমরের হত্যা দিবস পালন করল। ওমরের মূর্তি বানিয়ে রাস্তায় মিছিল করল। শিয়া ইসলামের পবিত্র দুই শহর নাজাফ ও কারবালাকে অটোমান শাসন থেকে মুক্ত করে ইরানের কোম এবং মাশহাদ শহরে শিয়া মাজার নির্মাণ করল। ১৬৮৭ সালে সুলতান হোসেন শাহের (১৬৯৪-১৭২২) ধর্মগুরু হলেন মোহাম্মদ বাকির মজলিশি। তাঁর প্ররোচনায় সুফিদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হলো। শিয়া ১২ ইমামকে দেখানো হলো মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার সংযোগকারী হিসেবে। সুফি-মরমিবাদীদের স্থান দখল করে নিল ইমাম ও আয়াতুল্লারা। শারিয়া আইনে যা কিছু নিষিদ্ধ, সেগুলো বন্ধের আদেশ দেওয়া হলো। রাজদরবার থেকে মদ নিষিদ্ধ হলো। কফিহাউস বন্ধ হলো। নাচ, গান, জুয়া, দাবা, মাদকদ্রব্য, ওপিয়ামও। মেয়েদের আর একলা ভ্রমণ নয়। এভাবে রাজতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিয়া ইসলাম ইরানে শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত গড়ে তুলল। জন্ম নিল 'সাফাভিদ শিয়া ইসলাম'।

শারিয়াতির হাতে যে আলাভিদ শিয়া ইসলামের রূপ গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে লাতিন আমেরিকার লিবারেশন থিওলজির সাদৃশ্য থাকলেও আমাদের পক্ষে জানা

কঠিন, তার সঙ্গে তিনি কতটুকু পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে শারিয়াতির হাতে জন্ম নিল 'সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট অব বিলিভারস ইন গড' নামে একটি সংগঠন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল শিয়া ইসলামকে আমলাতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে বের করে আনা। সে কাজটি তাঁর জন্য কঠিন ছিল না। তিনি ভালো করেই জানতেন, প্রতিটি ধর্মই তার শুরুতে বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হজরত মুসা যেমন তাঁর সময়ের সবচেয়ে ধনী পুঁজিপতি কোরার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন প্রধান ধর্মপতি বালামের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয় চরিত্র ফেরাউনের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। ওই একই কথা প্রযোজ্য যিশুখ্রিষ্টের ক্ষেত্রে। তাঁর প্রচারিত ধর্মে বৈপ্লবিক উপাদান ছিল। দাসমুক্তির বাণী ছিল। পবিত্র ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। তার উত্থানপর্বে ছিল বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামো ও সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলাকে আক্রমণ করা। সেই বিপ্লবী উদ্দীপনা শারিয়াতি দেখেছিলেন শিয়া ইসলামের মধ্যে। যেহেতু ইয়াজিদের অবৈধ ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই শিয়া ইসলামের জন্ম, সেহেতু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইনের জীবন দেওয়ার চেয়ে বিপ্লবী আর কী হতে পারে। আত্মোৎসর্গের যে সাক্ষ্য ইমাম হোসাইন দেখিয়ে গেছেন, সেটিই প্রকৃত ইসলাম বা অথেনটিক ইসলাম। কারবালায় আত্মোৎসর্গের উদাহরণই তাঁর ধারণায় ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী। হোসাইন জানতেন, ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। এ-ও জানতেন, ইয়াজিদের বিরুদ্ধে অপ্রতিবাদী হওয়াও একধরনের অপরাধ। বিকল্প হিসেবে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। শহীদ হওয়াকে শারিয়াতি একধরনের সুযোগ বা প্রিভিলেজ হিসেবে দেখেছেন। কারণ, একজন তার নিজের পছন্দমতো মৃত্যুকে গ্রহণ করার সুযোগ পায়। একজন মানুষের মৃত্যু গোটা জাতির অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে ('The dying of a human being guarantees the life of a nation' (p. 63)।

ইমাম খোমেনি শারিয়াতির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত ছিলেন। শিয়া ইসলামের বৈপ্লবিক চরিত্রকে প্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করে তিনি গড়ে তোলেন শাহ-বিরোধী বিপ্লবের মূল ভিত। খোমেনির মতে, দুই ধরনের শয়তান পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। পুঁজিবাদের ধারক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় শয়তান। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সমাজতন্ত্রকে ভেবেছিলেন ছোট শয়তান। শয়তান বলতে তিনি অবশ্য আমেরিকার মানুষকে বোঝাননি। এমনকি আমেরিকার সরকারকেও না। বুঝেছিলেন প্রলুব্ধ করার ক্ষমতাকে, যা কিনা ওয়েস্টফিকেসন তত্ত্বে দৃশ্যমান। আধুনিক ভোগবাদী সমাজ অন্যকে আকর্ষণ করার অমিয় ক্ষমতা রাখে। সে ধরনের ক্ষমতা আমেরিকার ছিল। একই দোষে দুষ্ট ছিল সোভিয়েত

ইউনিয়ন। তারও ছিল প্রলুব্ধ করার সমাজবাদী সমাজ নির্মাণের মোহনীয় আদর্শ। ইরানের মধ্যবিত্ত শ্রেণি খোমেনির কথায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ধর্ম স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এভাবে লিবারেশন থিওলজির চমক ছিটিয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হলো।

ছয়

ফিরে আসা যাক ধর্মসংক্রান্ত মার্ক্সের আলোচনায়। আগেই বলেছি, মার্ক্সের বক্তব্যকে খণ্ডিতভাবে দেখার সুযোগ নেই। মার্ক্স ধর্মকে আফিম বলেছিলেন। তার মানে এই নয়, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে আবমাননা করা বা আফিমের মতো মামুলি বস্তু হিসেবে ধর্মকে যাচাই করা। মার্ক্সের জীবনদর্শনের সঙ্গে সে অভিযোগ মিলবে না। তিনি জীবনে ধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্য বুঝেছিলেন। জীবনকে ঠিকই জৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। তবে জৈবিকের ওপরেই চেতনার নির্ভরশীলতা। সে কারণে সমাজের আর্থসামাজিক পরিবর্তন যদি চেতনার দেহে পরিবর্তন ঘটায়, তাহলে শাসকশ্রেণি ধর্মকে যে স্বার্থে ব্যবহার করে, সেটি রহিত করা সম্ভব। আর্থসামাজিক পরিবর্তন যখন নতুন শ্রেণির পৌরহিত্য গ্রহণ করে, তখন তার হাতে ধর্মের ভূমিকায় পরিবর্তন আশা করা তো অমূলক নয়। সে ধরনেরই আশাবাদ ছিল রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেটি হলো না। মার্ক্স অনুসারীদের মধ্যে অনেকেই বরং তাঁর বিশ্লেষণকে মহিমান্বিত করল এমনভাবে যে তিনি যেন সাক্ষাৎ ভগবান। চলল তাঁর শিক্ষাকে আক্ষরিক অর্থে বোঝার তোড়জোড়। শুরু হলো ধর্মের বিরুদ্ধে নিপীড়ন। এমন নির্দয়ভাবে যে সত্যিই ধর্ম যেন আফিম। অথচ মার্ক্সের ধর্মচিন্তা কেবল চেতনার সঙ্গে সামাজিক শ্রেণিগত কাঠামোর সম্পর্কই তুলে ধরেছিল। ধর্মীয় চেতনাকে ধ্বংস করা নয়।

আধ্যাত্মিকতার মূল্যকে খাটো করার সুযোগ আসে, যখন তাকে সাংঘাতিকভাবে একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার তোড়জোড় চলে। ধর্মের ভূমিকা কিন্তু এক নয়, একাধিক। আর সেখানেই রয়েছে তার আকর্ষণশক্তি। জীবনের প্রাত্যহিক রীতি হিসেবে ধর্ম কাজ করে। সেখানে নানা প্রথার ভিড়। সেগুলো পালনের মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাসীরা একে অন্যের সান্নিধ্যে আসে। প্রথা পালনে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ নেই। ধর্ম যে সংস্কৃতির স্রষ্টা, তার ভূমিকাকেও খাটো করা যায় না। যেহেতু তার আশ্রয়ে গড়ে ওঠে বিশ্বাসের বিস্তীর্ণ কাঠামো। সে কাঠামো জীবনের জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম যে উত্তর অন্য কোনো উৎস থেকে মেলে না। কতটুকু সঠিক বা বেঠিক, সেটি বড় কথা নয়, ধর্ম আরও দেয় দিকনির্দেশনা। বাতলে দেয় সৎ ও নৈতিক জীবন পালনের পথ। সামাজিক বন্ধন গড়ার কারিগর

হিসেবেও তার ভূমিকা মামুলি ভাবা যাবে না। কারণ, তা থেকে জন্ম নেয় ধর্মীয় কমিউনিটি। একই ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি। আরও একটি ভূমিকার কথা না বললেই নয়। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীর সঙ্গে তার পার্থক্যগত সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। এটি আত্মপরিচয় গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে শ্রেণিগত সম্পর্কের বাইরেও যে আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ আছে, এ কথা মানতেই হবে। মানতে হবে যে আধ্যাত্মিকতা জীবনেরই অঙ্গ এবং এক দিনে গড়ে ওঠেনি। তিলতিল করে, এমনভাবে যে বস্তুগত দিকের মতোই তার অপরিহার্যতা। এই আধ্যাত্মিকতার জন্ম শ্রেণিবৈষম্য সমাজের বাইরে। প্রাচীন যুগে। সেটিও কিন্তু শক্ত যুক্তি, কেন ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে। আধ্যাত্মিকতা মনুষ্যপ্রজাতির একেবারে রক্তের গহিনে। আর যে কল্পনা থেকে তার উদ্ভব, সে কল্পনার শুরু প্রাগৈতিহাসিক (palaeolithic period) যুগ থেকে। সে সময় বিশ্বজগৎকে জানার একমাত্র উপায় ছিল পৌরাণিক কাহিনি নির্মাণ করে। প্রকৃতির ভুবনে পরিবর্তন এবং ভাগ্যের ওঠা-নামাকে বোঝা হতো কোনো অদৃশ্য শক্তির কারসাজি হিসেবে। জীবন তখন শিকার, মাছ ধরা বা ফলমূল সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জীবনসংগ্রামের ওই অধ্যায়ে তাকে পাড়ি দিতে হচ্ছে নদী, পাহাড়, পাথর, গহিন জঙ্গল বা ঝরনাধারা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং প্রকৃতির সবকিছু, যা ছিল তার চারপাশকে ঘিরে তাকে জানার বাসনা নিয়ে মানুষ কল্পনার জাল বুনেছে। প্রকৃতির অদ্ভুত এবং বিচিত্র লীলা, জটিল রূপ এবং বিশালত্ব, এমনকি সৃষ্টির উৎসকে তখনকার সীমিত চিন্তাশক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়নি। নানা জাতীয় মিথ সেই কাজকে সহজ করে দিয়েছে। পাথর, বড় কোনো বৃক্ষ, সমুদ্র বা পাহাড়ের মধ্যে মানুষ আবিষ্কার করেছে ঐশ্বরিক শক্তিকে। ভেবেছে তার মধ্যে লুক্কায়িত আছে প্রাণ (Fetishism)। এভাবে কল্পনায় জন্ম নিয়েছে নানা দেব-দেবতা।

চেতনা বিশ্লেষণের যে মারণাস্ত্র মার্ক্স আমাদের দিয়ে গেছেন, তার ফলিত প্রয়োগ সঠিক হয়নি। তার সৃষ্টিশীলতার অপচয়ের দায়ভার সে কারণে আমাদের ঘাড়েই চাপে। তার কাঁধ একেবারে ভারমুক্ত।

[এই প্রবন্ধ লেখায় আমি ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের *আ হিস্ট্রি অব মিথ* বইটির প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ]

টিকা

১. ‘Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is

the spirit of an unspiritual world. It is the opiate of the people'

২. 'Welcome be a religion that pours into the bitter chalice of the suffering human species some sweet soporific drops of opium, some drops of love, hope and faith.'

৩. Religion can make bearable...the unhappy consciousness of serfdom...in the same way as opium is of good in painful diseases.

(উভয় উদ্ধৃতির জন্য দেখুন অনলাইন সোশ্যালিস্ট ম্যাগাজিনে লেখা 'মার্ক্সিজম অ্যান্ড রিলিজিয়ন')।

বিতর্ক

শারিয়াতি ও মার্ক্স
মার্ক্সবাদের একটি 'ইসলামি' সমালোচনার সমালোচনা

আসেফ বায়াত

অনেকেই আলি শারিয়াতিকে ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের 'মতাদর্শিক নেতা' বা 'স্থপতি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১] তাঁকে একই সঙ্গে র‍্যাডিক্যাল ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্ক্সবাদ ও অন্যান্য 'পশ্চিমা দার্শনিক বিভ্রান্তি' বা ফ্যালাসির বলিষ্ঠ সমালোচনা উত্থাপনকারী বুদ্ধিজীবী[২] এবং 'মার্ক্সবাদী সমাজচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত' একজন সংস্কারবাদী ইসলামি চিন্তক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।[৩]

লাখ লাখ শিক্ষিত ইরানি যুবকের আদর্শিক রূপান্তর ও পরিশীলনের ক্ষেত্রে শারিয়াতির ভূমিকা নিয়ে মতভেদ নেই বললেই চলে। আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'বৈজ্ঞানিক' ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের পুনর্ব্যাখ্যা তৈরি করে শারিয়াতি তাঁর অনুসারীদের দিয়েছিলেন দৃঢ় ও মজবুত আদর্শিক ভিত্তি। প্রথাগত ইসলামি ধর্মগুরুরা এই পুনর্ব্যাখ্যা তৈরি করতে অক্ষম ছিলেন।

১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে, তেহরানের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন ইসলাম বনাম বামপন্থা বিতর্কে ডুবেছিলেন, তখন আমি দেখেছি বিবদমান 'ইসলামপন্থী শিক্ষার্থী'রা তাঁদের ঝাঁজালো তর্ক-বিতর্কের সমর্থনের জন্য সম্পূর্ণভাবে মুয়াল্লিমদের [প্রথাগত ধর্মীয় পণ্ডিত] শিক্ষার ওপর নির্ভর করত। সে সময় প্রত্যেক আদর্শিক ক্যাম্পের নিজস্ব সংগঠন, সভা, স্টাডি গ্রুপ, গ্রন্থাগার, পর্বতারোহণ দল, ড্রেস কোড এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ছিল স্বতন্ত্র

● অনুবাদ : **রাশেদ রাহম**

ডিসকোর্স। দুই দলই তাদের কর্মকাণ্ডে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত। কিন্তু অবরোধের পরিকল্পনা, লিফলেট বিতরণ এবং একই ধরনের অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তাদের একটা অ্যাডহক কৌশলগত মৈত্রীতেও আবদ্ধ হতে হয়েছে। দুই গ্রুপেরই বীর ছিল। আমাদের যেমন, তাদেরও ছিল নিজস্ব বীর। আমরা যাদের আরাধনা করতাম, এর মধ্যে ছিলেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান মার্ক্স, লেনিন, স্টালিন, কাস্ত্রো, ফাঁনো, চে গুয়েভারা, মাও এবং এ রকম আরও অনেকে। সংখ্যায় বেশি না হলেও আমাদের মতোই তাদেরও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ পূজনীয় বীর। এর মধ্যে ছিলেন আল-আফগানি, ইকবাল লহুরি, ইমাম মুসা সদর থেকে শুরু করে জাঙ্গালি, রেজায়ী ভ্রাতৃদ্বয়, খোমেনি ও মাসুদ রজবী। তবে তাদের শ্রেষ্ঠতম বীর ছিলেন শারিয়াতি।

শারিয়াতির দৃশ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশীলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর র‍্যাডিক্যাল রাজনৈতিক অবস্থান, যা ইরানের সেই অস্থির ও দমনমূলক সময়ে তাঁর অনুসারীদের চেতনাকে দখল করে নিয়েছিল। সম্ভবত এই একটা তথ্যের মধ্যেও তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশীলনের প্রতিফলন ঘটে যে, তাঁর চিন্তাকর্মের ওপর ইরানি বুদ্ধিজীবীদের করা একটা চিন্তাশীল ও বিচার-বিশ্লেষণমূলক (critical) মূল্যায়নও প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি।[৪] অন্যদিকে, শারিয়াতির রাজনৈতিক অবস্থান দৃশ্যমান হয়েছে ১৯৭৯ সালের রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সময়। তখন তিনি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর হাজার হাজার টেপকৃত লেকচার ও পাম্পলেট বিলি করা হয়েছিল প্রধানত ইসলামপন্থী তরুণদের মধ্যে। তাঁর জনপ্রিয়তা ইরান ছাড়িয়ে যায় এবং তাঁর লেখার বড় অংশ ইংরেজি, আরবি, জার্মান, মালয় ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁকে সমসাময়িক কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

২.

১৯৩৩ সালে উত্তর খোরাসানের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আলি শারিয়াতি। সেখানেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন।[৫] তাঁর মা ছিলেন ভূস্বামী পরিবারের মেয়ে এবং তাঁর বাবা ছিলেন সুপরিচিত স্থানীয় ইসলামি চিন্তাবিদ ও শিক্ষক, যিনি তাঁর ছাত্রদের আধুনিক বিচার-বিশ্লেষণবাদী (ক্রিটিক্যাল)চিন্তকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। শারিয়াতির বাবা একটি ক্ষণজীবী খোদা-বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিক (God-worshipping Socialist) আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। শারিয়াতি এই আন্দোলনের সদস্য ছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রাথমিক বিচার-বিশ্লেষণমূলক/ক্রিটিক্যাল ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করেন। মাশাদ টিসার্চ কলেজে তাঁর কলেজজীবনে তিনি আরবি ভাষায় অধ্যয়ন করেন এবং

১৯৫৬ সালে *আবু জর গিফারী : খোদা-বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিক* নামে পয়গম্বরের বিখ্যাত শিষ্য, যিনি প্রথম খলিফাদের ব্যাপারে সমালোচনামুখর ছিলেন, তাঁর কাহিনি অনুবাদ করেন। এরপর শারিয়াতি মাশাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ফরাসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। এরই মধ্যে তিনি তাঁর পিতার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি বেআইনি ঘোষিত সংগঠন ন্যাশনাল ফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। ১৯৪০-এর দশকে জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোসাদেক এই ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এসব কর্মকাণ্ডের কারণে শারিয়াতি ও তাঁর সঙ্গীরা আট মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৫৬ সালে তিনি তখনকার একটি প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তির রাজধানী প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। এই সিদ্ধান্ত শারিয়াতির রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সন্ধিক্ষণ হিসেবে কাজ করেছে। কাকতালীয়ভাবে এটা ছিল পৃথিবীজুড়ে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের কাল। তিনি সোরবোর্নে ভাষাতত্ত্ব পড়তে শুরু করেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং ক্ষমতাসীন শাসকবিরোধী দুটি ফারসি জার্নাল সম্পাদনা করেন। ওঁহাগান (Ouzagan), চে গুয়েভারা, জ্যঁ-পল সার্ত্রে, ফ্রান্জ ফাঁনো এবং লুই ম্যাসিঁয় (ইসলামি মরমিবাদ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত) প্রমুখ র‍্যাডিক্যাল, মার্ক্সবাদী ও প্রাচ্যবাদী লেখকদের কয়েকটি বই অনুবাদ করেন এবং পশ্চিমা প্রাচ্যবাদ ও র‍্যাডিক্যাল ক্যাথলিজমে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি রেমু অ্যাঁরো, রজার গ্যারুজি, জর্জেস পুলিৎজার প্রমুখ ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এবং বিশেষ করে প্রখ্যাত ফরাসি দ্বান্দ্বিক শাস্ত্রবিশারদ জর্জেস গুর্ভিচের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন।

১৯৬৫ সালে তিনি ইরানে ফিরে আসেন এবং বিদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অবিলম্বেই তাঁকে আট মাসের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর পরের পাঁচ বছর তিনি কলেজ অব লিটারেচারে শিক্ষকতা করেন মাশাদে এবং জীবনের বাকিটা সময় তেহরানে কাটান। সেখানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সবচেয়ে উৎপাদনশীল সময়টুকু শুরু করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর তেহরানের আধুনিক ইসলামিক সেন্টার হুসেইনিয়া ইরশাদে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তব্যগুলো টেপ আকারে ও কয়েক ডজন ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কয়েক খণ্ডের *ইসলাম শিয়ানসী* (ইসলামতত্ত্ব)। এই সংকলনটি মুসলিম তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

শাহ-রেজিমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনাকারী 'মুজাহেদিন খাল্‌ক' নামের র‍্যাডিক্যাল মুসলিম গ্রুপের প্রজনন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে—এই অভিযোগে হুসেইনিয়া সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইরানি ইতিহাসবিদ এরভান্দ

আব্রাহামিয়ান বিশ্বাস করেন, রক্ষণশীল মোল্লা সম্প্রদায়ও শারিয়াতির লেকচার বন্ধে ভূমিকা রেখেছে। কারণ, তাদের ভয় ছিল শারিয়াতি ইসলাম নয়; বরং পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানের প্রসার করছেন। হুসেইনিয়া সেন্টার বন্ধ করে দেওয়ার পর শারিয়াতিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে মুজাহেদিনের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ আনা হয়। আঠারো মাস পর তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর মুক্তির পর *কাইহান* নামের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় তাঁর একটি প্রবন্ধ সিরিজ প্রকাশিত হয়। 'ইনসান, ইসলাম ওয়া মার্ক্সিজম' (মানুষ, ইসলাম ও মার্ক্সবাদ) শিরোনামের এই প্রবন্ধগুলো শারিয়াতির নামেই প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালে তিনি দেশ ত্যাগ করতে সমর্থ হন এবং লন্ডনে পৌঁছানোর পর এক মাসের মধ্যে সন্দেহজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হৃদ্‌রোগের কথা উল্লেখ করে। তবে সে সময় তেহরানে আমরা বামপন্থী ও ইসলামপন্থী কোনো দলেরই এই মৃত্যুর সঙ্গে সাভাকের জড়িত থাকার ব্যাপারে এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। কারণ যা-ই হোক, যেন সাভাককে দোষারোপ করতেই হবে। বিরোধীদের আশার গুড়ে বালি দিয়ে মৃত্যু শারিয়াতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে এবং সমর্থকদের মধ্যে তাঁকে প্রায় কিংবদন্তি করে তোলে।

৩

শারিয়াতির আদর্শিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত না থাকলেও তাঁর আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের প্রকরণ এবং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, তাঁর 'ইসলামি মার্ক্সবাদ', কিছু আধুনিক মার্ক্সবাদী ধারণাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা, যেমন: 'শ্রেণি শোষণ', 'শ্রেণিসংগ্রাম', 'শ্রেণিহীন সমাজ', 'সাম্রাজ্যবাদ' ইত্যাদি ধারণাকে ইমাম আলী, ইমাম হুসাইন ও আবু জর গিফারী (যাঁকে শারিয়াতি প্রথম 'খোদা বিশ্বাসী সমাজতন্ত্রী' হিসেবে অভিহিত করেছেন) প্রমুখ শিয়া নেতার চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করা ইত্যাদি ঘিরে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়।[৬] বিপ্লবপূর্ব সন্ধিক্ষণের সেই উত্তেজনাময় দিনগুলোতে এবং বাম ও ইসলামপন্থীদের সেই মহাবিভাজনের প্রেক্ষাপটে শারিয়াতির চিন্তাকর্ম একদিকে দুটি প্রবণতার মধ্যে সম্ভাব্য অসংলগ্ন সংযোগের ভিত্তি তৈরি করেছে এবং অন্যদিকে আমাদের মধ্যে তৈরি করেছে গভীর বিভ্রান্তি। প্রকৃতপক্ষে শারিয়াতি সেই বিভ্রান্তির পক্ষেই অবস্থান নিয়েছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত পুস্তিকা: *ইনসান, ইসলাম ও মার্ক্সিজম,* যেখানে শারিয়াতি পদ্ধতিগতভাবে মার্ক্সবাদী মূলনীতিগুলো আলোচনা করেছেন। প্রায় ১০ বছর পরে তুলনামূলকভাবে কম দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে এই একই টেক্সটের একটি

ইংরেজি ভাষান্তর পড়ার সুযোগ হয় আমার। *মার্ক্সিজম অ্যান্ড আদার ওয়েস্টার্ন ফ্যালাসিজ* শিরোনামে গ্রন্থাকারের সংকলনটি প্রকাশ করেছিল ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের মিজান পাবলিশার্স। যেহেতু এ বইটিকে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে শারিয়াতির সবচেয়ে নিবিড় আলোচনা হিসেবে ধরা হয়, সেহেতু খানিকটা বিস্তারিতভাবে এ বইটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

৪.

এই বই হলো মার্ক্সবাদসহ বিদ্যমান মানবতাবাদী দার্শনিক ধারাগুলোর সমালোচনা (Critique)। সাধারণভাবে, এখানে মানুষ সম্পর্কে একটা র‍্যাডিক্যাল ইসলামি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র বই চারটি প্রধান বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথমত, পাশ্চাত্য উদারতাবাদ, অস্তিত্ববাদ ও মার্ক্সবাদের মতো পাশ্চাত্য দর্শনে একধরনের মানবতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ আছে, কিন্তু তাদের মানবতাবাদের ধারণা বস্তুবাদী।

বইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমা মানবতাবাদ দৃঢ়ভাবে প্রাচীন গ্রিক পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর স্থাপিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ও দেবতা—যারা সব সময় মানুষকে অন্ধকার ও অজ্ঞতায় ডুবিয়ে রাখতে চায়—তাদের মধ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চলতে থাকে। এখানে মানুষ প্রশংসিত এবং দেবতার তুলনায় তাকে উঁচু মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ফলে এই মানবতাবাদ মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি করে। লেখকের যুক্তি হলো, সব মহান মানবতাবাদীই—দিদেরো ও ভলতেয়ার থেকে ফয়েরবাখ ও মার্ক্স—স্বৈরতান্ত্রিক ও মানববিরোধী গ্রিক দেবতাদের সঙ্গে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক ধারণার—যেমন আহুরমাজদা, রাম, তাও, মেসাই ও আল্লাহ—সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। এসব দার্শনিক ভুলভাবে মানুষ বনাম ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে গ্রিকদের করা বৈষম্যমূলক পার্থক্যকে সাধারণীকরণ করেছেন [দুটি বস্তুর ভিন্ন দুটি গুণের মধ্যে পার্থক্যকরণ]। ফলে তাঁদের মানবতাবাদ পার্থিব, অস্বর্গীয় এবং এককথায় বস্তুবাদী। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মানুষ সম্পর্কে ধারণার দিক থেকে কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই সবকিছুর চূড়ায় মানুষ, উভয়ই 'মানবসত্তার আধ্যাত্মিক মাত্রাকে আগ্রাহ্য করেছে'।[৭] অন্য এক দিক থেকেও পাশ্চাত্য মানবতাবাদ নাস্তিক্যবাদী। এখানে মানুষকে তার মানবীয় স্বভাবের মধ্যে একটা নৈতিক চেতনা ধারণ করতে হয়, যা তার নৈতিক মূল্যবোধকে নির্ধারণ করে এবং ঈশ্বরের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এই বইয়ে যুক্তি দেখানো হয় যে পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দার্শনিক ধারাগুলো, যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন করে, তা

হিন্দুবাদ, ইসলাম ও সুফিবাদ প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞ। এসব ধর্ম মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একত্বের (দূরত্ব নয়) ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং ফলে তাঁদের মানবতাবাদ স্বর্গীয়।

দ্বিতীয়ত, যদি আমরা মেনেও নিই যে পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাগুলো তাঁদের তত্ত্বে মুক্তিকামী নীতিমালাকে ধারণ করে; বাস্তবে প্রায়োগিক জীবনে তাঁরা তা থেকে দূরে সরে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মার্ক্সবাদ মানুষকে পুঁজিবাদের অমানবিকতা থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বাস্তবে তা মানুষের প্রতি পুঁজিবাদের মতো সম্পূর্ণ একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, অর্থাৎ ইহলৌকিক সমৃদ্ধি, বস্তুবাদ, ভোগবাদ ইত্যাদির প্রতি আনুগত্য। অন্যদিকে, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ও তাওবাদের মতো ধর্মগুলোও তাদের মুক্তিকামী মতাদর্শ থেকে আমলাতান্ত্রিক, ক্ষমতালিপ্সু ও বস্তুবাদী চার্চ বা যাজকতন্ত্র, গণ-আনুষ্ঠানিকতা, ট্যাবু ও কুসংস্কারের দিকে পতিত হয়েছে। একই ভাবে রেনেসাঁর চেতনা (যার মানে হলো মানসচেতনা, বিজ্ঞান ও বুদ্ধির মুক্তি) অহংবাদ, সুবিধাবাদ ও ভোগবাদের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে পুঁজিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও উদারতাবাদে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে বিশ্বাস, মনন, ভালোবাসা, অস্তিত্বের তাৎপর্য ও মানুষ গুরুত্ব পায়নি।

তৃতীয়ত, যেহেতু অপরাপর পশ্চিমা মতবাদের বিপরীতে মার্ক্সবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ, যা অর্থনীতি, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে, সেহেতু তা ইসলামের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এবং কাজে কাজেই তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। এরপর বইটিতে ইসলামের সঙ্গে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য মার্ক্সবাদের প্রধান দার্শনিক সূত্রগুলো আলোচনা করা হয়। শুরুতেই দাবি করা হয়, অন্যান্য পাশ্চাত্য মানবতাবাদী স্কুলের মতো মার্ক্সের ধর্মবিষয়ক সমালোচনাও গ্রিক মানবতাবাদী দর্শনভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একত্বের পরিবর্তে বিরোধ দেখতে পায়। বিপরীতে, ইসলামি চিন্তাকাঠামো বিকশিত হয়েছে তাওহিদ, একত্ববাদের ধারণা থেকে। মার্ক্সের ধারণায় ধর্ম যুক্তির ঊর্ধ্বে এবং মানুষের অসহায়ত্বের প্রতীকস্বরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে অথচ ইসলামে আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা যুক্তিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক। অন্যদিকে, মার্ক্স তাঁর যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন অবকাঠামো ও উপরিকাঠামো ধারণার ওপর ভিত্তি করে, যেখানে মানুষকে দেখানো হয় উপরিকাঠামোর অংশ হিসেবে; ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতা, মানুষের মূল্যবোধ অর্থনৈতিক শক্তি ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ধরে নিয়ে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা হয়। ফলে মানুষের কোনো স্বাধীন ও মহৎ বাস্তবতা নেই—এটা এমন একটা ধারণা, যা ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে

দেয়। লেখক অভিযোগ করেন, সম্পূর্ণ একই রকমভাবে মার্ক্স মানুষকে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেননি। লেখক বলেন, মার্ক্সবাদী তত্ত্বে মানুষ যৌক্তিকভাবে অক্ষম। কারণ সে তার পরিবেশের সৃষ্টি। ঐতিহাসিক পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা নেই; বরং তা উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যকার অসংগতির ফল। লেখক বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাই যদি হয়, তাহলে ইতিহাসের এত শহীদ, এত অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের তাৎপর্য কী।

সর্বশেষে, যেই মার্ক্সবাদ পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর সমালোচনায় গর্ব বোধ করে, শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের মতো একই মূল্যবোধ ধারণ করাই তার নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। উভয় ব্যবস্থাই, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, প্রকৃতপক্ষে 'উৎপাদনবাদ', 'যান্ত্রিকতাবাদ', 'টেকনো-আমলাতন্ত্র', 'অর্জনপ্রবণতাবাদ', 'অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা' ও 'বস্তুবাদে'র ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এখন যেটাকে স্টালিনবাদ বলে সমালোচনা করা হচ্ছে, তা আসলে লেনিনবাদ এবং পরিণামে মার্ক্সবাদেরই ধারাবাহিকতা।

সমাজতন্ত্র যে কারণে পুঁজিবাদ থেকে স্বতন্ত্র তা হলো, পুঁজিবাদে (বুর্জোয়া) শাসকশ্রেণি উৎপাদনের উপায়গুলো দখলে রাখে বা নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়।

চতুর্থত, বইটিতে দাবি করা হয়, একমাত্র ইসলামই প্রকৃত মানবতাবাদকে ধারণ করে। ইসলামে মানবতাবাদ হলো মানুষের মধ্যে কিছু স্বর্গীয় মূল্যবোধের সমষ্টি; যা তার নৈতিক ভিত্তি এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে। তাওহিদের ইসলামি ধারণা অনুযায়ী মানুষকে এমন একটি পরস্পরবিরোধী সত্তা হিসেবে দেখানো হয়, যে পার্থিব ও স্বর্গীয় সত্তা (Clay and Divine Spirit), নশ্বর ও ঈশ্বরের (Dust and God) দ্বৈত সত্তাকে ধারণ করে এবং এই দ্বৈত সত্তার একটার ওপর অন্যটাকে প্রাধান্য দেওয়ার ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। এ ছাড়া, প্রথমত, ইসলামে মানুষের মহত্ত্ব স্বকীয় নয়; বরং কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত; দ্বিতীয়ত, মানুষের ভাগ্যলিপি আছে; তৃতীয়ত, মানুষের বেছে নেওয়ার ক্ষমতা (Choice) আছে। এই ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির ওপর নিজেকে নশ্বর থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পর্যায়ে উন্নীত করার দায়িত্ব বর্তায় (এটা হেগেলের 'অ্যাবসল্যুট আইডিয়া', নাথিং থেকে সবকিছুতে পরিণত হওয়া, ধারণার সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ)। শারিয়াতির কছে এই দায়িত্ব বা মাসউলিয়াত খুবই উচ্চমার্গীয় ক্রিটিক্যাল ধারণা। কারণ তিনি এর নিহিতার্থকে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব থেকে রাজনীতির রাজ্যে বিস্তৃত করতে চান। এভাবে তিনি সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের জনসাধারণ এবং বিশেষ করে মুসলমানদের পরোক্ষভাবে আহ্বান করছেন বন্দিদশা থেকে 'পৃথিবীতে খোদার সৈনিক' হওয়ার পথে, মুক্তির পথে উন্নীত হতে (এই দৃষ্টিভঙ্গিও 'ইন ইটসেলফ' থেকে 'ফর ইটসেলফ' হওয়ার মাধ্যমে শ্রেণির বিকাশসংক্রান্ত

মার্ক্সের হেগেলীয় রূপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ)।

ফলে আমাদের মুক্ত করার দায়িত্ব বলতে বোঝায় আত্মনির্ভরশীলতা। সূক্ষ্মভাবে এর তাৎপর্য হলো সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত আত্মনির্ভরশীলতা এবং পরিষ্কার রাজনৈতিক ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায়, 'প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্য কোনোটাই নয়', পুঁজিবাদ কিংবা সমাজতন্ত্র নয়, বরং 'নিজের দিকে ফিরে আসা'র কৌশল।

৫.

ইসলামের অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে এ বইটি পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শন, বিশেষ করে মার্ক্সবাদের একটি শক্তিশালী সমালোচনা হাজির করার প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হয়। এই বই এমন একটা ধারণা দেয় যে, বইটি এমন একজন ব্যক্তি লিখেছেন, যিনি নিজ দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা সম্পর্কে যেমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবাহ সম্পর্কেও একই রকম জ্ঞাত। ১৯৭০ দশকের তেহরানে, তেহরানের বিত্তশালী উত্তর অংশে (ঘোলহাক) অবস্থিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীতভাবে আধুনিক মসজিদ হুসাইনিয়া সেন্টারে শারিয়াতি বক্তৃতা করতেন। সেখানে মানুষের ভিড় উপচে পড়ত, তাঁদের মধ্যে শুধু র‍্যাডিক্যাল মুসলমানরাই ছিলেন না, ছিলেন বামপন্থীরাও। সে সময় শারিয়াতির মার্ক্সবাদ-সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের মুগ্ধতা লুকাতে পারতাম না। সম্ভবত তাঁর আপাতসমৃদ্ধ সমালোচনা এবং এর সঙ্গে তাঁর র‍্যাডিক্যাল রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই আলি শারিয়াতি সাম্প্রতিক ইরানের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী চিন্তক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।[৮]

তবে *মার্ক্সিস্ট অ্যান্ড আদার ফ্যালাসিজ* বইয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত দুর্বলতা রয়েছে। এ ছাড়া বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ মার্ক্স সম্পর্কেও গুরুতর ভুল পাঠ রয়েছে।

প্রথমেই বলতে হয়, সামাজিক বিজ্ঞানের স্বদেশীয়করণের কোনো কোনো সমসাময়িক প্রবক্তা, যাঁরা চিন্তার আঞ্চলিক কুলীনতা বা আভিজাত্যকে প্রাধান্য দেন, তাঁদের মতানুযায়ী আত্মনির্ভরশীলতা মানে 'অন্যদের কাছ থেকে মতবাদ ধার করো না'। তাহলে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে, আলি শারিয়াতি নিজেই পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাগুলো, যেমন হেগেল, হাইডেগার ও মার্ক্স থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ধার করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে, চিন্তা ও তত্ত্ব ধার করাতে কোনো ভুল নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়।

মার্ক্সবাদ সম্পর্কে এই বইয়ের একটি প্রধান সমালোচনা হলো ধর্ম ও মানুষ সম্পর্কে মার্ক্সবাদের ধারণা। আমরা ওপরে শারিয়াতির যুক্তিগুলোর সংক্ষিপ্তসার আলোচনা করেছি। তাঁর এ-সংক্রান্ত সমালোচনা পদ্ধতিগতভাবে সমস্যাজনক মনে

হয়। প্রথমত, শারিয়াতি মনে করেন, মার্ক্সের ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণা বস্তুবাদী। মার্ক্সের মতে, ধর্মীয় চিন্তা, কাঠামো ও তাদের বিবর্তন নির্ধারিত হয় কিছু আর্থসামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা (ফয়েরবাখের খ্রিষ্টধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত না হয়ে ধর্মতাত্ত্বিক হওয়ায় মার্ক্স নিজে তাঁর ব্যাপারে সমালোচনামুখর ছিলেন)। কিন্তু এই বইয়ে কোনো যুক্তি হাজির করা ছাড়াই তিনি মার্ক্সের উপরিউক্ত তত্ত্বের বৈধতা নাকচ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় মার্ক্স সাধারণত সে সময়কার খ্রিষ্টধর্মের সামাজিক প্রেক্ষাপট কিংবা সামাজিক নীতিমালাগুলোকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে শারিয়াতিও একমত হতেন যে, সমাজের অধস্তন শ্রেণিগুলোর ব্যাপারে খ্রিষ্টধর্মের রক্ষণশীল ভূমিকা-সংক্রান্ত আলোচনা খুবই দুর্বোধ্য।

এটা সত্য যে মার্ক্সের ধর্মসংক্রান্ত জ্ঞান খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ইসলাম, হিন্দুধর্ম, তাওবাদ প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। মার্ক্সের একটা মোক্ষম সমালোচনার জায়গা হতে পারে ধর্মীয় জগৎ সম্পর্কে তাঁর সীমিত জ্ঞান। যদিও অধিকাংশ সমালোচকের মধ্যে তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণাকে সাধারণীকরণ করে নিজের সুবিধানুযায়ী মার্ক্সের সমালোচনা করার প্রবণতা দেখা যায়। এ ধরনের সমালোচনা নিশ্চিতভাবেই অবৈধ। তা ছাড়া, এসব সাধারণীকরণ মার্ক্সবাদী নয়; বরং পরিষ্কারভাবেই প্রয়োগবাদী (ফাংশনালিস্ট)। কারণ, মার্ক্সের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৈপরীত্যের (কনট্রাডিকশন) ধারণার ওপর ভিত্তি করে।

তবে প্লেখানভ ও লেনিন ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ভি জি কিয়েরম্যানের মতে, তাঁরা ধর্মবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন, কারণ রাশিয়ার বিপুলসংখ্যক কৃষকশ্রেণি বিদ্‌ঘুটে কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মবোধে গভীরভাবে ডুবে ছিল এবং সব সময় জারের সেবায় অতি নিবেদিত ছিল।[৯]

বস্তুত যেসব মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাস করেন, যেমন ই পি থম্পসন, জর্জ থম্পসন, পল সিউজি ও পল ব্যারন, তাঁরা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না যে, প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের একটি প্রগতিশীল ও একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা থাকে। জর্জ থম্পসন যেমন সেই ১৯৪৯ সালেই ঘোষণা করেছেন যে, 'দুজন যিশু আছেন, একজন শাসকের, একজন শোষিতের'।[১০] নিশ্চিতভাবেই শারিয়াতির সাফাভি শিয়া (প্রভাবশালী শিয়াগোষ্ঠী) ও আলাভি শিয়া (যোদ্ধা ও জনসাধারণ শিয়াগোষ্ঠী) বিভাজনের সঙ্গে থম্পসনের খ্রিষ্টধর্ম-সংক্রান্ত ধারণার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

নিশ্চিতভাবেই লাতিন আমেরিকায় চার্চকে রক্ষণশীল ও র‍্যাডিক্যাল—এই দুই ধারায় বিভাজনের মধ্যে এ ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে। ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর এই

বৈপরীত্য ও দ্বৈত চরিত্র অনুধাবন করেই ব্রিটেনের ক্লগম্যান, যুক্তরাষ্ট্রে পল ব্যারন ও পল সুয়েজি এখন প্রগতিশীল খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছেন।

মার্ক্সের মানুষ ও ধর্মসংক্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচ্য বইয়ে অবকাঠামো ও উপরিকাঠামো সম্পর্কিত ধারণার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বইয়ে এসব ধারণার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা আমার কাছে অতি সরলীকরণ বলে মনে হয়েছে। লেখক প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মার্ক্সের বহুল উদ্ধৃত ও ক্ষুদ্র (কম-বেশি দুই পৃষ্ঠা) একটি লেখা *আ ইনট্রোডাকশন টু দ্য ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমির* ওপর নির্ভর করেছেন। এই লেখায় মার্ক্স তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা সূত্রবদ্ধ করেছেন, কিন্তু কোনোভাবেই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেননি। শারিয়াতি সম্ভবত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নৈতিকতাসহ 'উপরিকাঠামো'র সব উপাদান উৎপাদন প্রণালির (মোডস অব প্রডাকশন) অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা ততটা নির্ধারিত বা শর্তাধীন নয়, যতটা নির্ভরশীল উৎপাদনের উপায়ের (মিনস অব প্রডাকশন) ওপর। একইভাবে শারিয়াতি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানবতাকে দৃশ্যত যান্ত্রিকতায় পরিণত করা হয়েছে। বস্তুত, মার্ক্স তা বলেননি। সমগ্র মার্ক্স পাঠ করলে দেখা যায়, 'উপরিকাঠামো' অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা শর্তাধীন (নির্ধারিত নয়)। তা ছাড়া, 'উপরিকাঠামো' ও 'ভিত্তি'র মধ্যকার এই সম্পর্ক কোনোভাবেই একরৈখিক নয়; বরং দ্বান্দ্বিক, তা হলো, 'অর্থনৈতিক ভিত্তি'র ওপর চিন্তা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদিরও বিভিন্ন রকম প্রভাব রয়েছে।[১১] মজার ব্যাপার হলো, বইয়ের কোনো কোনো জায়গায় লেখক স্বীকার করেছেন যে মার্ক্স মতাদর্শ, বিবেক ও মানবিক ন্যায়পরায়ণতার ভূমিকা স্বীকার করেন। কিন্তু সাধারণ মার্ক্সীয় প্রকল্পে এগুলোকে চিহ্নিত করতে না পেরে শারিয়াতি দাবি করেন যে মার্ক্স সামঞ্জস্যহীন। মানুষের ভূমিকা ও ইতিহাস-সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে, তবে আমি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না।

বইটির আরেকটি পদ্ধতিগত সমস্যা হলো, সমগ্র বইয়ে মার্ক্সের ধারণাকে 'অন্যান্য মার্ক্সবাদী', অর্থাৎ 'বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো'র নেতাদের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে মার্ক্সের ধারণার বাস্তবায়ন হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি এটাও সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন যে, সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদের নামে অতীত ও বর্তমানে চলমান নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদীরাও তীব্র অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। মার্ক্স, স্টালিন ও ক্রুশ্চেভকে মার্ক্সবাদের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে এক পাল্লায় দাঁড় করানো শারিয়াতিকে আয়াতুল্লাহ ফজলুল্লাহ নূরী, আয়াতুল্লাহ খাসানির (বিশ শতকের দুজন উল্লেখযোগ্য রক্ষণশীল ধর্মগুরু) সঙ্গে এক কাতারে শামিল করা এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে

ইসলামের প্রতিমূর্তি হিসেবে হাজির করার সমতুল্য। যদি ইসলাম একক ধর্ম হয়, তাহলে মার্ক্সবাদও একটাই।

এই বইয়ে বর্তমান 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে' যে মানবিক দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে, তা হয়তো সত্য। টেকনোক্রেসি, আমলাতন্ত্র, উৎপাদনবাদ—'এসব মানবিক মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর' বৈশিষ্ট্য বস্তুত পুঁজিবাদী ও 'প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক' উভয় সমাজেই বিরাজ করছে। তা সত্ত্বেও এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, এই দুই ব্যবস্থাকে সমতুল্য বিবেচনা করা, অজ্ঞতা যদি না-ও হয়, ভয়াবহ সরলীকরণ।

এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে ওপরে মার্ক্সবাদের যেসব সমালোচনা আলোচিত হয়েছে, বিশেষ করে 'উপরিকাঠামো' ও 'অবকাঠামো'-সংক্রান্ত সমালোচনা, বিপ্লবের ঘটনা, ইতিহাসে মানুষের ভূমিকা, মানুষ-সম্পর্কিত ধারণা, সমাজতন্ত্রের বাস্তব চর্চা ইত্যাদি, তা নতুন নয়। পশ্চিমা একাডেমিক জগতের বড় বড় নাম, মার্ক্সবাদী কিংবা অ-মার্ক্সবাদী উভয়ই, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, যেমন কার্ল পপার, রালফ ডারেনডার্ফ, ডেনিয়েল বেল, হার্বার্ট মার্কিউস ইতিমধ্যে এসব বিষয়ে মার্ক্সের সঙ্গে মীমাংসা করে ফেলেছেন। শারিয়াতির দৃষ্টিভঙ্গিতে যা নতুন তা হলো, মার্ক্সবাদের বিপরীতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মব্যবস্থা, দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা হিসেবে উপস্থাপন করা। তিনি মানুষ সম্পর্কে একটি বিকল্প ইসলামি ধারণা উত্থাপন করতে চেয়েছেন, যা একটি বিকল্প ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সংজ্ঞায়িত ও কার্যকর তা হলো, ইসলামি মানবতার ধারণায় মানুষের মাহাত্ম্য তার নিজের সঙ্গে নয়; বরং খোদার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই মূল যুক্তিটাই পুরো বইয়ে বারবার এসেছে তাগিদ আকারে; কিন্তু তা আলোচিত, বিস্তৃত কিংবা সপ্রমাণ সাব্যস্ত করা হয়নি।

৬.

শুরুতেই আমরা উল্লেখ করেছি, কিছু লেখক শারিয়াতিকে মার্ক্সবাদী সমাজচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত চিন্তক এবং 'সমাজবিজ্ঞানী মার্ক্সে'র সমাজবিজ্ঞানবিষয়ক চিন্তার সমর্থনকারী লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে শারিয়াতির সবচেয়ে পদ্ধতিগত আলোচনা *মার্ক্সিজম অ্যান্ড আদার ওয়েস্টার্ন ফ্যালাসিজ*-এ আলি শারিয়াতি ও মার্ক্সের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশিত। তাহলে শারিয়াতির অবস্থান কী দাঁড়ায়? *মার্ক্সিজম অ্যান্ড আদার ওয়েস্টার্ন ফ্যালাসিজ* কি তাহলে শারিয়াতির মার্ক্সবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিনিধিত্ব করে? আসল সত্য হলো, এই বইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই সন্দেহ রয়েছে।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর সম্পাদক হামিদ অ্যালগার যেমন বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, ১৯৭৭ সালে শারিয়াতির দ্বিতীয় কারাবাসের পর

তাঁর অননুমোদন সত্ত্বেও তাঁর একটি প্রবন্ধ *কাইহান* নামক ইরানি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শাহ-রেজিম শারিয়াতিকে ক্ষমতাসীনদের দোসর হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। সেই প্রবন্ধটি প্রবাসী মুসলমান শিক্ষার্থীরা *ম্যান, ইসলাম অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন স্কুলস অব থট* শিরোনামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে। ব্রিটিশ-বংশোদ্ভূত মুসলিম পণ্ডিত হামিদ অ্যালগার তাঁর প্রেসকে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি লেখক, বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ খোমেনি, আয়াতুল্লাহ মুতাহ্হারী, আলি শারিয়াতি প্রমুখ ইরানি ধর্মীয় নেতার বই প্রকাশনার জন্য নিবেদিত করেছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই মিজান পাবলিশার্স থেকে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৯৭০-এর দশকের ইরানে শাহ-রেজিমের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান র‍্যাডিক্যাল রাজনৈতিক ধারাকে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছিল। এক. ইসলামি ধারা—যাদের সশস্ত্র প্রকাশ ঘটেছিল মুজাহেদিন খাল্‌ক সংগঠনের মধ্য দিয়ে। দুই. প্রতিদ্বন্দ্বী মার্ক্সবাদী পক্ষ যাদের চিহ্নিত করা যায় ফেদাইন খাল্‌ক-এর সংগঠিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী চেষ্টা করেছিল এই দুই ধারার মধ্যে যেকোনো ধরনের জোট বা সহযোগিতা প্রতিরোধ করতে। একইভাবে রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতারাও মার্ক্সবাদীদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করে এ রকম জোটের সম্ভাবনা ঠেকাতে দ্বিধা করতেন না। ১৯৭৭ সালের বসন্তে উত্তর তেহরানের গোলহাকে অবস্থিত ওকবা মসজিদে আয়াতুল্লাহ মুতাহ্হারী ও আয়াতুল্লাহ মোফাত্তেহ (দুজনই হুসেইনিয়া সেন্টারের) এবং বিশেষ করে ইসলামিক রিপাবলিকের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মেহদি বাজারগান কর্তৃক 'বস্তুবাদীদের' বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত আক্রমণের কথা আমি এখনো মনে করতে পারি। কিন্তু সেসব রক্ষণশীল ধর্মগুরু যা করেছেন, প্রভাবশালী আলি শারিয়াতি তাঁর সামগ্রিক লেখালেখির কোথাও মার্ক্সবাদীদের নাস্তিক বা অনৈতিক বলে গালি দিয়ে কোনো ধরনের কোন্দলকে উৎসাহিত করেননি; বরং তিনি 'বিপ্লবী বাম'দের প্রশংসা করতেন, যাঁরা 'বঞ্চিত মানুষের সুবিধার জন্য কাজ করেন।'[১২] তাই জোর সম্ভাবনা রয়েছে যে *কাইহান* পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছে এবং বর্তমান বই যার অনুবাদ, তা মূল বইয়ের বিকৃত ভাষ্য।

আসলে ১৯৭৭ সালে তেহরানে ফারসি ভাষায় মূল বইটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল এবং বর্তমান বই ও মূল বইয়ের মধ্যে বাক্‌ভঙ্গি, গুরুত্বারোপ কিংবা বর্জনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, ফারসি বইটি শেষ হয়েছিল শারিয়াতির মুখে মার্ক্সের সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়ে, 'আমি মার্ক্স, মার্ক্সবাদী নই', যেখানে সমসাময়িক মার্ক্সবাদী, যাঁরা তাঁর চিন্তাকে বিকৃত করেছেন, তাঁদের ব্যাপারে মার্ক্সের হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান বইটিতে এ রকম কোনো বক্তব্য নেই।

৭

তাহলে শারিয়াতির সঙ্গে মার্ক্সবাদের সম্পর্ক কী? আসলেই কি তিনি একজন মার্ক্সবাদী ছিলেন, যিনি নিজেকে ইসলামি ছদ্মবেশে আড়াল করে রেখেছেন? শারিয়াতি অবশ্যই মার্ক্সবাদী ছিলেন না (যদিও তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করতেন), কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবেই মার্ক্সবাদী সমাজচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি মার্ক্স থেকে 'শ্রেণিসংগ্রাম', 'শ্রেণিশোষণ', 'শ্রেণিহীন সমাজ' (অথবা *নিজাম-ই-তাওহিদি*), 'ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ', 'অবকাঠামো', 'উপরিকাঠামো', 'উদ্বৃত্ত মূল্য', 'চিরস্থায়ী বিপ্লব' ইত্যাদি ধারণা ধার করে তাঁর ক্রিটিক্যাল চিন্তাকর্মে পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করেছেন। এরভান্ড অ্যাব্রাহামিয়ান সঠিকভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মার্ক্সের প্রতি শারিয়াতির পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়ার কারণ তিনি একজন নয়, তিনজন মার্ক্সকে শনাক্ত করেছেন : প্রথমত, তরুণ মার্ক্স, প্রধানত একজন দার্শনিক, যাঁকে দেখা হয় অর্থনৈতিক সংকোচনবাদী, নাস্তিক ও কঠোরভাবে ধর্মবিরোধী হিসেবে। দ্বিতীয়ত, পরিণত মার্ক্স, প্রধানত একজন সমাজবিজ্ঞানী, যিনি সামাজিক গতিশীলতার সূত্র আবিষ্কার করেছেন এবং 'প্রাক্সিস' ও বিপ্লবী চর্চার ধারণাকে উৎসাহিত করেছেন। তৃতীয়ত, বয়োবৃদ্ধ মার্ক্স, প্রধানত একজন রাজনীতিবিদ এবং যাঁকে শারিয়াতি কার্ল কুটস্কি, এঙ্গেলস, এমনকি স্টালিন যিনি, শারিয়াতির মতে, প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শোষিত জনসাধারণের আদর্শের সঙ্গে আপস করেছেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন। শারিয়াতি প্রথম ও তৃতীয় মার্ক্সকে বাতিল করে দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় মার্ক্স দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[১৩]

শারিয়াতির সর্বশেষ দুটি কাজ: *জাহাতকিরি-ই-তাবাকাত-ই ইসলাম* (ইসলামের শ্রেণি পক্ষপাত) ও *উম্মাত ও ইমামাত* (জাতি ও নেতৃত্ব) বিবেচনা করলে অ্যাব্রাহামিয়ানের এই ব্যাখ্যা আরও যৌক্তিক মনে হবে। শারিয়াতি এই দুটি বইয়ে ইসলামি রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে উপরিউক্ত মার্ক্সবাদী প্রপঞ্চগুলো ব্যবহার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি কিছু কিছু প্রপঞ্চের ভিন্ন অর্থও প্রদান করেছেন। যেমন শারিয়াতি তাঁর জ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব নিয়েছেন মার্ক্স থেকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ফেনোমেনলজিতে স্থিত হয়েছেন।[১৪] তাঁর ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ ঈশ্বরের ক্ষমতার (উইল অব গড) ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়; ১৯৬০-এর দশকের ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী জর্জেস গুর্ভিটস দ্বারা প্রভাবিত তাঁর শ্রেণি-সম্পর্কিত ধারণা হলো—শ্রেণি অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা গঠিত অর্থনৈতিক শ্রেণি নয়, বরং অবস্তুগত উপাদান যেমন ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রতীক, ঐতিহ্য, প্রথা ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ড দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক শ্রেণি। শ্রেণি বিষয়ে এ রকম রাজনৈতিক ধারণাপ্রসূত হয়ে তিনি দাবি করেন, তৃতীয় বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম

রাষ্ট্রগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন ও নেতৃত্ব তৈরি করতে সক্ষম একটি মাত্র শ্রেণিই আছে, তারা প্রলেতারিয়েত নয়; বরং বুদ্ধিজীবী শ্রেণি (রওশনফিকরান)। এ ছাড়া, যখন তিনি বলেন ধর্ম হচ্ছে সমাজের 'উপরিকাঠামোর' অংশ, তখন শারিয়াতি বিশ্বাস করেন যে শিয়া ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে লক্ষণীয়ভাবে স্বতন্ত্র এবং তা-ই একমাত্র সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে।[১৫]

শারিয়াতি কিছু মার্ক্সবাদী ধারণার পুনর্ব্যাখ্যা যেমন করেছেন, তেমনি তিনি ইসলামের কিছু মৌল ধারণারও পুনঃসংজ্ঞায়ন করেছেন। তাঁর মতে, বাইবেলে বর্ণিত সিয়ন ও অ্যাবেলের গল্প ইতিহাসে শাসক/শোষক (সিয়ন) ও শাসিত/শোষিতের (অ্যাবেল) মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের প্রতীকী রূপ। ইনতিজার (অথবা বারো ইমামের পূর্বাভাস বা পুনরুত্থান) মানে ন্যায়বিচারের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করা নয়; বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ—এমন সংগ্রাম যেখানে লক্ষ্য অর্জন সুনিশ্চিত। শিয়া ধর্মকেও শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। শোষকেরা এটাকে কর্তৃত্বের দিকে নিয়ে যায় (সাফাভি শিয়াবাদ) এবং শোষিতেরা এটাকে মুক্তির মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে (আলাভি বা লাল শিয়াবাদ)। উলামা বা ধর্মগুরুদের কর্তব্য হলো সবচেয়ে গুরুভার দায়িত্ব, অর্থাৎ শোষিতের শিয়াধর্ম বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করা। ধর্মগুরুরা তাঁদের নির্বুদ্ধিতা, নিয়তিবাদ ও ইসলামের ব্যাখ্যার ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং ক্ষমতাবানদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে শিয়া ধর্মকে বিপ্লবী মতবাদ থেকে রক্ষণশীল মতাদর্শে পরিণত করেন।

তা ছাড়া, শারিয়াতির মতে, ধর্মদ্রোহ (কুফর) 'কখনোই' 'যাঁরা খোদার অস্তিত্ব ও আত্মাকে অস্বীকার করেন' তাঁদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়; বরং তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা বিপ্লবের জন্য 'সুনির্দিষ্ট' ও নৈর্ব্যক্তিক পদক্ষেপ নিতে অনীহা প্রকাশ করে।[১৬] কুফর সম্পর্কে এ রকম ধারণার কারণেই শারিয়াতি মার্ক্সবাদীদের বাতিল করে দেননি, যা ধর্মগুরুরা করেছেন এই যুক্তিতে যে মার্ক্সবাদীরা বস্তুবাদী, নাস্তিক, অনৈতিক ও ধর্মদ্রোহী (কুফ্ফার); বরং তিনি মোল্লা সম্প্রদায় ও ফিক্হ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের ব্যাপারে অব্যাহত সমালোচনা জারি রেখেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আমাদের মসজিদ, আমাদের বিপ্লবী বামপন্থীরা এবং আমাদের (নিম্নশ্রেণির) ধর্মপ্রচারকেরা (উয়াজ, যাঁরা ওয়াজ করেন) বঞ্চিতদের পক্ষে এবং অমিতব্যয়ীদের (দুনিয়াদারান বা যাঁরা দুনিয়াদার) বিপক্ষে কাজ করেন। কিন্তু আমাদের ফিক্হবিদ যাঁরা আইন শিক্ষা দেন এবং রায় প্রদান করেন, তাঁরা ডানপন্থী, পুঁজিবাদী এবং রক্ষণশীল। এককথায়, আমাদের ফিক্হ পুঁজিবাদের পক্ষে কাজ করে।'[১৭]

৮

মার্ক্সবাদের প্রতি (পক্ষে ও বিপক্ষে) শারিয়াতির এই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি তৃতীয় বিশ্বে কোনোভাবেই অনন্য নয়। বাস্তবতা হলো, এটা অনুন্নত দেশগুলোর উত্তরাধুনিক র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যসূচক (টিপিক্যাল) প্রবণতা। শারিয়াতি সরাসরি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যেসব ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফ্রান্জ ফাঁনো, এমি সিজার থেকে কয়্যামি এনকুরুমা, জুলিয়াস নয়্যার, কেনিয়েত্তা, বেন বেলা প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে এসব চিন্তা 'বিকল্প' রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহকে উৎসাহিত করে, যেগুলোর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল পুঁজিবাদের ঘোষিত প্রত্যাখ্যান এবং জাতীয় ও দেশজ সম্পদ, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা। বাস্তবে এই ধারার উন্নয়ন চিন্তার প্রবণতা হিসেবেই 'তৃতীয় পন্থা'র উন্নয়ন কৌশল আবির্ভূত হয়েছিল। এই কৌশল প্রতিফলিত হয়েছিল আরব, বাথিস্ট, আফ্রিকান 'সমাজতন্ত্র' কিংবা 'উন্নয়নের অ-পুঁজিবাদী পথ' ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের 'দেশজ সমাজতন্ত্রে'র মধ্য দিয়ে। তাঞ্জানিয়ার জুলিয়াস নয়্যার ১৯৬২ সালে বলেছিলেন :

> আফ্রিকান সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, লক্ষ্যবস্তু হলো বৃহত্তর পরিবার...ফলে, 'উজামা' বা 'পারিবারিক বন্ধন'ই আমাদের সমাজতন্ত্রকে বিবৃত করে। পুঁজিবাদ, যা মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের মাধ্যমে সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এই সমাজতন্ত্র তার বিরোধী; এটা একই রকমভাবে তত্ত্বের প্রতি অন্ধ সমাজতন্ত্র (Doctrinaire), যা মানুষে মানুষে অনিবার্য সংঘাতের দর্শন দিয়ে সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারও বিরোধী। আফ্রিকায় আমাদের আর সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার দরকার নেই, তেমনি আমাদের গণতন্ত্রে 'শিক্ষিত' হওয়ারও দরকার নেই। উভয় মতাদর্শই আমাদের অতীতের ঐতিহ্যবাহী সমাজ যা আমাদের তৈরি করেছে, তার মধ্যে প্রোথিত আছে। 'সমাজ'কে মৌলিক পারিবারিক এককের সম্প্রসারণ হিসেবে বিবেচনা করা, যা তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, তা থেকেই আধুনিক আফ্রিকান সমাজতন্ত্র উদ্ভূত হতে পারে।'[১৮]

মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরও ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তাঁর *সমাজতান্ত্রিক সনদ* (*আল'মি'ছাক*) গ্রন্থে এবং পেরুর সামরিক অফিসার যাঁরা ১৯৬৮ সালে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তাঁরাও একই ধরনের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে, 'তৃতীয় বিশ্বের জনতুষ্টিবাদে', এবং নিজেদের 'কট্টর মার্ক্সবাদী'দের থেকে দূরে রাখতে চান এবং নিজেদের ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত মতাদর্শিক উত্তরাধিকারের ওপর নির্ভর করতে চান তৃতীয় বিশ্বের এমন র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই নতুন মতাদর্শিক প্রবণতা প্রতিভাত হয়েছিল। ধারণাগতভাবে, 'জনতুষ্টিবাদ'-এর বিভিন্ন গূঢ়ার্থ রয়েছে। যেমন জনতুষ্টিবাদী শাসক দল, যারা নিজেদের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে জনপ্রিয় শ্রেণির (শ্রমিক, কৃষক

ও 'দরিদ্র জনগোষ্ঠী') ওপর নির্ভর করে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ও উন্নয়ননীতির অনুগামী হতে চায়, তারাই আবার কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজিবাদী (স্টেট ক্যাপিটালিস্ট) অর্থনৈতিক নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে, গ্যাভিন কিচিং এই প্রপঞ্চটি ব্যবহার করেছেন এমন একটা উন্নয়ননীতি বোঝাতে, যা 'পুরোনো অর্থডক্সি', অর্থাৎ ক্ষুদ্রশিল্পের বিপরীতে বৃহৎ শিল্প, কৃষির বিপরীতে শিল্প এবং গ্রামীণ উন্নয়নের বিপরীতে নগর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৃহৎ শিল্প উন্নয়নের বিকল্প প্রস্তাব করে।[১৯]

'তৃতীয় বিশ্বের জনতুষ্টিবাদ' বলতে আমি এখানে একটি বিশ্লেষণধর্মী ও মতাদর্শগত কাঠামো বোঝানোর চেষ্টা করছি, যা জাতীয়তাবাদ, র‍্যাডিক্যালিজম, 'পরনির্ভরশীলতা'-বিরোধিতা, শিল্পায়ন-বিরোধিতা এবং কোনো না কোনোভাবে পুঁজিবাদবিরোধিতার সংমিশ্রণকে উপস্থাপন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় বিশ্বের জাতিগুলোর 'অনুন্নয়নে'র জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর তাদের (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিশেষত সাংস্কৃতিক) নির্ভরশীলতাকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হয়। শিল্পায়ন-বিরোধিতা, পুঁজিবাদ-বিরোধিতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রতি আনুগত্যের মাত্রা নিয়ে ভিন্নতা থাকলেও যুদ্ধোত্তরকালে তৃতীয় বিশ্বের র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীরা এই মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন বলে মনে হয়।

কিন্তু এই মতাদর্শিক প্রবণতার উৎস কী ছিল? সম্ভবত একটা উৎস ছিল 'নির্ভরশীলতা' প্যারাডাইম, যা প্রধানত ১৯৪০-এর দশকে রাউল প্রেবিস প্রমুখ লাতিন আমেরিকান অর্থনীতিবিদেরা উদ্ভাবন করেছেন এবং পরবর্তীকালে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে আঁদ্রে গুন্ডার ফ্রাংক, সামির আমিন, ফার্দিনান্দো কারদোসো ও থিউটনিও দস সান্তোস বিকশিত ও জনপ্রিয় করেছেন। প্রভাবশালী 'আধুনিকায়ন' তত্ত্ব, যা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নকে 'গণভোক্তায়নে'র (ম্যাস কনজাম্পশন) সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার পথে একটা স্বাভাবিক স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করে, নির্ভরশীলতা তত্ত্ব এর একটি শক্তিশালী সমালোচনা হাজির করেছে। গণভোক্তায়ন তত্ত্বে এটা জোর দিয়ে বলা হয়, উন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে অর্গানিক সম্পর্ক গণভোক্তায়নের পথে এই উত্থানকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বিপরীতে, নির্ভরশীলতা তত্ত্বে অসম বিনিময়, ঔপনিবেশিকতা এবং আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বকে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় (কেন্দ্র) অন্তর্ভুক্তিকরণকে তৃতীয় বিশ্বের (প্রান্ত) অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যকার এই কর্তৃত্বের সম্পর্কের বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণির পরিবর্তে বিশ্লেষণের একক হয়ে দাঁড়ায় 'অঞ্চল', 'জাতি' ও 'দেশ'। ফলে নির্ভরশীলতা প্যারাডাইমে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো উন্নত

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো দ্বারা শোষিত হচ্ছে। কেন্দ্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই প্যারাডাইমের নিহিতার্থ হলো তা জাতীয় ঐক্যের একটি কৌশল, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র, ছাত্র, নতুন মধ্যবিত্ত এবং 'জাতীয় বুর্জোয়া'—এসব শ্রেণির ঐক্য। এই কৌশলের তাৎপর্য হলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য তৈরি করার জন্য বিচিত্র এমনকি পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংশ্লিষ্ট 'জাতীয়' শ্রেণিগুলোকে একতাবদ্ধ হতে হবে। তবে এ রকম জোটের মধ্যে অধস্তন শ্রেণিগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে প্রায়ই আপস করা হয় এবং প্রভাবশালী শ্রেণির সুবিধার্থে তা বিসর্জন দেওয়া হয় (অর্থাৎ, শ্রমিকেরা তাঁদের পুঁজিবাদী 'দোসর'দের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে না, কিংবা বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের জাতীয় শাসকশ্রেণির সমালোচনা করে না ইত্যাদি)। জাতীয়তাবাদ এবং র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থিত তৃতীয় বিশ্বের জনতুষ্টিবাদের উত্থানের ক্ষেত্রে এই প্রভাবশালী নির্ভরশীলতা প্যারাডাইমই দায়ী।

যা-ই হোক, তৃতীয় বিশ্বের র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীদের তৃতীয় বিশ্বের জনতুষ্টিবাদ (অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদবিরোধিতা, শিল্পায়নবিরোধিতা এবং মার্ক্সবাদ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ) ছিল প্রধানত তাদের নিজ নিজ দেশের বাস্তব আর্থসামাজিক অবস্থার ফলাফল। প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ছিল সাবেক উপনিবেশ। ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে বিকৃত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর বিধ্বংসী প্রভাব রেখে গেছে। ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের আক্রমণে সেখানে দুই ধরনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে : এক. আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের পাশাপাশি শিল্পায়ন ও পশ্চিমা প্রযুক্তির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া[২০] এবং দুই. ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য। এই প্রেক্ষাপটে, শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের ধারণা হয় 'জনগণ', 'জাতি', 'জনসাধারণ' ইত্যাদি ধারণা দ্বারা ম্লান হয়ে গেছে, কিংবা জাতীয়তাবাদ/পুঁজিবাদ-বিরোধিতার প্রচার-প্রকল্পে লাগসই করার জন্য পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ফলে শারিয়াতি এই ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হন যে শ্রেণি অর্থনৈতিক সত্তা নয়; বরং প্রধানত রাজনৈতিক একক, যেখানে বুদ্ধিজীবীরা সমাজের চালিকাশক্তি। একইভাবে জুলিয়াস নয়্যারও এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে 'শ্রেণিসংগ্রামে'র ধারণা এমন সমাজের (তানজানিয়ার মতো) জন্য প্রযোজ্য নয়, যা উজামা (বা পারিবারিক বন্ধন) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় আরেকটি অনুঘটক আছে, যা সামাজিক শ্রেণিগুলোর পুনঃসংজ্ঞায়ন এবং এসব বুদ্ধিজীবীর মধ্যে শ্রেণি রাজনীতির অনুপস্থিতির পেছনে ভূমিকা রেখেছে তা হলো, এসব রাষ্ট্রে তখনো শিল্পায়ন ঘটেনি। এখানে শিল্পশ্রমিক শ্রেণি জনসংখ্যার

ক্ষুদ্র একটা অংশ এবং ভাসমান বা শ্রেণিচ্যুত জনসাধারণই (কৃষক, দরিদ্র ও সরকারি চাকরিজীবী) জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রেক্ষাপটে জনতুষ্টিবাদ বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাছে সাধারণভাবে 'শ্রেণি রাজনীতি' এবং বিশেষভাবে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র ম্লান হয়ে যেতে বাধ্য।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ সামাজিক অবস্থা যখন এসব দেশের র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীদের জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদবিরোধিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং মার্ক্সবাদী অর্থনৈতিক মতাদর্শের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল, তখন যুদ্ধ-পরবর্তীকালে স্টালিনের সোভিয়েত রাশিয়া গৃহীত প্রয়োগবাদী নীতি মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাদের অনীহ করে তোলে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর শাসকশ্রেণির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর আঁতাতের ফলে এসব বুদ্ধিজীবী ক্ষুব্ধ হন। তা ছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরি ও ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে স্টালিনের নিগ্রহ-নিপীড়ন তাঁদের আতঙ্কিত করে তোলে। এই বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যাঁরা এসব ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তাঁরা কট্টর মার্ক্সবাদী হয়ে ওঠেন। তাঁরা হয় স্টালিনীয় নিগ্রহকে বুর্জোয়াদের আগড়ম-বাগড়ম (বুর্জোয়া) ননসেন্স বলে উড়িয়ে দিতেন কিংবা বিভিন্নভাবে এসবের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করতেন।

এটা সর্বজনবিহিত যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বনাম প্রাচ্যের স্টালিনীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যকার বৈশ্বিক মেরুকরণের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হলো ১৯৬১ সালের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)। যখন আন্দোলনের নেতাদের কারও কারও জোট নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় (বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁদের কোনো না কোনো ক্যাম্পের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের জোটভুক্ত হতে বাধ্য করেছিল), র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীরা তখনো নির্ভেজালভাবে নিজস্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকেন। বিশেষ করে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা জাতীয় পরিচয়, নিজস্ব মূল্যবোধপদ্ধতি, গভীরে প্রোথিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ওপর জোর দিয়ে 'নিজের দিকে প্রত্যাবর্তনে'র আহ্বান জানান। লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্য উভয় অঞ্চলেই ধর্ম যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান, ফলে সেখানে ধর্মকে রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আফ্রিকায় তেমনি ব্যবহার করা হয়েছে উপনিবেশ-পূর্ব সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যকে। তবে তুলনামূলকভাবে উন্নত শ্রেণিকাঠামোর কারণে লাতিন আমেরিকায় শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির (অর্থাৎ মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্র/সিন্ডিক্যালিজম ও নৈরাজ্যবাদী-শ্রমিকতন্ত্র/অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজম) পাশাপাশি র‍্যাডিক্যাল ক্যাথলিজম ও

লিবারেশন থিওলজিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আধুনিক শ্রেণিকাঠামোর ধীর বিকাশের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে এখন পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণি-রাজনীতির তুলনায় ইসলামি মতাদর্শ বেশি গুরুত্ব বহন করে চলেছে। এসব দেশে, তুলনামূলকভাবে ব্যতিক্রম তুরস্ক ও মরক্কো ব্যতীত, অধস্তন শ্রেণি তাদের স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা নিজস্ব ভাষা, ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরার মতো 'সাবালক' হয়ে ওঠেনি। তা করার জন্য তাদের প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান থেকে ধার করতে হয়েছে। ইসলাম সেই সাংস্কৃতিক কাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের বহু নেতার মতো, যদিও নিজ দেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আলি শারিয়াতি (যিনি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও এর সাংস্কৃতিক প্রবণতা সম্পর্কে গভীরভাবে বীতশ্রদ্ধ, পুঁজিবাদী পশ্চিম ও মার্ক্সবাদী প্রাচ্যের মধ্যকার বৈশ্বিক বিরোধিতার কালে বড় হয়েছেন এবং বিবর্তিত হয়েছেন একটি অশিল্পায়িত ও আধা ঔপনিবেশিক স্থানীয় পরিবেশে) মতাদর্শ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ হিসেবে ধর্মকেই (ইসলাম) অবলম্বন করেছেন, যা ইরানি জনসাধারণের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত বলে তিনি মনে করতেন। ইসলামকে পশ্চিমা (প্রধানত মার্ক্সবাদী) সমাজবৈজ্ঞানিক/রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে সংমিশ্রিত করে তিনি তাঁর জাতির মুক্তির পথ হিসেবে ইসলামি সংস্কার আন্দোলন (রিফরমেশন) শুরু করেছেন।

৯

পাঠক হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছেন যে, যেখানে বইটির, *মার্ক্সিজম অ্যান্ড আদার ওয়েস্টার্ন ফ্যালাসিজ,* বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের সম্মুখীন, সেই বইয়ে উত্থাপিত ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার যুক্তি কী। এর কারণ হলো যেসব চিন্তা, ডিসকোর্স ও দৃষ্টান্ত এই বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এবং শারিয়াতির নামে চালানো হয়েছে (অ্যাট্রিবিউটেড), লেখক-নিরপেক্ষভাবেই তা এখন বিশেষ মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছেন। এই চিন্তাগুলো, সম্ভবত আলি শারিয়াতির খ্যাতির কল্যাণেই, ইরানের র‍্যাডিক্যাল মুসলিম তরুণদের মধ্যে মার্ক্সবাদের গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ইসলামি সমালোচনার ভিত্তিমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি, বিপ্লব-পূর্ব সেই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলোতে এ রকম বইই (নিশ্চিতভাবেই আলোচ্য বইও তার অন্তর্ভুক্ত) আমাদের বিরোধী মুসলিম গ্রুপকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, মোহাচ্ছন্নতা, কল্পনা, বিকৃতি—এসব 'অবাস্তব' ও 'অবিশ্বাসযোগ্য' সত্তাগুলোরও একটা সত্যিকার অস্তিত্ব থাকে এবং সেগুলো বাস্তব তাৎপর্য বহন করে, কখনো কখনো তা হয় গুরুতর। ফলে 'অবাস্তব' ও 'অবিশ্বাসযোগ্য' বিষয়ের সমালোচনা তৈরি করাও অযথার্থ নয়।

কৃতজ্ঞতা : এই প্রবন্ধের আদি ভার্সনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও সম্পাদকীয় পরামর্শের জন্য আলি আশতিয়ানি, এরভান্ড অ্যাব্রাহামিয়ান, নিকোলাস হপকিন্স ও লিন্ডা হেরেরোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে তাঁরা কেউই এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত কোনো তথ্যগত ত্রুটি ও মূল্যায়নের জন্য দায়ী থাকবেন না।

টীকা

১. See for example Ervand Abrahamian "Ali Shariati : Ideologue of Iranian Revolution", *Merip Reports*, no.102 (1982); and Mangol Bayat, Iran's Real Revolutionary Leader", *Christian Science Monitor*, May 24, 1977.

২. See Hamid Algar, in *A. Shariati, Marxism and Other fallacies,* (Barkeley : Miza Press, 1982), Preface.

৩. M. Bayat, *ibid*.

৪. শারিয়াতির ওপর লিখিত বিদ্যমান রচনাগুলোয় পদ্ধতিগত ও বিচার-বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়নের চেয়ে তাঁর চিন্তা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে তেহরানে আলী আকবর আকবরী (সম্ভবত তিনি ছিলেন ইরানি কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান মতাদর্শিক নেতা ইহসান তাবারি) ছদ্মনামে *বার্‌রাসি'য়ে চাঁদ মাসা'লি'য়ে ইজতিমাঈ* (কিছু সামাজিক ঘটনার মূল্যায়ন) শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় শারিয়াতি যে অধিকতর বিচার-বিশ্লেষণমূলক ও পরিশীলিত মার্ক্সবাদকে অগ্রাহ্য করে যান্ত্রিক মার্ক্সবাদের সমালোচনা করেছেন, তার সমালোচনা করা হয়।

ইংরেজি ভাষায় লিখিত যেসব রচনায় শারিয়াতি ও তাঁর চিন্তা আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : Mangol Bayat, "Iran's Real Revolutionary Leader", *Christian Science monitor,* May 24, 1977; M. Abedi, "Ali Shariati : The Arhitect of the 1979 Islamic Revolution in Iran", *Iranian Studies,* Vol. xix, nos. 3-4, (1986); A. Sachedina, "Ali Shariati : Ideologue of the Iranian Revolution", in J.L. Espositio (ed.), *Voices of Resurgent Islam,* (New York/Oxford : Oxford University Press, 1983); E. Abrahamian, "Ali Shariati : Ideologue of the Iranian Revolution", in *Merip reports,* no.102, (1982); H. Enayet, *Modern Islamic political Thought,* (Austin : University of Texas Press, 1982), pp. 53-59; S. Akhavi, "Islam, Politics and Society in the Thought of Ayatollah Khomeini, Ayatollah Taliqani and Ali Shariati", *Middle Eastern Studies,* vol.24, no.4 (Oct. 1988)। এখন পর্যন্ত শারিয়াতির ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন Ervand Abrahamian, in *Radical Islam : Mujahedin of Iran, (*New Heaven : Yale University Press, 1989), chapter 4.

৫. এই জীবনীমূলক তথ্যের জন্য প্রধানত Ervand Abrahamian, *Radical Islam,* chapter 4-এর ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

৬. See. M. Abedi, op.cit., p.230.

৭. Ali Shariati, *Marxism and Other Western Fallacies,* p.21.

৮. ইরানে বর্তমান ক্ষমতাসীন মোল্লা সম্প্রদায়ও আলি শারিয়াতিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছিল। তাঁর বার্ষিক স্মরণসভা, তাঁর কাজের প্রদর্শনী ইত্যাদি তা-ই প্রমাণ করে। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, আলি শারিয়াতি বর্তমানে জীবিত নেই এবং ফলে ইরানের বর্তমান ক্ষমতাসীন মোল্লা সম্প্রদায় যে ধরনের ইসলাম প্রচার করতে চায়, তিনি তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারবেন না। হামিদ অ্যালগার তাঁর বইয়ের ভূমিকায় শারিয়াতি ও ক্ষমতাসীন মোল্লা সম্প্রদায়ের মধ্যকার রাজনৈতিক অবস্থান ও মতাদর্শিক প্রবণতার মধ্যে ব্যবধান কমানোর প্রয়াস নিয়েছিলেন। তবে তাঁর এই প্রচেষ্টার বিপক্ষে বহু শক্তিশালী প্রমাণ আছে বলেই মনে হয়। প্রথমেই বলতে হয়, আয়াতুল্লার রেজিমের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধের সূচনাকারী মুজাহেদিন খাল্‌ক-এর নেতারা ছিলেন শারিয়াতির ছাত্র। এ ছাড়া সম্প্রতি শারিয়াতির পিতার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'শারিয়াতির চিন্তা প্রচার কেন্দ্র' (*দাফার-ই নশর-ই আকাঈদ-ই শারিয়াতি*) কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। সর্বোপরি শারিয়াতির বিধবা স্ত্রী, অ্যাব্রাহামিয়ানের (*Radical Islam*) মতে, বলেছেন যে জীবিত থাকলে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে কারাগারে থাকতে হতো।

শারিয়াতি ও ক্ষমতাসীন মোল্লাদের অবস্থানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রথম সাংগঠনিক প্রকাশ ঘটে ফোরকান গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে। শারিয়াতির ইসলামের (যার একটা অনুষঙ্গ ছিল মোল্লাতন্ত্র-বিরোধিতা) অনুসারী এ গ্রুপই আয়াতুল্লাহ মুতাহ্‌হারী (শাহ-রেজিমের ছত্রচ্ছায়ায় শারিয়াতির প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বী), আয়াতুল্লাহ মোফাত্তেহ প্রমুখ রক্ষণশীল মোল্লাকে হত্যা এবং হাশেমি রাফসানজানিকে (ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বর্তমান [লেখার সময়ে] প্রেসিডেন্ট) হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করেছিল। ফোরকান গ্রুপ 'এমন ব্যক্তিদের নির্দেশে পরিচালিত হতো যারা সাবেক রেজিম ও' যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিলেন—অধ্যাপক অ্যালগারের এই দাবির কোনো ভিত্তি নেই। এই গ্রুপের প্রায় সব সদস্য উত্তর তেহরানের গোলহাক এলাকার, যেখানে হুসেইনিয়া সেন্টার অবস্থিত, সেখানকার প্রথাগত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এই গ্রুপের নেতা যাকে ইসলামি রেজিম হত্যা করেছে, সে ছোটবেলায় আমি যে এলাকা দিয়ে স্কুলে যেতাম, সেখানকার একটি মুদি দোকানির সন্তান। বিপ্লবের আগে গোলহাক ছিলেন শারিয়াতি স্টাডি গ্রুপগুলোর সমাবেশের জন্য বিখ্যাত।

৯. See Tom Bottomore et al., eds., *Dictionary of Marxist Thought,* (Oxford : Basil Blackwell, 1984), p.415.

১০. George Thomson, op.cit., p.4.

১১. কিছু মার্ক্সবাদী চিন্তক যেমন *The Poverty of Theory* (London : Merlin Press, 1979)-এ থম্পসন এবং *Problems in Materialism and Culture* (London : Verso Press, 1980)-এ রেমন্ড উইলিয়ামস যুক্তি দেখান যে, মার্ক্সের কাছে 'উপরিকাঠামো' ও 'মূল' বাস্তবে এক এবং একই জিনিস এবং তাদের পার্থক্য শুধু প্রতীকী।

১২. A. Shariati, *Jahatgiri-ye Tabaqati-e Islam (Class Bias of Islam) (Tehran : 1359/1980)* Collected Works, vol.10, p. 16.

১৩. E. Abrahamian, *Radical Islam,* Chapter 4.

১৪. S. Akhavi, op. cit., chapter 4.

১৫. E. Abrahamian, *Radical Islam,* Chapter 4.

১৬. From Shariati's *Lessons on Islamology, as cited in* E. Abrahamian, *Radical Islam,* p.117

১৭. A Shariati, *Jahatgiri-ye Tabaqati-e Islam,* vol.10, pp. 37-38.

১৮. J Nyerere, *Freedom and Unity : Uhuru na Umoja,* (London : Oxford University Press, 1962), cited in G. Kitching, *Development and Underdevelopment in Historical Perspective,* (London : Methuen, 1982), pp. 64-65.

১৯. Gavin Kitching, op. cit.

২০. ইরানে নির্ভরশীলতাবিরোধিতা ও শিল্পায়নবিরোধিতা খুবই শক্তিশালী এবং কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। প্রসিদ্ধ র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী জালাল-ই আল-ই আহমদ তৃতীয় বিশ্বের এই নির্ভরশীলতাকে (প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও বিশেষত সাংস্কৃতিক) সামগ্রিক 'পশ্চিমদূষণ' (*Gharbazadegi*) হিসেবে অভিহিত করেছেন। একই নামে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় বইয়ে তিনি বলেন, 'একবার শহর-গ্রামে মেশিন স্থাপন করা হলে, তা হোক ইঞ্জিন-মিল কিংবা টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি, এটা স্থানীয় শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে যাবে, ওয়াটার-মিলগুলোকে অকেজো করে দেবে, হস্তশিল্পকে বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে কার্পেট, গালিচা ও পশম-বস্ত্র...উৎপাদন ধ্বংস হয়ে যাবে।' (in *Gharbzadegi*, Tehran, p. 49)। একসময়ের তেদুহ (কমিউনিস্ট পার্টি) সদস্য আল-ই আহমদ 'পশ্চিমদূষণ' প্রতিরোধের জন্য একমাত্র মতাদর্শ হিসেবে শিয়া ধর্মের পুনরুত্থানের অ্যাডভোকেসি করেন।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে ইরানের প্রথাগত মার্ক্সবাদীদের মধ্যেও জনতুষ্টিবাদ প্রসারিত হয়েছিল। তাঁরাও ছিলেন জাতীয়তাবাদী, ধনবান ও ধন শুধু নয়; বরং সম্পদেরই (পার সে) বিরোধী হওয়ার কারণে লার্জ-স্কেল ও পশ্চিমা ধাঁচের শিল্পায়নের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ। অনেক মার্ক্সবাদী নেতা (যেমন, খসরু গোল-ই শোরকি, রাজপরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যাঁকে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে শাহ ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে) ইসলামের মধ্যে কিছু বৈপ্লবিক উপাদান পেয়েছেন, যা সমাজতন্ত্রের সুবিধার্থে কাজে লাগানো যাবে। এ-সংক্রান্ত ভালো আলোচনার জন্য দেখুন, *Nazm-i Novin*, no.7, special issue on "Islam and Marxism" (New York, 1985) (in Persian); and *Kankash* (A Persian Journal of History and Politics), nos. 3-4, special issue on "The Intellectuals" (New York, 1988) (in Persian).

ভারত প্রসঙ্গ



ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও মার্ক্সের লেখনী : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও যুক্তিতর্ক

মোফাখ্‌খারুল ইসলাম

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শাসন ও তার প্রভাবের ওপর কার্ল মার্ক্সের লেখাগুলো ছিল বিশেষ করে কলাম ও সম্পাদকীয়। *নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন*-এ[১] ১৮৫০ সালের দিকে সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এই লেখাগুলো অসংখ্যবার পঠিত হয়েছে ও নানা মতের পণ্ডিতেরা সেই লেখার বিভিন্ন দিক নিয়ে ভেবেছিলেন। সেই পণ্ডিতদের অনেকে আবার ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক এবং পূর্ব-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মার্ক্সের তথ্যের উৎপত্তি নিয়েও আলোচনা করেছেন। এখন মনে হতে পারে যে এই বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনার সুযোগ খুব একটা নেই। কিন্তু আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হলো, মার্ক্স যেসব মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ওপর তার চূড়ান্ত অভিমত ও মূল্যায়ন দিয়েছিলেন, সেই মানদণ্ডগুলো খুব সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখানো ও যুক্তি দিয়ে সেই প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এ লেখাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ নিয়ে মার্ক্সের লেখাগুলোর সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে মার্ক্সবাদীরা উপনিবেশবাদ নিয়ে মার্ক্সের পর্যালোচনাকে কীভাবে দেখেছিলেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত বরাত দেওয়া হয়েছে। একদম শেষ ভাগে দেখানো হয়েছে যে যদিও জীবনের প্রথম দিকে মার্ক্স উপনিবেশবাদকে প্রগতিশীল ও গঠনমূলক হিসেবে দেখেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছিলেন ও একপর্যায়ে বাদ দিয়েছিলেন। যা-ই হোক, ভারতবর্ষের ওপর ইউরোপীয়দের পরম্পরাগত মন্তব্য থেকে মার্ক্স যে সাধারণ ধারণা পেয়েছিলেন, সংক্ষিপ্তভাবে তা দিয়েই শুরু করা হলো।

মূখ্য শব্দগুচ্ছ

কার্ল মার্ক্স, মার্ক্সের লেখনী, উপনিবেশবাদ, ভারতবর্ষ, ব্রিটিশ লুটতরাজ

● অনুবাদ : **মো. ফাহাদ হোসেন**

পূর্ব-ঔপনিবেশিক ভারতের ওপর প্রাথমিক ভাবনা

১৮৫৩ সালে মার্ক্স পূর্ব-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও সমাজের ওপর তাঁর প্রাথমিক ভাবনাগুলো এঙ্গেলসের সঙ্গে চিঠিতে ও *নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন*-এর আর্টিকেলগুলোয় তুলে ধরেছিলেন। মার্ক্সের মতানুসারে পূর্ব-ঔপনিবেশিক ভারতের মূল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবহমান গ্রামীণ জীবন। ওই সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'কৃষি ও উৎপাদনমূলক ব্যবস্থার ওপর ঘরোয়া ঐক্যের আধিপত্য'। হস্তশিল্পের একধরনের অদ্ভুত মিশ্রণে সুতা কাটা, কাপড় বোনা থেকে শুরু করে হস্তনির্ভর কৃষি ভারতের গ্রামীণ মানুষকে স্বাবলম্বী করেছিল। কিন্তু এই স্বাবলম্বী গ্রামীণ মানুষগুলো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আর তা হলো কৃষিতে সেচের জন্য কৃত্রিম খাল খনন অথবা বড় জলাধার নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রের কাছে তাদের ধরনা দিতে হতো। মার্ক্স এটা স্বীকার করেছিলেন যে যেকোনো ব্যক্তি ওই নির্বিরোধ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আকর্ষণ খুঁজে পাবে। কিন্তু তিনি এটাও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে বর্ণ ও গোত্রের ভেদাভেদ এবং দাসত্বের বিষবাষ্প মানুষের মনকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম পরিসরে নিয়ে গিয়েছিল, যা বাস্তবে প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র ও স্থবিরতার ভিত পাকাপোক্ত করেছে।[২]

মার্ক্সের মতে, পূর্ব-ঔপনিবেশিক ভারতের আরও একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল যে এখানের রাজাই ছিলেন সব জমিজমার একচ্ছত্র মালিক। ইতিমধ্যে ১৮৫৩ সালের দিকে মার্ক্স বার্নিয়ারের *ভয়েজেজ* পড়েছিলেন এবং জুনের ২ তারিখে বার্নিয়ারের লেখা নিয়ে তিনি এঙ্গেলসকে চিঠি লিখেছিলেন। মার্ক্স বার্নিয়ারের লেখা নিয়ে তাঁর চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন যে বার্নিয়ারের লেখায় প্রাচ্যের ও ভারতের উজ্জ্বল, জীবন্ত ও চমক লাগানো ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে তুরস্ক, পারস্য (বর্তমান ইরান) ও হিন্দুস্তানে (ভারত) কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকাই হলো প্রাচ্যের স্বর্গ শামিল জীবনধারার মূল আধার।[৩]

১৪ জুনের একটা চিঠিতে তিনি (মার্ক্স) এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন যে ভারতের অনেক এলাকায় গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো এজমালি (যৌথভাবে) জমি চাষাবাদ করে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই জমির মালিক নিজেই তাঁর জমি আবাদ করেন।[৪] তা ছাড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য, ব্যক্তিমালিকাধীন জমির অভাব এবং গ্রামীণ সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতি পূর্ব-ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক জীবনে গতিশীলতার অভাব নিয়ে এসেছিল, যা একধরনের স্থবিরতার উপলক্ষণ। আর এ কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারত উপমহাদেশের আর্থসামাজিক জীবন অপরিবর্তিত ছিল। মার্ক্স আরও যুক্তি দেখান যে,

এমনকি জটিলভাবে সম্পৃক্ত সব গৃহযুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, বিপ্লব, বিজয়, দুর্ভিক্ষ যতটা খাড়াভাবে এই উপমহাদেশের (ভারত) ওপর নেমেছিল, ততটা গভীরে প্রবেশ

করেনি। সবকিছুর প্রভাব ওপরের স্তরেই ছিল। ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা আঠারো শতকের প্রথম দশকের আগ পর্যন্ত খুব প্রাচীনই ছিল।[৫]

১৮৫৩ সালে মার্ক্সের কাছে প্রাচ্যের সমাজব্যবস্থার যে মানদণ্ড ছিল, তার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—গ্রামীণ সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তিমালিকাধীন সম্পত্তির অনুপস্থিতি ও স্থবিরতা। এসব মৌলিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই মার্ক্স ১৮৫৯ সালে তাঁর 'এশিয়ার উৎপাদন প্রণালি'র (এশিয়াটিক মুড অব প্রোডাকশন) রূপরেখা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং ভারত উপমহাদেশের আর্থসামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে মার্ক্সের ধারণা, তার স্বর ও লয় অনেকটাই ইউরোপীয় বোদ্ধাদের মতো পরম্পরাগত ছিল। এই চলমান ধারণা আরও থিতু হয় প্রাচ্যের এই স্থবিরতা ও অপরিবর্তনশীলতার কথা মার্ক্স যখন বারবার বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সম্পদের মালিকানা নিয়ে মার্ক্সের পূর্ব-ঔপনিবেশিক আমলের ধারণার বিশেষভাবে পরিবর্তন হলেও ১৮৫৩ সালে তিনি স্পষ্টতই মত দিয়েছিলেন যে রাজাই হলেন সব সম্পদের একচ্ছত্র মালিক।[৬]

ব্রিটিশদের বিজয়ের পূর্বশর্ত

মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আগমন ও তাদের বিজয়ের পূর্বশর্ত এই ভারতীয় মাটিতেই লুকিয়ে ছিল। ভারতকে আক্রমণ করার ও শাসনের খড়্গতলে নিয়ে আসার জন্য অন্য জাতিকে অপরিহার্যভাবে সুযোগ করে দিয়েছিল এই উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থায় সক্রিয়তার অভাব এবং হিন্দু-মুসলিম, বিভিন্ন গোত্র, জাত ও বর্ণের মানুষের মধ্যে চিরাচরিত বিদ্বেষ ও বিভেদ। মার্ক্স খুব দৃঢ়ভাবে বলেছেন :

কীভাবে ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার হয়? মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরাই (ভাইসরয়) মোগল সাম্রাজ্যের ইস্পাতকঠিন ভিত ভেঙে দেয়। আর সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতাকে নড়বড়ে করে দেয় মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতার শিকল ভেঙে দেয় আফগানরা। ঠিক এভাবেই যখন এক পক্ষ অন্য পক্ষের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখনই সুযোগ বুঝে ব্রিটিশরা এসে সবাইকে কাবু করে ফেলে। যে দেশ শুরু থেকে শুধু হিন্দু-মুসলিমেই নয়, জাত-পাত-গোত্র প্রতিটা ক্ষেত্রেই বিভক্ত ছিল, যে দেশ ভেতর থেকেই যুদ্ধে-বিগ্রহে নাজুক, যে দেশের প্রতিষ্ঠিত কোনো সংবিধান নেই, সেই দেশের ও সেই সমাজের ভাগ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও বিজয় কি নিশ্চিত নয়?[৭]

এই একই লেখায় মার্ক্স এটাও বলেন যে যেভাবেই হোক না কেন, ভারতের ইতিহাসের অন্য সব পরাজয়ের মতো ব্রিটিশদের হাতে তার পরাজয়ও ভারত এড়িয়ে যেতে পারত না। সুতরাং মোদ্দা কথায় বলা যায় যে মার্ক্স মনে করতেন, ব্রিটিশদের ভারত শাসন করার অধিকার নয়, বরং আমাদের নিজেদেরই একটা পছন্দ ছিল যে

ভারত অন্য কেউ শাসন করুক, হোক সেটা তুরস্ক অথবা পারস্য অথবা রাশিয়া অথবা খোদ ব্রিটিশরা।

ভারতে খোলাখুলি লুটতরাজ

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের এই বিজয় আসলে ইংরেজ পুঁজিপতিদের অর্থ উপার্জনের একটা মোক্ষম সুযোগ বলেই মনে করেন মার্ক্স। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল ওই সব পুঁজিপতির একটা যৌথ সংস্থা। মার্ক্সের মতানুসারে, ওই সব পুঁজিপতি ১৬৮৯ সালে ভারতে তাদের ঘাঁটি গেড়েছিলেন নিজেদের পকেট ভরার জন্য।[৮] ভারতের ওপর ইংরেজদের এই লুটতরাজ করার অস্ত্র ছিল খাজনা (ট্যাক্স) এবং মার্ক্স তাঁর ওই একই লেখায় বলেছেন যে এই খাজনাই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রাথমিক হাতিয়ার :

অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে ইংরেজদের ব্যবসায়িক কারণে যে পরিমাণ ভারতীয় সম্পদ তারা ইংল্যান্ডে নিয়েছে, সেই বিনিময়ে তারা ভারতে যা দিয়েছে, তা খুবই তুচ্ছ। কিন্তু তারা যে সম্পদ ইংল্যান্ডে নিয়ে গেছে, তা বিশাল ও হিসাবের অতীত।

এই সরাসরি লুটতরাজের অদম্য ইচ্ছাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তৎকালীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত খাজনা আদায়ের সার্বভৌম অধিকার অর্জনের পথে ধাবিত করেছিল। তা ছাড়া আরও বেশি বেশি খাজনা তোলার জন্য বিদ্যমান সম্পত্তির সম্পর্ককে এড়িয়ে নতুন একধরনের 'কৃষিবিপ্লব' ঘটিয়েছিল। এভাবেই জমিদারি ও রায়তদারি দুটোই ছিল আসলে সরকারের কোষাগার ভারী করার পাঁয়তারামাত্র। 'একধরনের অতি উৎসাহী ইংরেজ ভূস্বামী ছিলেন, যাঁরা ভূমির খাজনার ১০ ভাগের ১ ভাগ পেতেন, কিন্তু সরকারকে ঠিকই ৯ ভাগ দিয়ে দিতে হতো। আবার এমন অনেক অতি উৎসাহী ফরাসি রায়তদারও ছিলেন, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা ছিলেন কৃষক ও কোনো ধরনের নির্দিষ্ট উপাধি ছাড়াই সরকারকে খাজনা দিতেন এবং তাঁদের খাজনা বছর বছর উৎপাদিত শস্যের আনুপাতিক হারে পরিশোধ করতে হতো।'[৯]

মার্ক্স ১৮৫৮ সালে পত্রিকার একটা লেখায় জমিদারদের পদমর্যাদা নিয়ে তাঁর মতামত পাল্টান। তখন তিনি মত দেন যে আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলায় একশ্রেণির 'ভূস্বামী সম্প্রদায়' সৃষ্টি করা হয়েছিল। ব্রিটিশদের দ্বারা উদ্ভাবিত এসব ভূস্বামীকে 'সামাজিক অবকাঠামোর মূল স্তম্ভ' বলে মনে করা হতো। কিন্তু এসব ভূস্বামী বাস্তবে 'বিদ্যমান ইংরেজ সরকারের মতোই নির্বিরোধ কৃষকদের ওপর অনেক বড় মাপের অন্যায় ও অত্যাচারের খড়্গ নামিয়ে আনেন।'[১০] মার্ক্স এটাও স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে এই জমিদারেরা ছিলেন 'ব্যবসায়িক ফাটকাবাজ', যাঁরা তৎকালীন ভারতীয় জমিদারদের সরিয়ে জায়গা দখল করে 'একধরনের মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্প্রদায়' তৈরি করেছিলেন। এই মধ্যস্বত্বভোগীর দল পত্নীদার

নামেও পরিচিত ছিলেন, যাঁদের কাজই ছিল 'তাঁদের সব ভার দিয়ে গরিব কৃষকদের নিষ্পেষিত করা।'[১১]

ভারতীয় উপমহাদেশের এই লুটতরাজ শুধু খাজনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারাও বিভিন্নভাবে মানুষকে নিপীড়ন করে নিজেদের পকেট ফুলিয়েছিলেন। আঠারো শতকে জোরজবরদস্তি, ঘুষ ও একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে কোম্পানির অনেকেই নিজের আখের গুছিয়েছেন। মার্ক্স তাঁর একটা পত্রিকার লেখায় অবাক বিস্ময়ে প্রকাশ করেন যে, 'যখন নিজেদের দুর্নীতিকেও তাঁরা ডিঙিয়ে যান, তখন কি তাঁরা লর্ড ক্লাইভের মতো একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতকে নিয়ে আসেননি লুটতরাজ করার জন্য? যখন তাঁরা ইউরোপজুড়ে নিজেদের অলঙ্ঘনীয় জাতীয় ঋণের সাধুতার কথা বকবক করতেন, সেই সময়ই কি তাঁরা ভারতের রাজাদের নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ করা টাকা বাজেয়াপ্ত করেননি?'[১২]

মার্ক্স তাঁর *দাস ক্যাপিটাল*-এ লিখেছেন যে ১৭৫৭-৬৬ সালের মধ্যে ইংরেজরা ভারত থেকে প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ টাকার সমপরিমাণ উপঢৌকন নিয়েছিল। তিনি এটাও উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত ইংরেজরা একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে টাকার পাহাড় বানিয়েছিল। ভারত থেকে বের করে নেওয়া সম্পদের এই স্রোতকে মার্ক্স মনে করতেন শিল্প পুঁজিবাদীদের 'প্রারম্ভিক সঞ্চয়'।[১৩] ঠিক একইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোকে শুষে নিয়েছে। ১৮৪৮ সাল নাগাদ মার্ক্স তাঁর অন্য আরেকটি লেখায় যুক্তি দিয়েছেন যে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এতটাই বেপরোয়া ও বেসামাল হয়ে উঠেছিল যে কোম্পানি যেকোনোভাবেই তার আয় বাড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে 'মাত্র একটা মাধ্যমেই রাজস্ব আয় বাড়ানো যেতে পারে, আর তা হলো ভারতের স্থানীয় রাজা বা রাজকুমারদের হারিয়ে হলেও ইংরেজদের শাসিত অঞ্চলের আওতা বাড়ানো।[১৪] যদিও ভারতীয় রাজা বা রাজকুমারদের প্রতি মার্ক্সের কোনো রকমের সহানুভূতি ছিল না কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয় রাজাদের প্রতি যে আচরণ করত, মার্ক্স সেই আচরণকে ঘৃণা করতেন।[১৫]

এই পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় যে ইংল্যান্ড থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত মার্ক্সের যে উপলব্ধি, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে মার্ক্স তাঁর লেখা *পভার্টি অব ফিলোসফি* নামের বইয়ে উল্লেখ করেন যে ব্রিটিশ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ওপরের দিকে উঠছে শুধু ভারতীয় শ্রমিকদের ভয়ংকরভাবে কম বেতন দেওয়ার কারণে। কিন্তু মার্ক্স তাঁর এই অভিমত খুব শিগগির পরিবর্তন করেন।[১৬] ১৮৫৭ সালের একটা লেখায় তিনি বলেন, 'প্রতিটা ইংরেজ প্রজা কতটুকু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে বা লাভবান হচ্ছে, তা বিবেচনাযোগ্য।'[১৭]

একই লেখায় তিনি আরও উল্লেখ করেন :

> পদাতিক ও নৌবাহিনীর সৈন্যদের বেতন ইংল্যান্ডের মানুষের পকেট থেকে যেত, কারণ ভারতে কোম্পানির প্রশাসনিক অঞ্চল বৃদ্ধি পাওয়ায় খরচের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল। এর সঙ্গে আবার বার্মিজ, আফগান, চীন ও পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ যোগ করলে তার পরিমাণ এতটাই বেড়ে যাচ্ছিল যে আমার সন্দেহ হয়, আসলে ইংল্যান্ডের এত কিছু সামলানোর খরচ জোগানোর সামর্থ্য আছে কি না।
>
> মার্ক্স, প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশ শাসনামলের 'আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা' নিয়ে বসে ছিলেন না, বরং ইংরেজরা ভারত থেকে কী পরিমাণ সম্পদ পানির মতো বের করে নিয়ে গেছে, সেদিকেই আলোকপাত করছিলেন। এভাবেই তিনি তাঁর *দাস ক্যাপিটাল*-এর তৃতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন কীভাবে ইংরেজরা ভারতে কোনো রপ্তানি না করেই ১৮৮৫ সালে ২২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড ভারত থেকে নিয়ে হজম করে দিয়েছে।[১৮]

আবার ১৮৮১ সালে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> ইংরেজরা প্রতিবছর ভারত থেকে জমির খাজনা, স্থাপনার ভাড়া, হিন্দুদের কাছ থেকে রেলের লভ্যাংশ, পদাতিক বাহিনীর ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য পেনশন, আফগানিস্তান ও অন্যান্য যুদ্ধের খরচের জন্য যে পরিমাণ টাকা নিয়ে যায়, তা কম করে হলেও ছয় কোটি কৃষক ও কারখানার শ্রমিকের মিলিত বাৎসরিক বেতনের সমান। এটা ছিল একটা প্রতিশোধের আগুনমিশ্রিত একধরনের রক্তক্ষরণের প্রক্রিয়া। এর ফল হিসেবে প্রতিবছর লেগে থাকে অনন্ত দুর্ভিক্ষ, যা এখন পর্যন্ত ইউরোপের কোনো দেশ দেখেনি।[১৯]

ভারতের বহির্মুখী বাণিজ্যের রূপান্তর

ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের বহির্মুখী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে রূপান্তর এসেছিল, সে বিষয়েও মার্ক্স লিখে গেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার সমাপ্তির পর খুব অল্প সময়ে ভারতের বহির্মুখী বাণিজ্য তিন গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এবার বাণিজ্যের পুরো ধরনই পাল্টে যায়। এত দিন ভারত শুধু তার উৎপাদিত পণ্যই রপ্তানি করত, কিন্তু এবার সে আমদানি করা শুরু করল। মার্ক্স বলেন, 'যেই ভারত অতি প্রাচীন কাল থেকেই তুলা থেকে উৎপাদিত সুতার জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই ভারতই একসময় ইংরেজদের কৃত্রিম সুতায় সয়লাব হয়ে গেল।[২০] ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে কৃত্রিম সুতা ভারতে রপ্তানি করা হয়েছে, তার অনুপাত ১ থেকে বেড়ে ৫২০০ হয়েছে। ১৮২৪ সালে ব্রিটিশ মসলিন ভারতে ঢুকত প্রায় দশ লাখ গজ, কিন্তু ১৮৩৭ সালে সেই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৬ কোটি ৪০ লাখে।[২১]

মার্ক্স বিশ্বাস করেন, ইংরেজদের এই কৃত্রিম সুতার প্রসার ইংল্যান্ড ও ভারত উভয়ের জন্যই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্স দেখিয়েছিলেন যে ১৮৫০ সালে ব্রিটেন যে পরিমাণ কৃত্রিম সুতা ভারতে রপ্তানি করেছে, তা ওই বছরে ব্রিটেনের অন্য সব রপ্তানিকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এই রপ্তানি ছিল সারা বছরের রপ্তানির ৮ ভাগের ১ ভাগ। এর ফলে ইংল্যান্ডে ৮ ভাগের ১ ভাগ মানুষ সুতা উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত

থেকে উপার্জন করত এবং ইংল্যান্ডের মোট রাজস্বের ১২ ভাগের ১ ভাগ এই সুতা রপ্তানি থেকে আসত। ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলার মতো এই একটা কাজ করেছিল। সুতা উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে ভারতের কিছুটা হলেও আর্থিক উন্নয়ন হয়েছিল।[২২]

আগের বিদ্যমান গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ যে কৃষকেরা ইংল্যান্ডে তৈরি কাপড় কিনত তা নয়, তাদের কৃষি থেকে উৎপাদিত পণ্যগুলো আরও বেশি বাজারমুখী হয়ে পড়েছিল। যার ফলে আমদানিকৃত পণ্য কিনতে হলে কৃষককে তাঁর উদ্বৃত্ত অংশের থেকেও অনেক বেশি উৎপাদন করতে হতো।[২৩]

আঠারো শ সাতান্ন

মার্ক্স তাঁর *নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন*-এর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে স্থানীয় সৈনিকদের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভের কারণে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একসময় 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত জয় করেছিল। কিন্তু যখন ভূখণ্ড দখল করা হয়ে গেল, তখন ওই সেপাইদের দিয়ে পুলিশের কাজ করানো হচ্ছিল। মাত্র ২ লাখ সেপাই ও ৪০ হাজার ব্রিটিশ সেনা দিয়ে ২ কোটি ভারতীয়কে দমিয়ে রাখা হয়েছিল। যে ব্রিটিশ শাসকেরা একসময় বিশ্বাস করতেন যে সেপাইরাই হচ্ছে ভারতবর্ষে তাঁদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, সেই শাসকেরাই সময়ের আবর্তনে দেখলেন যে এই সেপাইরাই তাঁদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।[২৪]

যদিও বিদ্রোহ শুরু করেছিল সেপাইরা কিন্তু এই বিদ্রোহের পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল ভারতের সাধারণ মানুষ। তিনি এটাও বলেন যে ব্রিটিশরা যেভাবে এই বিদ্রোহকে সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ বলে চালাচ্ছিল, সেটা মিথ্যা ও অপপ্রচার ছাড়া কিছুই না। মার্ক্স এই বিদ্রোহ নিয়ে বলেন, 'এটা কোনো সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ ছিল না, বরং জাতীয় বিদ্রোহ ছিল।'[২৫] ভারতের অধিকাংশ মানুষ এই বিদ্রোহ সমর্থন করেছিল, বিশেষ করে গরিব কৃষকেরা। এই বিদ্রোহ হিন্দু, মুসলিম ও সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে, বিভিন্ন মতের মানুষকে একত্র করেছিল। মার্ক্স লিখেছেন যে :

প্রথমবারের মতো সেপাইরা তাদের ইউরোপিয়ান অফিসারদের হত্যা করেছিল। এই সময়ই মুসলমান ও হিন্দু একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যকার বিভেদ ভুলে তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। হিন্দুদের সঙ্গে শুরু হওয়া গন্ডগোল বাস্তবে দিল্লির মসনদে একজন মুসলিম সম্রাটকে বসিয়েছিল। সৈনিকদের এই বিদ্রোহ শুধু বিশেষ কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জাগতিকভাবেই ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে এটা ছিল জন-অসন্তোষের কারণ, যা পরবর্তী সময়ে পারস্য ও চৈনিক যুদ্ধে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল।[২৬]

মার্ক্স এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ফরাসি বিদ্রোহের সঙ্গে মিল রেখে ভারতের এই সিপাহি বিদ্রোহ কৃষকদের দিয়ে শুরু হয়নি। তিনি বলেছেন, 'ফরাসি বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কাটা অভিজাত সম্প্রদায়ের দিক থেকেই এসেছিল, কৃষকদের দিক থেকে নয়। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের সিপাহি বিদ্রোহ কৃষকদের ওপর রায়তদারদের অত্যাচার ও অনাচারের কারণে সংঘটিত হয়নি, বরং ইংরেজদের দ্বারা পালিত ও আদরে লালিত সেপাইদের দ্বারাই ঘটেছিল।'[২৭]

মার্ক্স এই সিপাহি বিদ্রোহে উচ্চশ্রেণির কৃষক, যেমন 'জায়গিরদার' ও 'ইনামদার'দের সম্পৃক্ততার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি ডিজরেইলির বক্তব্যের ওপর একটা বড় সমালোচনা লিখেছিলেন, যেখানে ডিজরেইলি দেখিয়েছেন যে শুধু রাজা বা রাজকুমারেরাই নয়, বরঞ্চ ইংরেজদের ওপর ওই রূপ উচ্চশ্রেণির কৃষকেরাও কীভাবে বিরক্ত ছিলেন।[২৮] অন্য আরেকটি লেখায় মার্ক্স বলেছিলেন কীভাবে 'তালুকদারেরা' ইংরেজদের ওপর ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।[২৯]

যদিও মার্ক্সের এই বিদ্রোহের প্রতি একধরনের সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে এই বিদ্রোহ আসলে প্রাচীন শ্রেণির বিদ্রোহ ছিল, যা জনসাধারণের দারিদ্র্যকরণের বিরুদ্ধে একধরনের সংগ্রাম। মার্ক্স যেভাবে আশা করেছিলেন যে এই বিদ্রোহ হয়তো ইংরেজদের ওপর ক্ষোভ থেকে উদ্‌গীরিত হয়েছে, কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়।

এই বিদ্রোহ বিফল হওয়ার যেসব কারণ মার্ক্সের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তার মধ্যে কোনো একক শক্তিশালী নেতার অভাব, একক সেনা কমান্ডের অভাব, অভিজ্ঞতার অভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভেদ, মতপার্থক্য, দুর্বল সেনাক্যাম্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবীরা সাহসের সঙ্গে বীরের মতোই লড়েছিলেন, কিন্তু ওই সব ভেতরকার দুর্বলতা একটি যৌক্তিক বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেয়।

পুনরুত্থান

মার্ক্স ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক খারাপ দিকগুলো, যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদের বেহাতকরণ, শিল্পব্যবস্থা বিকল করে দেওয়া, কৃষকদের ওপর জুলুম বা স্থানীয় শাসকদের অত্যাচারকে শুধু নেতিবাচকভাবেই দেখেননি। তিনি তাঁর একটা লেখায় বলেছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের কিছু ভালো দিকও আছে, কিছু উপার্জনও আছে। নিচে ব্রিটিশ শাসনের দ্বৈতনীতির ওপরে মার্ক্সের অভিমত উল্লেখ করা হলো :

ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের একটা দ্বৈত লক্ষ্য পূরণ করার দরকার ছিল, একটা ছিল ধ্বংসাত্মক অন্যটা ছিল পুনরুজ্জীবিত করা। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারত উপমহাদেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এশীয় সমাজটাকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং পশ্চিমা

ধাঁচের সমাজের গোড়াপত্তন করা। আরব, তুর্কি ও মোগল—যারাই এসেছিল, কালের বিবর্তনে সবাই 'হিন্দু-আয়ন'-এর কবলে পড়েছিল বা 'হিন্দুধর্মে' রূপান্তরিত হয়েছিল। শুধু ব্রিটিশরাই ছিল একমাত্র উৎকৃষ্ট জাতি, যাদের জন্য 'হিন্দুধর্মে' প্রবেশ করা রীতিমতো অসম্ভব ছিল। তারা এই ভিত ভেঙে দিয়েছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে, স্থানীয় শিল্পকে মূলোৎপাটন করে, সমাজে যা কিছু উচ্চে ছিল, তা ধূলিসাৎ করে। এই ধ্বংসের ইতিহাসের বাইরে ইংরেজদের আর কোনো ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশে নেই। ধ্বংসস্তূপের ফাঁকফোকর গলে পুনরুজ্জীবন আসলে কদাচিৎই হয়েছে। তারপরও এটা শুরু তো হয়েছে।[৩০]

এই পুনরুজ্জীবনের প্রথম শর্ত ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক একাত্মতা। মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ব্রিটিশ তরবারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একতা এখন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী হবে।' দ্বিতীয়ত, বাষ্প ইঞ্জিন ভারতে যোগাযোগের ক্ষেত্র আরও এগিয়ে নিয়েছে। মার্ক্স এটাও বিশ্বাস করতেন যে সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন স্টিম জাহাজ ও রেল ভারতকে ইংল্যান্ডের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে এবং একসময়ের প্রকাণ্ড ভারত ইংল্যান্ডের একটা অঙ্গরাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তৃতীয়ত, একটা উৎপাদনমূলক দেশ মিলমালিকদের অধীনে চলে যাবে। এ জন্য তারা সেচ ও রেলপথের উন্নয়ন করেছিল। মার্ক্স আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছেন যে ভারতের রেলপথ তার শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। আধুনিক শিল্পায়ন শ্রমের বংশপরম্পরাকে ভেঙে দিয়ে অগ্রগতি এনেছিল। ঔপনিবেশিক আমলের পুনরুজ্জীবনের অন্যান্য দিকের মধ্যে স্থানীয় একটা সেনাবাহিনী তৈরি করা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, রায়তদার ও জমিদারদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আইন প্রণয়ন করা অন্যতম।

মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে এই সবকিছুই ছিল পশ্চিমা সমাজের গোড়াপত্তনের জন্য ইংরেজদের লক্ষ্যপূরণের ও ঔপনিবেশিক ইতিহাসের গঠনমূলক দিক। পৃথিবী যেমন ভৌগোলিক পরিবর্তনের জন্য অন্ধভাবে তার ভূমির বিপ্লব ঘটায়, তেমনি ব্রিটিশদের এসব বস্তুগত গঠনমূলক দিকও ছিল সাম্রাজ্য বাড়ানোর অন্ধ লক্ষ্য।

কিন্তু একই সময়ে মার্ক্স এটাও বলেছেন যে যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে একটা আধুনিক সমাজ স্থাপনের লক্ষ্যে বস্তুগত শর্তাবলি সৃষ্টি করা হচ্ছে, কিন্তু সমাজ সম্প্রসারণের এই প্রক্রিয়া ব্রিটিশ শাসনের সময়সীমার মধ্যে শেষ হবে না।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা সমাজের সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বাধ্য হতে পারে বটে কিন্তু তাদের মুক্তির ইচ্ছা বা বস্তুগত সংস্কার নির্ভর করে উৎপাদনমূলক শক্তির ওপর। ভারতীয়রা সমাজের এই নতুন উপাদানের ফল, যা ব্রিটিশরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতের বঞ্চিত ও শোষিত শ্রমিকেরা অথবা হিন্দুরা এই বুর্জোয়াদের

আধিপত্য বা ইংরেজ গোলামির জোয়াল পুরোপুরিভাবে উপড়ে ফেলে।

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসনের প্রভাবের বিষয়ে মার্ক্সের ধারণা তাঁর শেষজীবনে উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি মার্ক্সের ১৮৫৩ সালের মন্তব্যের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে বলা যায় যে মার্ক্স ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রগতিশীল হিসেবেই দেখেছিলেন। যদিও মার্ক্স এই উপমহাদেশের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য, অবিবেচকের মতো ভারতীয়দের সম্পদ লুটতরাজ করার জন্য এবং এ দেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থনীতি থেকে জোঁকের মতো চুষে নিজের পকেট ফোলানোর জন্য ইংরেজদের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এটাও দেখাতে চেয়েছিলেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে কোনো সমাজের আধুনিকায়নের বিপ্লবের গভীর বীজ নিহিত থাকে। স্বায়ত্তশাসিত সমাজব্যবস্থার যে ডাক, তা উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত ছিল, যা শুধু ইংরেজরাই জাগিয়েছিল। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনের খারাপ বা নেতিবাচক যত দিকই থাকুক না কেন, এটাকে এই উপমহাদেশের প্রগতিশীল পর্যায় হিসেবে দেখা জরুরি।

'প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম' অনুযায়ী যখন কোনো উৎকৃষ্ট জাতি অন্য কোনো পিছিয়ে পড়া জাতিকে আক্রমণ করে, তখন পিছিয়ে পড়া জাতিটি উৎকৃষ্ট জাতির সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু আরব থেকে শুরু করে মোগল পর্যন্ত যারাই এসেছে, তারা হিন্দুদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে যতই এগিয়ে থাকুক, শেষ পর্যন্ত সবাই হিন্দুতেই পরিণত হয়েছে। এর কারণ, সৈন্যসামন্তর দিক থেকে হিন্দুরা অনেকের থেকে পিছিয়ে থাকলেও অন্যান্য অনেক দিক থেকেই হিন্দুরা উৎকৃষ্ট ছিল। এদিকে ব্রিটিশরা হিন্দুদের থেকে সেনা ও উৎপাদনের দিক থেকে অনেক এগিয়ে থাকায় তারা ভারতীয়দের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পেরেছিল।

মার্ক্সের মনোভাবে পরিবর্তন

ব্রিটিশ শাসনের ওপর মার্ক্সের মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞজনদের মধ্যে মতের ভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে মার্ক্স সত্যিকারেই ঔপনিবেশিক শাসনকে আধুনিকায়নের একটা উৎস হিসেবে দেখেছেন, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে এটা হয়তো বাস্তব দিক থেকে মার্ক্সের একটা বিবেচনা ছিল। বেশ কয়েক ধরনের বিবেচ্য বিষয় আছে ঔপনিবেশিকতা নিয়ে। সেগুলোর কিছু কিছু আবার নেতিবাচকও বটে, যেমন 'পরিপক্ব' মার্ক্স ঔপনিবেশিকতাকে প্রগতিশীল হিসেবে দেখেননি। এ ব্যাপারে আলোচনায় যাওয়ার আগে মেলত্তির মতামত জেনে নেওয়া যাক :

মেলত্তির ব্যাখ্যা অনুযায়ী মার্ক্সের সামাজিক বিপ্লবের বা পরিবর্তনের সূত্র নিহিত ছিল সমাজতন্ত্রবাদের পূর্বশর্ত হিসেবে। কিন্তু এটাও প্রমাণিত যে মার্ক্সের জীবনের

একটা বিশেষ সময়ে এই রকম ধারণা তাঁর মধ্যে বলবৎ ছিল। পরবর্তী সময়ে বিশদ আকারে আলোচনায় গেলে দেখা যায় যে গ্রামীণ সমাজের সেই প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যে সমাজতন্ত্রের সূত্র লুকিয়ে ছিল, যা পুঁজিবাদের একটা পূর্ববর্তী পর্যায়।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্স ঔপনিবেশিক শাসনের গঠনমূলক দিকটা একবার শুধু জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি ঠিকই বলেছিলেন, যদিও ইংল্যান্ড হিন্দুস্তানে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে, অন্যদিকে প্রাচীন সমাজটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই সূত্র ধরে বলা যায় যে মার্ক্স ঔপনিবেশিক শাসনকে শুধু গঠনমূলক হিসেবেই দেখতে চাইতেন, কিন্তু আদতে তা হওয়ার ছিল না।

তৃতীয়ত, ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকে মার্ক্স যেভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে এটি ছিল একতা 'পুনরুজ্জীবন', সেটি সে রকম ছিল না। এই যুক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে মার্ক্স যেহেতু বিশ্বাস করতেন ঔপনিবেশিক শাসন সমাজে প্রগতি নিয়ে আসে, তাহলে সেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সিপাহি বিদ্রোহকে তিনি সমর্থন দিতেন না।

চতুর্থত, মারিয়ান সাওয়ারের মতে, গ্রামীণ ব্যবস্থা মার্ক্সের মনে দুটো সাংঘর্ষিক ধারণার জন্ম দেয়। একদিকে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা অনড় ও প্রাচ্যের স্থবিরতার মূল কারণ। অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থার অন্তরায় ছিল এই গ্রামীণ ব্যবস্থা।

উপসংহারে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনের আওতায় ভারতে ইংরেজ বুর্জোয়ারা পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন করবেন, এই ধারণা নিয়ে মার্ক্সের মন্তব্য শুরু হলেও পরে তা পাল্টে যায়। পরে তিনি এই শাসনকেই বলেন প্রগতিশীল একটা বিপ্লব, যা সমাজকে ভালোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবেই শুরুতে তিনি যদিও এই ঔপনিবেশিক শাসনকে ইংরেজদের ন্যক্কারজনক অ্যাজেন্ডা হিসেবে দেখেছিলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-ও বললেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিবাচক উন্নয়নের জন্য এই শাসন প্রয়োজনীয় ছিল। তাই এ কথাই বলা যায় যে মার্ক্সের প্রাথমিক কথায় তিনি যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা পরিবর্তনও করেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. ভারতের ওপর কার্ল মার্ক্সের লেখাগুলো বহুবার বহু ভাষায় পুনঃমুদ্রণ হয়েছে। এখানে ইনস্টিটিউট অব মার্ক্সিজিম-লেনিনিজম থেকে প্রকাশিত সমগ্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সূত্র : Marx and Engles, *The First Indian War of Independence 1857-1859* (Moscow: Progress Publishers, 1978)

২. Marx's Article, "The British Rule in India," *NYDT*, 25 June 1853

৩. Cited by Irfan Habib, "Marx's Perception of India" paper presented at International Congress, Trier, March 1983

৪. Cited by Daniel Throner, "Marx on India and the Asiatic Mode of

Production." *Contribution to Indian Sociology*, Vol. IX (December, 1966).

৫. Marx's article in *NYDT*, 1853

৬. For details see Perry Anderson, *Lineage of the Absolutist State* (Norfolk: Lowe and Brydone Printers Ltd, Verso Edition 1979), pp. 477- 481

৭. Marx's article, "The Future Results of the British Rule in India", *NYDT*, 8 August 1853.

৮. Marx's article, "The East India Company - Its History and Results," *NYDT*, 11 July 1853

৯. Marx's article in *NYDT* published on 5 August 1853 and cited by Habib, op.cit., This article has not been included in the Russian Compilation mentioned earlier.

১০. Marx's article , "Lord Canning's Proclamation and Land Tenure in India", *NYDT*, 7 June 1858

১১. Cited by Habib, op.cit.

১২. Marx's article in *NYDT* published on 8 August 1853.

১৩. Capital, Vol. 1. p. 777.

১৪. Marx's article, "The Indian Question", *NYDT*, 14 August, 1857.

১৫. Marx's article, "The Annexation of Oudh", *NYDT*, 28 May 1853.

১৬. Cited by S. Avineri, *The Social and Political Thought of Karl Marx*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), p. 168.

১৭. Marx's article, "British Incomes in India", *NYDT*, 21 September 1857.

১৮. Capital III, p. 569-70. cited by Habib.

১৯. Letter to F. Danielson, 19 February 1881: emphasis as by Marx, cited by Habib.

২০. Marx's article in *NYDT*, 11 July 1853.

২১. Marx's article in *NYDT*, 25 July 1853.

২২. Marx's article in *NYDT*, 11 July 1853.

২৩. For details see Habib, op. cit.

২৪. Marx's article, "Despatches From India", *NYDT*, 14 August 1857.

২৫. Marx's article in *NYDT*, 14 August 1857.

২৬. Marx's article in *NYDT*, 15 July 1857.

২৭. Marx's article, "The Indian Revolt", *NYDT*, 16 September 1857.

২৮. Marx's article in *NYDT*, 14 August 1857.

২৯. Marx's article , "Lord Canning's Proclamation and Land Tenure in India", *NYDT*, 7 June 1858.

৩০. Marx's article in *NYDT*, published on 8August 1853. All the citations in this section are from this article.



বর্তমান পৃথিবীতে মার্ক্সবাদের প্রাসঙ্গিকতা

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

সারসংক্ষেপ

২০১৮ সালের ৫ মে দুনিয়াব্যাপী পালিত হলো কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-১৮৮৩) দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কালে মার্ক্সবাদ বিশ্বব্যাপী যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর সেই প্রভাব অনেকটাই স্তিমিত। গণচীন যে মার্ক্সবাদী ব্যাকরণ মেনে চলে, তাকে অনেকেই মার্ক্সবাদ বলে স্বীকার করতে আপত্তি জানান। ফলে অনেকের মতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্ক্সবাদ বহুলাংশেই যবনিকার অপর প্রান্তে আত্মগোপন করেছে। এমন এক সময়ে, মার্ক্সবাদ কি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য আগের মত প্রাসঙ্গিক? শুধু পুঁজিবাদের সুরতহাল করার বাইরে কি মার্ক্সবাদ আর ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে না? দর্শনশাস্ত্রের নব পঠন-পাঠনে কি মার্ক্সবাদ তার আবেদন হারিয়েছে? মূলত মার্ক্সের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বের বড় বড় মার্ক্সবাদী, অমার্ক্সবাদী ও মার্ক্স-বোদ্ধাদের (Marxologist) আলোচনায় এই প্রশ্নগুলোই ঘুরেফিরে আসছিল। সেই সূত্র ধরেই বক্ষ্যমাণ লেখাটি আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের দর্শনের সূতিকাগার জার্মান দেশসহ অন্য পশ্চিমা দেশগুলোতে এই শতাব্দীতে মার্ক্সের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যে অনেক সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক মুখ খুলেছেন, তাঁদের মতামত ও চিন্তার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এই লেখায় এই নতুন শতাব্দীতে মার্ক্সের তত্ত্বের কার্যোপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের পথচলায় মার্ক্সবাদ কি আজও নতুন দিশার নির্দেশ দেয় কি না, তার পর্যালোচনাই বর্তমান লেখাটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এখানে সেই সব তথ্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মূল জার্মান থেকে ইংরেজি বা বাংলায় আগে অনূদিত হয়নি। পাশাপাশি ইংরেজিভাষী তাত্ত্বিকদের বয়ানও হাজির করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

স্থিতিশীল উৎপাদন পদ্ধতি, হেগেলের মানবমুক্তির সাথে নৈতিক সমাজ ও যৌক্তিক সত্যের ধারণা, উৎপাদন-মোহবদ্ধতা, বুর্জোয়া সমাজ, প্রলেতারিয়েত, মানবপ্রকৃতি,

শ্রেণিসংগ্রাম, সমবায়ী সম্পদ, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ, উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

১.

Hegel bemerkte irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.

হেগেল কোথাও মন্তব্য করেছিলেন যে, পৃথিবীর সব বড় ঘটনা ও ব্যক্তির দুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তিনি এর সঙ্গে যোগ করতে ভুলে গিয়েছিলেন তা একবার ঘটে শোকগাথা আকারে, আর আরেকবার ঘটে প্রহসন আকারে। (কার্ল মার্ক্স, লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমের)

মার্ক্স গত হয়েছেন ১৩৫ বছর হলো। জীবদ্দশায় মার্ক্স তাঁর মতবাদের সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিকাশ যেসব ইউরোপীয় রাষ্ট্রে ঘটবে, সেখানেই কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। সেই অর্থে মার্ক্স ইংল্যান্ডে প্রথম কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে বলে ভেবেছিলেন। কার্যত তা হয়নি। এই ইংল্যান্ডেই ১৮৮৩ সালে মার্ক্স মারা যান এবং তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে লন্ডনের মাটিতেই। মার্ক্স যখন মারা যান, তখন ভ্লাদিমির লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) বয়স মাত্র ১৩ বছর। এর বহু পরে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক আন্দোলন হয়। একটি প্রায় কৃষিভিত্তিক ও সামন্তবাদী সমাজে মার্ক্সীয় আদর্শের গোড়াপত্তন ঘটবে—তা মার্ক্স ও তাঁর বন্ধু ফ্রেডরিখ অ্যাঙ্গেলসের জন্য ছিল অচিন্তনীয়। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, 'Truth is stranger than fiction'। বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা-ই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। যদিও ১৯৮৯ সালের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রথম ও সবচেয়ে শক্তিশালী মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রের পতন ঘটে। এ ক্ষেত্রে লেনিনবাদী বিশ্লেষণ সোভিয়েত যুগে রাশিয়াকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল কি না, কিংবা সোভিয়েত সমাজবাদী কেন্দ্র সঠিক মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল কি না, তার ইতিবৃত্ত ঘাঁটার উদ্দেশ্য এই লেখা নয়। বর্তমানে পশ্চিমা দুনিয়ার মার্ক্সবাদী, অমার্ক্সবাদী ও মার্ক্স-বোদ্ধারা মার্ক্সবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছেন, তা-ই এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য।

২.

মার্ক্সের জন্মভূমি জার্মান দেশের অন্যতম শীর্ষ দার্শনিক অধ্যাপক আন্দ্রিয়াস আর্ন্ট (Andreas Arndt)। বার্লিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক তিনি। তিনি পুরোদস্তুর মার্ক্সবাদী নন, তবে মার্ক্সবিশারদ (Marxologist)। তাঁর

মতে, চিন্তার জগতেই মার্ক্সবাদীরা অনেক ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের ভুল ব্যাখ্যা লালন করছেন। তিনি মনে করেন, মার্ক্সবাদীরা যেভাবে মার্ক্সকে এক বিপ্লব সংঘটনের রন্ধন বইয়ের (Rezeptbuch) লেখক মনে করেন, যার মাধ্যমে সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা যাবে, মার্ক্স আসলে তা না হয়ে বরং জগৎজুড়ে একটি স্থিতিশীল উৎপাদনপদ্ধতির (eine global etablierende Produktionsweise) প্রতিষ্ঠার দিকেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় প্রকল্পের প্রথম প্রশ্নটি ছিল, কীভাবে সমাজব্যবস্থা স্থিতিশীল হতে পারে? তা কি আদৌ স্থিতিশীল হওয়ার মতো? (Wie stabilisiert sich das System? Kann es sich überhaupt stabilisieren?) মার্ক্স নিজেই তার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন যে আদতে সমাজব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে স্থিতিশীল হওয়ার নয়। তিনি এর কারণ হিসেবে অর্থবাজারে (der Finanzmarkt) ক্রমাগত পুঁজির চাহিদার ব্যাপকতা লক্ষ করেছেন।

আন্দ্রিয়াস আর্ন্টকে প্রশ্ন করা হয়েছে, মার্ক্সবাদ নৈতিকতাকে কী পর্যায়ে আত্মস্থ করে? আর্ন্ট মনে করিয়ে দেন, মার্ক্সবাদের নৈতিকতা বুঝতে গেলে প্রথমে হেগেলীয় দর্শনকে বুঝতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, তরুণ বয়সে হেগেলকে বুঝতে গিয়েই মার্ক্সের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আসক্তি এবং মার্ক্স যৌবনে নয়া হেগেলবাদী (Junghegelianer) হিসেবেই নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটান। পরে মার্ক্স অনেক ক্ষেত্রে হেগেলের বিরোধিতা করলেও সারা জীবন তাঁর দর্শনচর্চায় হেগেলের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। হেগেল সারা জীবনই মার্ক্সের শিক্ষক ও গুরু ছিলেন। তাই হেগেলের মতো মার্ক্সও ভাবতেন এক স্বাধীনতার আখ্যানকে (eine Freiheitsgeschichte)। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য উপযুক্ত এবং কর্মক্ষেত্রে মানুষকে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন মেটাবে এমন সমাজের ধারণা হেগেলের, যেখানে মানুষ এসব ক্ষেত্রে অপরের দ্বারস্থ হবে না। আর এভাবে মানুষ তৈরি করবে এক 'নৈতিক সমাজ' (sittliches Gemeinwesen)। মার্ক্স মূলত নৈতিকতার এই চিন্তা দ্বারা পরিপ্লুত ছিলেন।

আর্ন্ট বলেন, অনেকে মনে করেন মার্ক্স ভবিষ্যতের বিশ্বায়ন (Globalisierning) সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লালন করেননি, যেটা মার্ক্স সম্পর্কে একেবারেই ভুল ধারণা। মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে পুঁজিমাত্রই সস্তা শ্রমবাজার খুঁজবে এবং তা পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন। আর এভাবে তা বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করবে। একই সঙ্গে সস্তা শ্রমের প্রশ্নে আউটসোর্সিংয়ের (Outsourcing) বিষয়ও মার্ক্সের বয়ানে অবধারিতভাবে সংশ্লিষ্ট। অনেকে মনে করেন, মার্ক্সের মধ্যে একধরনের উৎপাদন-মোহাবদ্ধতা (Produktivitäts-Fetischismus) কাজ করত, যে কারণে পণ্যের সফল সরবরাহ এবং সমাজের

মধ্যে তার সুষম বণ্টনেই মার্ক্স মানবমুক্তির দিশা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, মার্ক্স অনেক আলোচনাতেই বাস্তুসংস্থানের প্রেক্ষাপট (Ökologische Perspektive) নিয়ে কথা বলেছেন। আন্দ্রিয়াস আর্ন্ট মার্ক্সবাদের তত্ত্বগত আলোচনায় বলেছেন, মার্ক্স রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক কোনো তত্ত্বের বয়ান দেননি; বরং রাষ্ট্রকে নাকচ করে দেওয়ার বয়ান হাজির করে মার্ক্স অনেকের মতে নিহিলিস্ট (Nihilist) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আর্ন্ট আরও বলেন, অনেকে মনে করেন বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সবাদের মৃত্যু ঘটেছে। বিষয়টি তা নয়, বরং সমস্যা ছিল জার্মানদের মধ্যে। পূর্ব জার্মানিতে যেভাবে মার্ক্সকে হাজির করা হয়েছে, তা ছিল পশ্চিম জার্মানিতে উপস্থাপিত মার্ক্সের চেয়ে ভিন্ন। বর্তমানে সংঘটিত বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে যেসব নতুন প্রজন্ম মার্ক্স থেকে বিযুক্ত, তারা মার্ক্সকে জানতে চায় এবং মার্ক্সবাদকে জানতে তাদের যথেষ্ট আগ্রহও আছে। ফলে এখন প্রশ্ন উঠছে, আজকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (Finanzkrise) মোকাবিলায় মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ কার্যকর কি না।

তবে আন্দ্রিয়াস আর্ন্ট স্বীকার করেছেন, রাজনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সের বিক্ষিপ্ত আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই মার্ক্সীয় রাজনৈতিক ব্যাকরণ বুঝতে সমস্যা করে, যার ফলে মা-ও সেতুং বা স্টালিনের মতো চরিত্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে, যাদের সঙ্গে মার্ক্সবাদী তত্ত্ব নিয়ে মতদ্বন্দ্বের বা মতবৈরিতার সম্ভাবনার সৃষ্টি হতেই পারে। শীতল যুদ্ধের (Der Kalte krieg) পর এখন সময় হয়েছে আদর্শবাদী জায়গায় না দাঁড়িয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে মার্ক্সীয় তত্ত্বের পর্যালোচনার, তার মধ্যে কী আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে তা জানার। এখানে একটি সত্য বোঝা খুব জরুরি যে মার্ক্স তত্ত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো গোঁড়া মতবাদ সৃষ্টির (Dogmatisierung) তাগিদ মনে করেননি। মার্ক্স ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক।

আর্ন্ট কিছু চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন মার্ক্সীয় সাহিত্য সম্পর্কে। তিনি বলেন, মার্ক্সীয় সাহিত্য বলে যেসব বই প্রচলিত, তার বেশ কিছু নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। এই অনুমান বা সন্দেহ পুরোপুরি অমূলক নয়। যেমন *দাস ক্যাপিটাল* (Das Kapital) দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড মূলত অ্যাঙ্গেলসের সম্পাদকীয় লেখালেখির ভিত্তিতে রচিত। *দাস ক্যাপিটাল*-এর মূল খসড়া ছিল মূলত মার্ক্সের অসমাপ্ত ও পরীক্ষামূলক লেখায় (unfertige and experimentelle Schhriften) পূর্ণ। আন্দ্রিয়াস আর্ন্ট আরও জানান, মার্ক্স একটি প্রগতিশীল সমাজ গঠনে (progressive Gesllschaftsformation) আগ্রহী ছিলেন, তিনি ইতিহাসের সহজাত বিকাশে (der natürliche Gang der Geschichte) আগ্রহী ছিলেন না। তাই *দাস ক্যাপিটাল*-এর দ্বিতীয় মুদ্রণে মার্ক্স মূলত এক

নেতিবাচক দ্বান্দ্বিকতাকে (Negative Dialektik) তুলে ধরেছেন। মনে রাখতে হবে, মার্ক্স ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। মার্ক্সীয় দর্শনের ব্যাখ্যা বোঝার ক্ষেত্রে অধ্যাপক আর্ন্ট হেগেলের চিন্তার প্রতি ইঙ্গিত দেন। কারণ মার্ক্স জীবনের শেষ পর্যন্ত নানাভাবে হেগেলীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হেগেল যাথার্থ্য (Wirklichkeit) এবং সত্যের (Reälitat) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তার অস্তিত্বের (Existnz) ধারণা নেহাত সত্য (Bloße Reälitat) শুধু নয়; বরং তিনি এক যৌক্তিক সত্যের (vernunftige Realität) ধারণা দিয়েছেন, আর এই যৌক্তিক সত্যই তাঁর কাছে যাথার্থ্য (Wirklichkeit)। তার মানে হচ্ছে অস্তিত্বশীল কোনো কিছু থাকা মানেই তা যৌক্তিক সব সময় নয়। ফলে কমিউনিস্ট দলগুলো বয়ানে বলে যে দল সব সময়ই ঠিক (die Partei hat immer Recht), হেগেলীয় মতে, এই বয়ান ধোপে টেকে না। অথচ ওই বয়ানকে কেন্দ্র করেই মার্ক্সবাদী দেশগুলোতে একসময় দলীয় উর্ধ্বতন নেতারা স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছেন। হেগেলীয় বাস্তবতায় যৌক্তিক সত্য (vernünftige Reälitat) মানে শুধু কর্তৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটানো নয়।

৩.

অধ্যাপক ড. মিকায়েল নিয়ার (Prof Dr Micheal Nier) প্রথিতযশা মার্ক্সবাদী জার্মান বুদ্ধিজীবী। তিনি জানালেন জার্মান দেশে মার্ক্সবাদীদের দূর্দশার কথা। তাঁর ভাষ্যমতে, ৩ অক্টোবর ১৯৯০-এর পরে জার্মান দেশে কোনো মার্ক্সবাদীকে অধ্যাপক পদে উন্নীত করা হয়নি। পশ্চিম জার্মানিতে এক দশক ধরে মার্ক্সবাদী কাউকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পূর্ব জার্মানিতে মার্ক্সবাদী অধ্যাপকদের পদচ্যুত ও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। জার্মান দেশে আর মার্ক্সবাদ পড়ানো হয় না। আগে যেমন অনেক ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশন ছিল—যেমন রোজা-লুক্সেমবার্গ ফাউন্ডেশন (Rosa-Luxemburg-Shiftung), সেগুলোর বিলোপসাধন করা হয়েছে। যেসব বামপন্থী দল আছে, সেগুলোও মার্ক্সবিরোধী দল (antimarxistische Partei)। ফলে দেশে যদিও মার্ক্সবাদী আছেন, কিন্তু তাঁদের বলার কিছু নেই। তাঁরা সমাজের প্রান্তে বসবাস করেন এবং প্রত্যক্ষ করছেন কীভাবে এই দেশ চিরাচরিত পুঁজিবাদের ধারায় (auf typische kapitalistische Weise) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মার্ক্সবাদীরা এ দেশে পুরোদস্তর ক্ষমতাহীন। কেউ যদি বলেন যে তিনি মার্ক্সবাদী, তাহলে লোক এমনভাবে তাকাবে, যেন তিনি আকাশের কোনো তারকা থেকে উদিত হয়েছেন কিংবা তিনি কোনো খুব খারাপ ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত। সমাজে অনেকে আছেন যাঁরা চান না সবাই সমাজ ও রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠুক। তাঁরা মার্ক্সের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

মার্ক্সবাদ চর্চা জার্মান দেশে এখন পাগলামির কিংবা অহেতুক গরিমার নামান্তর। অধ্যাপক নিয়ার বলছেন, তারপরও বলতে হবে সময় এবং পরিস্থিতি বিচারের ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতায় মার্ক্সীয় পদ্ধতির (marxistische Methode) কোনো বিকল্প নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, যাঁরা সমাজকে ভালোমতো বিশ্লেষণ করতে চান, তাঁরাও সমাজে বিধিবদ্ধ মার্ক্সবিরোধী পক্ষপাতদূষণ দ্বারা পরিপ্লুত। অনেক সময় অধ্যাপক নিয়ার লোকজনকে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাঁরা মার্ক্সের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর সেগুলো পছন্দ করলেও, আর কোনো লেখা পড়তে তাঁরা দ্বিধা করেন। সমাজে মার্ক্সবাদবিরোধী প্রভাব এতটাই তীব্র। তবে মার্ক্সের গরিমা তাঁরা ব্যবহার করতে ছাড়েননি। চেমনিৎস (Chemnitz) শহরে, যেখানে মার্ক্স অল্প কিছু দিন ছিলেন এবং কমিউনিজমের জমানায় পূর্ব জার্মানিতে যেটিকে কার্ল মার্ক্স শহর (Karl Marx Stadt) নামকরণ করা হয়েছিল, সেখানে ১ লাখ ২০ হাজার ইউরো ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে মার্ক্সের মাথার মূর্তি। অথচ সেখানে অনেক অবহেলিত দরিদ্র ক্ষুধার্ত শিশু রয়েছে। অন্যদিকে সেখানে ১ লাখ ইউরোর অভাবে পতিত জমি (Brachlandschalf) কর্ষণ করা যাচ্ছে না, যা করতে পারলে ওই অঞ্চলের দারিদ্র্য কমানো যেত।

অনেকে মার্ক্সকে দৈবপুরুষ বানানোর চেষ্টা করে থাকেন, যা হাস্যকর। অধ্যাপক নিয়ার মার্ক্সের উৎপত্তির কিছু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর জোর দেন। তিনি মনে করেন, মার্ক্সের চিন্তার জগৎ বিকশিত হয়েছে ইউরোপের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের কারণে। সামন্ত সমাজ ভেঙে বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা জার্মান দেশে প্রকট হয়েছে, ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও সমাজবিজ্ঞানের গতিবেগ প্রকৃতির বিবর্তনের (Entwicklung der Natur) ধারণাকে ধর্মাশ্রিত চিন্তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তৎকালীন বুর্জোয়া সমাজ (das Bürgertum)। হেগেলের মানবমনের বিকাশের (Entwicklung des menchlichen Geistes) বয়ান সমাজের পরিগঠনে কী ভূমিকা রাখে?—এই জিজ্ঞাসা জার্মান দেশের দর্শনচর্চার গতিপথকে নব জোয়ারে প্লাবিত করে। শিক্ষিত বুর্জোয়া সমাজের (die gebildete Bourgeoisie) আবির্ভাবের কারণে তা হয়ে ওঠে পুঁজিবাদ অর্থনীতি বোঝার প্রধান নিয়ামক। আবার অর্থবিজ্ঞানের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের কারণে বিত্তশালী শ্রেণির বিপরীতে এক বিত্তহীন সমাজের (eine klassenlose Gesellschaft) ধারণাও তখন দৃশ্যপটে চলে আসে, যাকে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে প্রলেতারিয়েত (das Proletariat) বলে। এই সামাজিক প্রেক্ষাপট ও চিন্তাগুলো মার্ক্সের চিন্তার পরিগঠনে ভূমিকা রেখেছে। ফলে প্রথমত মার্ক্স তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করেছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রলেতারীয় উদার নৈতিকতার (der proletarische

Liberalismus) আকারে; যা অনিবার্যভাবেই পরে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা অর্জনের লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। ফলে পুঁজিবাদী সম্পদ খারিজ করার (Aufhebung des Kapitalistischen Eigentums) ধারণা ওই সূত্র ধরেই হাজির হয়েছে।

মার্ক্সবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দরকার প্রতি নতুন জমানায় মার্ক্সীয় তত্ত্বকে যুগোপযোগী করার। সমস্যা হয় মার্ক্সবাদকে নতুন আঙ্গিকে হাজির করলে তাকে শোধনবাদ (der Revisiomismus) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এভাবে ১৯৬৮ সালের পেটিবুর্জোয়া আন্দোলন (der Kleinbürgerliche Liberalismus) নিজেদের মার্ক্সবাদী দাবি করলেও তার ব্যাখ্যা নিয়ে অনেকের মতবিরোধ আছে। আর মার্ক্সীয় তত্ত্বের বয়ান নিয়েও দ্বন্দ্ব মার্ক্সের জীবদ্দশা থেকেই শুরু হয়। তরুণ হেগেলীয়, গণতন্ত্রী এবং বয়সে নবীন মার্ক্স কি ধর্তব্য, যাঁর লেখাকে আমরা বলি প্রথম দিকের লেখা (frühe Schriften), নাকি মার্ক্সের পরিণত বয়সের বয়ানকে আমরা গ্রহণ করব?

যাঁরা মার্ক্সবিরোধী তাঁরা বলেন, মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলস তাঁদের সময়েই বৃত্তাবদ্ধ ছিলেন এবং কোনোভাবেই বড় উল্লম্ফন তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি, যে কারণে *পুঁজি* (das Kapital) গ্রন্থে বহু ক্ষেত্রেই ভুল তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত (falsche Schlußfolgerung) ছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলস একটি যুগের সূচনা করেছেন এবং আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। পুঁজিবাদকে ব্যাখ্যা করার এমন বিজ্ঞানভিত্তিক মাপকাঠি এর আগে তৈরি হয়নি। ইতিহাসকে বিজ্ঞানের আলোকে অধীত বিশ্ববীক্ষণের (die Weltanscahuung) দ্বারা পর্যবেক্ষণের এমন ধারণা পৃথিবীতে ছিল অভূতপূর্ব।

মার্ক্স জীবদ্দশায় নানা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। দেশ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। আজ তিনি নেই। কিন্তু তাঁর প্রভাব মৃত্যুর পরেও তাঁর বিরোধীদের জন্য আতঙ্কস্বরূপ। অধ্যাপক নিয়ার বলছেন, মার্ক্স জীবদ্দশায় লিখেছিলেন, 'দুনিয়ার সব প্রলেতারিয়েত এক হও'! (Proletarier aller Länder vereinigt Euch!) এই বিপদের ভয় এখনো মার্ক্সবিরোধীদের মধ্যে প্রকট। বার্লিনের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (Fachhochschulprofessor) ড. রাবান গ্রাফ (Prof. Dr. Rabangraf), যিনি মার্ক্সের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ও বটেন, কিন্তু মার্ক্সবিরোধী। তিনি ১৯৯০ সালে চেমনিৎসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কখন মার্ক্সের এই স্মৃতিচিহ্নটি (অর্থাৎ মার্ক্সের মাথাটি) সরানো হবে?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'এটা এখনো তোমাদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক' (Das bleibt zur Drohung für Euch stehen)। যাহোক, আশার কথা হলো তথ্যপ্রযুক্তি, মুদ্রণযন্ত্রের অগ্রগতি এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলোর গুণে মার্ক্সের লেখা এমনভাবে

ছড়িয়েছে যে চাইলেও তাঁকে এখন পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। আর একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ যেভাবে বর্বর চেহারায় আবির্ভূত, তা মার্ক্সীয় বয়ানকে নতুনভাবে উচ্চকিত হওয়ার সম্ভাবনাকে অবারিত করেছে। বিলুপ্ত পূর্ব জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল 'শ্রমিকশ্রেণির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি (die wissenschaftliche Weltanschuung der Arbeiterklasse)' বলে, যার প্রয়োজন তো এখনো ফুরিয়ে যায়নি। বিশেষ করে শ্রমিকের সংখ্যা যখন অনেক, চেতনার বিকাশ বিজ্ঞানসম্মতভাবে না ঘটলে তার অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা তিরোহিত। এ ক্ষেত্রে নিয়ার মার্ক্সের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের প্রারম্ভিক বক্তৃতা (Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation) থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করেন, 'সংখ্যা তখনই সমতা আনে, যখন সমাবেশ সবাইকে যুক্ত করে আর জ্ঞান তাদের চালিত করে' (Zahlen fallen nur in die Waagschale, wenn Kombination sie vereint und Kenntnis sie leitet)। এই বয়ানের মর্মার্থ হলো শুধু সমাজতন্ত্রী হলেই হবে না, হতে হবে বিজ্ঞানমনস্ক ও শ্রমিকশ্রেণির সর্বোচ্চ স্বার্থানুরাগী। নিয়ার বলছেন, 'এই বিচারে মার্ক্সবাদ অন্যান্য সমাজতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র। যে কারণে রোমানো প্রোদি (Romano Prodi) ও হাভিয়ার সোলানাকে (Javier Solana) কেউ সমাজতন্ত্রী আখ্যায়িত করলে, আমি কী বোঝাচ্ছি, লোকে তা বুঝবে।'

ড. নিয়ার বললেন, খুব অল্পে মার্ক্সবাদকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। মার্ক্সের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই সময়ে, যখন জার্মান দেশে ইতিহাসকে বস্তুবাদের আলোকে দেখা শুরু হয়েছিল, যাকে আমরা বস্তুবাদী ইতিহাস পর্যালোচনা (die materialistische Geschichtsbetractung) বলি। এই ধারায়, সমাজ পরিবর্তনের নিয়ামক হচ্ছে উৎপাদনপদ্ধতি (die Produktionsweise), আর এর সামাজিক ধারার প্রতিফলন ঘটে সামাজিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১৮৪০ সালে মার্ক্সবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আকারেই আবির্ভূত হয়েছিল। দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় পরে মার্ক্সীয় ধারণা পল্লবিত হয়েছে। এর বস্তুবাদী ও দ্বান্দ্বিক ধারণা বিজ্ঞানীদের রাজনীতিকীকরণ করেছে। যে কারণে আনশ্লুস গেবিটের (Ansclußgebiet) ৭০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্সবাদী দর্শন খারিজ করা হয়েছে।

অনেকে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে বলে থাকেন এটি একটি মনুষ্যবিদ্বেষী মতাদর্শ (Menschfeindliche Ideologie) এবং মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলসকে লেনিন, স্টালিন, মা-ও ও পলপটের সারিতে দাঁড় করান। মার্ক্সবাদ বলতে তাঁরা বোঝান রাশিয়ার গুলাগ (GULAG) এবং পূর্ব জার্মানির স্টাসিকে (STASI)। এ ক্ষেত্রে নেতারা

পূর্বসূরিদের অন্ধ অনুকরণ করেছেন মার্ক্সবাদ ভালোভাবে না বুঝে, আর ভজকট লাগানোর জন্য পশ্চিম জার্মান গোয়েন্দারাও পূর্ব জার্মানিতে সক্রিয় ছিল। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, শেষ বিচারে মার্ক্সবাদ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ (politische Ideologie)। ফলে ব্যবহারিক বিচারে ব্যক্তিভেদে ও স্থানভেদে এর ভিন্নতা থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে স্বৈরনায়কদের দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদলোভের কারণে তার কিছু বীভৎস চেহারা অবারিত হতে পারে, যেমন স্টালিন লেনিনীয় কেন্দ্রীয় কমিটির মুখ্য নেতাদের সরিয়ে দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন বিশ্ব পুঁজিবাদের অস্তিত্বের প্রাবল্যে সমাজতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম নয় (Der Sozialismus unter Fortexistenz des Weltkapitalismus kann keine bürgerliche Demokratie aushalten)। যাহোক, এসব ভুল-বোঝাবুঝি এবং ভূতপূর্ব সোভিয়েত জমানার সিপিএসইউ (CPSU= Communist Party of the Soviet Union) যা ভুলত্রুটি করেছে কিংবা পূর্ব জার্মানিতে সেকালে যেসব ভুল সম্পাদিত হয়েছে, তাকে মার্ক্সবাদের ত্রুটি বলা চলে না। ভুল মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার কারণে পার্টি চলে যাচ্ছিল জনগণের বাইরে। যে কারণে হেরমান কান্ট (Hermann Kant) বলেছিলেন, 'আমরাই নিজেদের তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম (Wir hatten uns weggenommen)। তাই এর দায় মার্ক্সবাদের নয়।'

মার্ক্সবাদের ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিয়ার বলেন, সত্যি বলতে পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরাও পুঁজিবাদ বুঝতে মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলসের দ্বারস্থ হতে পারেন। ধরতে পারেন পুঁজিবাদের ত্রুটি ও দুর্বলতা। একজন ব্যাংকার মার্ক্সবাদে আগ্রহী হলে তিনি তাঁর সহকর্মীদের চেয়ে ব্যাংকিং বিষয়ে অগ্রসর থাকবেন। একজন রাজনীতিজ্ঞ মার্ক্সবাদ জানলে তিনি তাঁর আস্থাভাজনদের কার্যকর পরামর্শ দিতে পারবেন। ভুলে গেলে চলবে না যে গোল্ডামেয়ার (Golda Meir) সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্ক্স-লেনিনবাদের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। অ্যাঙ্গেলস জার্মান ভাবাদর্শে (Die deutsche Ideologie) লিখেছেন, মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলসের এই নয়া মতবাদ হচ্ছে, 'বাস্তব দুনিয়া অধ্যয়ন' (Studium der wirklichen Welt)। ফলে যেকোনো সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতিবিষয়ক আলোচনায় মার্ক্সবাদীয় বীক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪.

খ্যাতনামা দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী পিটার সিঙ্গার (Peter Albert David Singer) মনে করেন, মার্ক্সবাদ পৃথিবী থেকে মরে যায়নি। এখনো বিশ্বের প্রতি

১০ জনের মধ্যে ৪ জন লোক মার্ক্সীয় সরকারপদ্ধতির রাষ্ট্রে বসবাস করেন। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমের কেন্দ্র কক্ষচ্যুত হয়, ফলে মার্ক্সের তত্ত্বের ত্রুটি স্বীকৃত হয় এবং তাঁর ইতিহাসবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী ভুল বলে প্রমাণিত হয়। ফলে মার্ক্সীয় পদ্ধতির বিশ্ব বীক্ষণ সেকেলে হিসেবে প্রতিভাত হয়। তারপরও কেন একবিংশ শতাব্দীতে আমরা তাঁর বয়ান ঘাঁটব? সিঙ্গার এই প্রশ্ন তুলেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সীয় তত্ত্বের দুর্নাম হয়েছে কিছু মার্ক্সবাদী দেশে স্বৈরতন্ত্র ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে বলে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে না যে, মার্ক্স জীবিত থাকলে এগুলো সমর্থন করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে দারিদ্র্য ছিল, যেমন চীনে এখনো বহু জায়গায় দারিদ্র্য আছে। অথচ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে মানুষ অনেক ভালো আছে। তবে এটা মার্ক্সের ব্যর্থতা নয়। একটি কমিউনিস্ট সমাজ কীভাবে কাজ করবে তার ন্যূনতম বয়ান মার্ক্স দেননি। মার্ক্সের ত্রুটি অন্যখানে এবং তা গভীর। মার্ক্সের ত্রুটি ছিল মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে।

মার্ক্স মনে করতেন সহজাত চরিত্র বলে মানব প্রকৃতিতে কিছু নেই। ফয়েরবাখ সম্পর্কীয় মতবাদে (Theses on Feuerbach) তিনি মানুষের সারবত্তাকে (The human essence) সামাজিক সম্পর্কগুলোর সমাবেশ (The ensemble of the social relations) বলে মনে করতেন। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরাজমান সম্পর্ককে বিনাশ করা যায়। মার্ক্স অবশ্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানবচরিত্রের স্বরূপ অন্বেষণের সামগ্রিক প্রচেষ্টা নেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত হেগেলপাঠের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। হেগেলের বয়ান ছিল, ইতিহাসের লক্ষ্য হলো মানবাত্মার মুক্তি, আর এটি তখনই সম্ভব, যখন আমরা সবাই বুঝব যে আমরা সবাই এক সর্বজনীন মানব মনের অংশ। মার্ক্স এই ভাববাদী বয়ানকে বস্তুবাদী বয়ানে রূপান্তরিত করলেন; যেখানে ইতিহাসের ভাগ্য নির্ধারণের অমোঘ শক্তি অর্জিত হয় বস্তুবাদী প্রয়োজন মেটানোর মধ্য দিয়ে। আর মুক্তি অর্জিত হয় শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই বয়ানে শ্রমজীবী মানুষ হবে সর্বজনীন মুক্তি অর্জনের নিয়ামক। কারণ, এই সূত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, ফলে উৎপাদনমাধ্যম (the means of production) থাকবে যৌথ মালিকানার অধীনে।

মার্ক্স মনে করতেন, উৎপাদনমাধ্যম যদি যৌথ মালিকানায় থাকে, তাহলে সমবায়ী সম্পদের উৎসগুলো (springs of cooperative wealth) এমনভাবে সম্পদের প্রাচুর্যে সমাজকে ভাসিয়ে দেবে, যেটা ব্যক্তিমালিকানায় সমাজে সম্ভব নয়। কিন্তু মার্ক্স দেখলেন সম্পদ বণ্টনে এই বয়ান কার্যকর করার ক্ষেত্রে বহু

সমস্যা। দুই জার্মান সমাজতন্ত্রী দলের একত্র হওয়ার একটি প্রস্তাব দাখিল হয়েছিল, যেখানে মার্ক্স 'সুষম বণ্টন', 'সম-অধিকার' ইত্যাদি ধারণাকে বাতিল ও বচনসর্বস্ব আবর্জনা (obsolete verbal rubbish) বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি এই পর্যায়ে মনে করতেন ওই বচনগুলো অভাবের জমানার বস্তু; বিপ্লব এগুলোর ইতি টানবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমাণ করেছে, উৎপাদনমাধ্যমের ব্যক্তিমালিকানা ধ্বংস করে দিয়ে মানবচরিত্রে পরিবর্তন আনা যায় না। বেশির ভাগ মানুষই সাধারণ সম্পদের (common good) প্রতি ঝোঁকার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার এবং বিলাসের দিকে আকৃষ্ট হয়। আর ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ সমবায়ী সম্পদের তুলনায় সমাজে অনেক বেশি সম্পদের জোয়ার আনতে পারে, তা বিশ্বের প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্রের একটির ক্ষেত্রেও প্রকটিত, যে রাষ্ট্রটি এখনো মার্ক্সবাদী রাষ্ট্র হিসেবেই নিজের পরিচয় দেয়। মা-ও সেতুংয়ের চীন ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। ১৯৭৪ সালে দেং শিয়াও পিং ব্যক্তিমালিকানাধীন উদ্যোগকে সমর্থন করলেন এই বলে, 'বিড়াল সাদা না কালো তা বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য হলো বিড়াল ইঁদুর ধরতে পারে কি না'। দেংয়ের এই উদ্যোগ ৮০০ মিলিয়ন চীনাকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এতে অবশ্য ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় এখানে ধনী-গরিব বৈষম্যও বেড়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনায়ও এই বৈষম্য ব্যাপক। চীন যদিও দাবি করে আসছে যে তার সমাজতন্ত্র চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র, কিন্তু দৃশ্যত তা মনে হয় না, মার্ক্সবাদী যে তা না, তা বলাই বাহুল্য। চীনের এই নীতিগত পরিমার্জন যা রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে ঘটেছে, তাতে চীন মার্ক্সকে বর্তমান কালের জন্য অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তথাপি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান পৃথিবীতে রয়ে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসের যে বস্তুজাগতিক তত্ত্ব মার্ক্স উপস্থাপন করেছেন, তা কৃশকায় হলেও সামগ্রিক বিচারে মানবসমাজের গতিপ্রবাহের অনুঘটকগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে।

৫.

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ও মার্ক্সের জীবনীকার জোনাথন স্পেরবার (Jonathan Sperber) মার্ক্সের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণগুলোকে অভিনব চিন্তা আকারে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, মার্ক্সের 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' (The labour theory of value) আদতে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো থেকে ধার করা। তখনকার জমানায় অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। ফলে মার্ক্স কৃষিনির্ভর অর্থশাস্ত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমহ্রাসমানতাকে তৎকালীন উৎপাদনব্যবস্থা দ্বারা চিন্তা করেছেন, যা ছিল পুরোনো জমানার পুঁজিবাদ। মার্ক্সের মানবসমাজের

উত্তরণের বয়ানের নেপথ্যে তাঁর এশীয় ব্যবস্থা (Asiatic Mode) থেকে পরবর্তী ধাপগুলোয় এগোনোর ধারণাও হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ও অগাস্ট কোঁতের (August Comte) জমানার চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তা বিংশ শতাব্দীর আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে সামাজিক গঠন হচ্ছে উপরিকাঠামো (Superstructure) এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো তার ভিত্তি। ফলে ব্যক্তির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থ থেকে ভিন্ন হলেই সমষ্টির স্বার্থ ব্যাহত হবে; যে কারণে ব্যক্তিকে সমষ্টির মধ্যে আত্মস্থ করতে হবে এবং একইভাবে রাষ্ট্রকেও, যে বৈশ্বিক কাঠামোতে নির্দিষ্ট দল বা জাতির স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে। সমস্যা হলো ১৮৮৩ সালে মার্ক্স যখন মারা যান, তখনো ইউরোপের দেশগুলো রাজতন্ত্রের অধীনে। ফলে মার্ক্স দেখেছিলেন পুঁজিবাদ বিকাশের প্রারম্ভিকা। তখনো শ্রমিকশ্রেণির দ্বারা শিকাগোতে প্রতিষ্ঠিত ১ মের ঘটনা ঘটেনি। মার্ক্স দেখতেন কারখানাগুলোতে জীর্ণশীর্ণ দেহে মানুষজন ১৪ ঘণ্টা কাজ করছে। এখনকার দুনিয়ায় এই অবস্থা তিরোহিত হয়েছে। মার্ক্স সমস্যা সমাধানের চিন্তা করেছেন সহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এই চিন্তার সূত্র ধরে জনগণের ও আন্তর্জাতিক মঙ্গলবার্তার নাম করে রাশিয়া, চীন ও কম্বোডিয়া ঘটিয়েছে গণহত্যার মহোৎসব। একটি পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয় ও স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ছিল না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার বিপর্যয় ঘটত। মার্ক্স যাকে বলতেন সংকট (Crisis)। বর্তমানে আমরা একে ভদ্রস্থ নামে ডাকি মন্দা (Recession) বলে। ২০০৭-০৮ সাল থেকে যা শুরু হয়েছে তাকে আমরা পুরোনো উপনামে (Sobriquet) ডাকলেই বোধ হয় ভালো হয়।

দাস ক্যাপিটাল-এ মার্ক্স বহুবার এই সংকটের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৮৫০ সালে তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক *নিউইয়র্ক ট্রিবিউন*-এর ব্যবসা ও অর্থসংক্রান্ত সংবাদদাতা হিসেবেও তিনি এ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। ১৮৫৭ সালের সংকটের সময়ে যেটি দুনিয়ার প্রথম বিশ্ব মন্দা নামে পরিচিতি পেয়েছিল। সে সময় মার্ক্স দুনিয়ার প্রথম বিনিয়োগ ব্যাংক ক্রেডিট মোবিলিয়েরের (Crédit Mobilier) নীতির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ করেন ব্যাংকের সংবিধি তার পুঁজির ১০ গুণ ঋণ নিতে অনুমোদন দিচ্ছে। সেই টাকা থেকে কৃত তহবিল থেকে সে শেয়ার কিনতে অথবা ফরাসি রেলওয়ের এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর আইপিওগুলোয় (IPO = Initial Public Offering) অর্থ ঢালতে শুরু করেছে, যাতে ভালো লাভ পাওয়া যায়। কিন্তু যখন কোনো ক্রেতা পাওয়া গেল না, আবিষ্কৃত হলো যে কিনে নেওয়া স্টকগুলোর মূল্যের পতন হয়েছে। ফলে ঋণ পরিশোধেরও আর

কোনো সহজ রাস্তা নেই। তবে পুঁজিবাদের এই স্বয়ংক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আলোচনা কিছুটা ভিন্ন ধাঁচে সিসমন্ডি করেছেন এবং জন মেইনার্ড কেইন্স ও হিমান মিনস্কি থেকে জোসেফ স্টিগলিৎজ এবং পল ক্রুগম্যান ভিন্ন আঙ্গিকে এই আলোচনায় ব্রত হয়েছেন।

৬.

জার্মান দেশের কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের ইন্টারনেটভিত্তিক পত্রিকা রোটফুক্স-এ (RotFuchs) হোর্স্ট নয়েমান (Horst Neumann) লিখেছেন, 'মার্ক্স কি প্রকৃতই এখনো প্রাসঙ্গিক?' (Ist Marx eigentlich noch aktuell?)—এই শিরোনামে। এ লেখায় তিনি জানিয়েছেন, যাঁরা মার্ক্সবাদী নন (Nichtmarxisten), তাঁরা পর্যন্ত বলছেন এখন, 'মার্ক্স পুঁজিবাদ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা সঠিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে এখন অবস্থা আরও খারাপ।'

নয়েমান লিখেছেন, মার্ক্সবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান। ফলে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো মার্ক্সবাদেরও পর্যায়ভিত্তিক বিকাশ ঘটছে। যেমন আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানেরই একটি বিকশিত রূপ। কিন্তু তাতে নিউটনের তত্ত্ব খারিজ হয়ে যাচ্ছে না, তার বিকাশ হচ্ছে এবং তার যথার্থতা আরও দৃঢ় হচ্ছে। লেনিন একইভাবে মার্ক্সীয় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদের বিকাশের একপর্যায়ে যে সাম্রাজ্যবাদের আগমন ঘটবে, তার তত্ত্বীয় হিসাব-নিকাশ হাজির করেছেন বিশদভাবে। আর এর ফলে শ্রেণিসংগ্রামের চরিত্র কী হবে, তার বিশদও তিনি বয়ান করেছেন। এটাই স্বাভাবিক যে মার্ক্সের সময়কার পুঁজিবাদ আর আজকের পুঁজিবাদ হুবহু এক রকম হবে না। আজকের জমানায় ব্যাংকিংয়ে ভার্চুয়াল মূল্যে সবকিছুর লেনদেন করা হয়, এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ এবং সুদ সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আর এসব মার্ক্সের জমানায় ছিল অভূতপূর্ব। অদম্য লোভ এখন পুঁজিব্যবস্থার চালিকাশক্তি। ফলে ব্যাংকিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন এলেও এবং পুঁজিবাদের চরিত্রের বহুমুখী বিকাশ ঘটলেও পুঁজির স্বরূপ কিন্তু ওই একই। মার্ক্স বলেছিলেন, পুঁজিবাদে ব্যক্তির বাণিজ্যনীতি দাঁড়ায় সমাজের কৃত কাজের সব ফলাফল নিজস্ব করে নেওয়া (die private Aneignung der gesellschftlichen Arbeitsergebnisse) এবং সামাজিক সম্পদকে আত্মস্থ করার চেষ্টায়। আজ আমরা দেখছি, এই ধারায় খাওয়ার পানিও ব্যক্তির সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলস কিন্তু শুরুতেই পুঁজিবাদী সমাজ তৈরির উপাখ্যান বয়ান করেননি। তাঁরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানবসমাজের বিবর্তনের ধারায় পশুর সমাজ থেকে মানবসমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়ার

বয়ান হাজির করেছেন। এ ধারাতেই শ্রমবিভাজনের নিরিখে গড়ে ওঠা সমাজ একসময়ে শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজের শ্রেণিকে নিকেশ করে শ্রেণিহীন সমাজের দিকে নিজেকে পরিচালিত করে। শ্রেণিগত পর্যায়ে সমাজ থাকে দুই ভাগে বিভক্ত; একটি উৎপাদনমাধ্যমের মালিক (die Eigentümer von Produktionsmitteln), আর অপরটি যাদের এগুলো নেই (Nichteigentümer)। ফলে তা আরেকভাবে দুটি গোষ্ঠী তৈরি করে—শাসক (die Herrschende) ও পরাধীন (die Abhängige)। আর এই দুই শ্রেণির সম্পর্কের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটলেও তাদের শ্রেণিগত বিন্যাসে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

মার্ক্স দেখিয়েছেন যে মানব ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস (Geschichte von Klassenkämpfen)। তিনি প্রলেতারিয়েতকে তাঁর মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খলে অবলোকন করেছেন। তাঁদের বঞ্চনা সমাজপ্রসূত এবং অনেক ক্ষেত্রে তা আত্মপ্রবঞ্চনা, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দশা ব্যাখ্যা এবং শপথের মধ্যে শ্রেণিগত স্বার্থকে আবিষ্কার করতে পারছেন।

এই শ্রেণিসংগ্রাম আজও হচ্ছে, যেখানে শাসক শ্রেণি অদম্য ও বর্বরতম আকৃতিতে আবির্ভূত। কারণ শোষিত শ্রেণি সামগ্রিকভাবেই বিশৃঙ্খল এবং নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে তার খুব সামান্য সক্ষমতাই আছে।

বিশ্বায়নের প্রকট ও প্রতীয়মান দাপটে পুঁজিবাদ উচ্চকিত, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের অস্তাচল ঘটেছে। প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোতে বিশেষত আফ্রিকার দেশগুলোয় মানুষ ন্যূনতম বেঁচে থাকার রসদ থেকে বঞ্চিত। বিশ্বায়ন স্পষ্ট করে দিয়েছে কেন পুঁজিবাদের ধ্বংস আমাদের কাম্য। মার্ক্স উৎপাদিকা শক্তিগুলোর যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, তাকেই উন্নয়নের চালিকাশক্তি (die Triebkraft der Entwicklung) বলেছেন এবং সেগুলো উৎপাদন সম্পর্কগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত না হওয়ায় তিনি কোনো সমাধানে যেতে পারেননি।

কার্যত লেনিন এই বাধাগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছিলেন, যা দলের নেতৃত্বের সংকট তৈরি করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন এবং এর ফলে সেগুলো দলের লোকজনের সঙ্গে বোঝাপড়া এবং তাঁদের ঠিকমতো সুশৃঙ্খল করার পথেও বাধা তৈরি করতে পারে বলে তাঁর প্রতীতি হয়েছিল। এই চালিকা শক্তিগুলোর মধ্যকার অসামঞ্জস্যই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (der dialektische Materialismus) নামে আখ্যায়িত। শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টি একই সূত্রে গাথা; বিশেষত লেনিন বিষয়টিকে ঠিকমতো আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। আর ফিদেল কাস্ত্রো এখান থেকেই কিউবার বিপ্লবের সরঞ্জাম তৈরি করতে পেরেছিলেন। তিনি অ্যাঙ্গেলসের এই বয়ানকে মাথায় রাখতেন, 'Alles, was die Massen

bewegt, muß erst durch ihnen Kopf hinducrh'. অর্থাৎ যা দিয়ে জনগণকে দোলাতে হবে, সেটিকে যেতে হবে প্রথমে তাদের মাথার মধ্য দিয়ে। ১৯৮০-এর দশকের মার্ক্সবাদীরা এই বাণী ভুলে বড় ভুল করেছিলেন।

মার্ক্সের তত্ত্ব ও তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মার্ক্সের দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে নানাজন নানা কথা বলছেন। এটিও ইতিহাসেরই অংশ। ১৮৭১ সালে পারি কমিউনের (La Commune de Paris) অবসানের পর আরেক চরমপন্থী সমাজতন্ত্রী হতাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লেনিন মার্ক্সবাদকে আবারও দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত যুগের অবসানের পর মার্ক্সবাদীরা পর্যবেক্ষণ করলেন পারি কমিউনের পুনরাবৃত্তি শোকগাথার আদলে। আর মার্ক্সের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীতে টালমাটাল পুঁজিবাদের ক্রান্তিলগ্নে অনেকেই মার্ক্সবাদের পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখছেন। যদি ইতিহাসে মার্ক্সবাদের আবারও আবির্ভাব ঘটে, তবে তার পরিণতি কি হবে প্রহসন আকারে? এখন অপেক্ষা করার পালা পরবর্তী সময়ে মার্ক্সীয় তত্ত্ব কোন ভূমিকা নিয়ে মানবজাতির সামনে আবির্ভূত হয়।

তথ্যসূত্র

Warum Marx immer noch aktuell ist – Ein Geschpräch mit Prof. Andreas Arndt. Cicero- Magazin für politische Kultur. See: https://www.cicero.de/wirtschaft/warum-marx-immer-noch-aktuell-ist/42029

Marx - Wie aktuell ist seine Kritik heute? – Ein Geschpräch mit Prof. Andreas Arndt. Deutsche Welle. See: https://www.dw.com/de/marx-wie-aktuell-ist-seine-kritik-heute/a-16663641

Ist Marx eigentlich noch aktuell? By Horst Neumann. RotFuchs. Tribüne für Kommunisten und Sozialisten in Deutschland. See: http://www.rotfuchs.net/rotfuchs-lesen/ist-marx-eigentlich-noch-aktuell.html

Was hat uns Karl Marx heute zu sagen? By Prof. Dr. Michael Nier. Sache des Volkes. Plattform für sozial- und nationalrevolutionäre Politik. See: https://sachedesvolkes.wordpress.com/

Is Marx still relevant? By Peter Singer. Project Syndicate. See: https://www.project-syndicate.org/commentary/karl-marx-200th-birthday-by-peter-singer-2018-05?barrier=accesspaylog

Is Marx still relevant? By Peter Singer. *Social Europe*. See: https://www.socialeurope.eu/is-marx-still-relevant

Is Marx still relevant? By Jonathan Sperber. *The Gurdian*. International Edition.
https://www.theguardian.com/books/2013/may/16/karl-marx-ideas-resonate-today

কমিউনিস্ট নারী

নিবেদিতা নাগ : জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মালেকা বেগম

[জগৎখ্যাত, বাংলাদেশের কোটি মানুষের হৃদয়ে দোলা দেওয়া কালো মানুষের নেতা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিজয়ী প্রয়াত বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে, ১৮ জুলাই ২০১৮ সালের বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় বসে ছিলাম বাংলাদেশ জাদুঘরের মূল আলোচনা মঞ্চে। মুঠোফোনে কলকাতা থেকে সুজয় নাগের ডাক বেজে উঠল। খুদে বার্তায় তিনি জানালেন, তাঁর প্রয়াত মা, বাংলাদেশের স্বনামধন্য কমিউনিস্ট নেত্রী নিবেদিতা নাগের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে ২০১৮ সালের ৪ আগস্ট।

বিহ্বল হয়ে গেলাম। পৃথিবীজুড়ে বিশ শতকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যখন উত্তাল বিপ্লব চলছিল, সে সময়ে সাদা মানুষের দেশ থেকে শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠীর শাসন চেপে বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে। এই দুই দেশেই নানা সামাজিক-রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট বাম রাজনীতির উত্থান ঘটেছিল। সেই বিশাল ও বিপুল কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টিকারী নেলসন ম্যান্ডেলার বৈপ্লবিক জয়ের ইতিহাস অনিবার্যভাবে পৃথিবীসেরা ইতিহাসের অন্যতম। বিপ্লবী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বছরে (২০১৮) ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনে জর্জরিত পরাধীন পূর্ব বাংলার-পূর্ব পাকিস্তানের (১৯৪৭ সালের আগে এবং পরে) কখনো আত্মগোপনকারী, কখনো কারাবাসী, কখনো প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত কমিউনিস্ট নেত্রী নিবেদিতা নাগের (জন্ম ৪ আগস্ট ১৯১৮—মৃত্যু ৫ মে ২০১৩) জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার আনন্দ আমার মন আপ্লুত করে দিয়েছে।

বিপ্লবী নেলসন ম্যান্ডেলাকে জেনেছি উইনি ম্যান্ডেলার হৃদয়-জাগানিয়া ব্যাকুলতায় লেখা বই পড়ে। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে এবং ঢাকায় উইনি ম্যান্ডেলার সঙ্গে দেখা, কথা ও জানার মধ্য দিয়ে রচনা করেছি *উইনির চোখে ম্যান্ডেলা* (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০৮)।

পাঠক-আকর্ষিত এই বই নেলসন ম্যান্ডেলা ও উইনি ম্যান্ডেলার জীবন-আনন্দ, বিচ্ছেদ-বেদনা—সবই আমাদের হৃদয় উদ্বেল করে তোলে নিঃসন্দেহে। সেই কাহিনি বিপ্লবমথিত হৃদয়-জাগানিয়া। অন্যদিকে, জন্মশতবর্ষ সূত্রে গাঁথা পূর্ব বাংলার, পূর্ব পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেত্রী নিবেদিতা নাগের লেখা ও সম্পাদিত যে দুটি বই আমার এবং জিজ্ঞাসু পাঠকের বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে, সেই বই দুটি পড়ে তাঁর

সম্পর্কে ও নেপাল নাগের কর্মকাণ্ড জেনেছি। শ্রদ্ধেয় নিবেদিতা নাগ স্বাক্ষরিত (২০ নভেম্বর ২০০৪) 'স্নেহের মালেকাকে' লেখা বই দুটি হাতে নিয়ে বসেছি আজ ২৮ জুলাই ২০১৮। একটি বই *নেপাল নাগ স্মৃতিচারণা*; নিবেদিতা নাগ সংকলিত। কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি. থেকে বেরিয়েছে জুলাই ১৯৯৬ সালে। দ্বিতীয়টি নিবেদিতা নাগ রচিত *ঢাকা থেকে কলকাতা* (প্রকাশক আলোচনা চক্র, কলকাতা-৫৬, ৪ আগস্ট ২০০৮)। বই দুটি আমার দুর্লভ বই সংগ্রহের শেলফে যত্নে রেখেছি ১৪ বছর ধরে। সযত্নে রাখব আমার আজীবন বই পড়ার চর্চায়। 'নিবেদিতা দিদি' সম্বোধনে প্রথম তাঁকে ডেকেছি, দেখেছি এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিবেদিতা নাগ ও নেপাল নাগ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়া অরুণ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রেখা চৌধুরী (কারামুক্ত হয়ে) অসুস্থ কমরেডদের এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধাদের সব সহযোগিতা দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর বৈপ্লবিক কাজের বিষয়ে জেনেছি। তাঁর জীবনসঙ্গী নেপাল নাগ ছিলেন পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় নেতা এবং আদমজী এলাকার শ্রমিক আন্দোলনের গোপন-প্রকাশ্য সুযোগ্য নেতা। তাঁরা দুজন জীবনসঙ্গী-দম্পতি প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের গোপন কমিউনিস্ট পার্টির এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় সাম্যবাদী আদর্শে যুক্ত থেকে কমিউনিস্ট পার্টি সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিবেদিত ছিলেন শোষিত মানুষের সংগ্রামে। ছেলে সুজয় নাগের রিউম্যাটিক হার্টের অসুখ হওয়ায় নিবেদিতা নাগ ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় চলে যান। অন্যদিকে নেপাল নাগ ১৯৬৪ সালে ভাগ হওয়া আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির চীনের নীতির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে কলকাতায় সিপিএমের রাজনীতিতে যুক্ত হন। চরম অসুস্থ অবস্থায় তিনি প্রয়াত হন ১৯৭৮ সালের ৫ অক্টোবর।

যদিও ১৯৫৫ সাল থেকে ঢাকা ছেড়ে কলকাতাবাসী হয়েছেন (বাধ্য হয়ে), তবু নিবেদিতা নাগ মনের দিক থেকে আজীবন যুক্ত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউন-বাসী (গোপন পার্টি-জীবনযাপন) থাকাকালীন 'আত্মগোপনের জীবনযাপনের' স্মৃতিচারণে। তাঁর বাবার সূত্রে পারিবারিক বৈপ্লবিক নানা স্মৃতিসম্ভারে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। সাহসী, কর্মঠ, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং উন্নত জীবনের সফল প্রয়োগে শিক্ষকতার সাফল্যে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নারী আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনে সারা জীবন সাফল্যের সঙ্গে কৃতী মানুষ হওয়ার উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন ঢাকার কারাজীবন। তাঁর লেখা বই, আলোচনা, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় তাঁর বেঁচে থাকা ৯৫ বছরের সুখ-দুঃখ-কৃতিত্ব-দাম্পত্য জীবন-বিপ্লবী জীবন-নারী আন্দোলন-কর্মজীবন-সমাজসেবার স্বর্ণময় কাহিনি। সেসব কাহিনির সূত্র ধরে নিবেদিতা দিদির সাক্ষাৎকার নিয়েছি কলকাতায় বীরেশগুহ রোডে তাঁর নিজের ২৬ নম্বর বাড়িতে।

সাক্ষাৎকারটি দুই কিস্তিতে নিয়েছি। 'বাংলাদেশের গণ-আন্দোলনে নারীর ভূমিকা (১৯৪৭-২০০০)' বিষয়ে গবেষণামূলক একটি বই লেখার প্রস্তুতির সময়ে নিবেদিতা নাগের প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়েছি ২০১২ সালের ৫ জানুয়ারি। তিনি বই লিখেছেন, নানা প্রসঙ্গে তাঁর সংগ্রামমুখর ও কর্মমুখর বিপ্লবী জীবনের কথা বলেছেন ও লিখেছেন। বাংলাদেশের ঢাকায় (পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে উত্তরণের সময়কালে) তাঁর শিক্ষাজীবন, বিপ্লবী জীবনের কর্মকাণ্ড, পেশাগত শিক্ষকতা, বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেপাল নাগের সঙ্গে পূর্বরাগ-প্রেম ভালোবাসার বিয়ে, বিপ্লবী সংসারজীবন, আত্মগোপনের সময়ে সন্তানসম্ভবা, স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও আসন্ন মাতৃত্বের আনন্দ, নেপাল নাগের অসুস্থতা—সব ছাপিয়ে বিপ্লব-আন্দোলনের স্মৃতি রোমন্থনে তিনি কলম চালিয়ে উপহার দিয়েছেন অনেক তথ্য। ঢাকায় জেলজীবনের

অধ্যায়টির বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে যতটুকু জেনেছি, তা প্রথম সাক্ষাৎকারে তুলে ধরলাম।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি নিয়েছি ২০১২ সালের ৩০ মে। সারা দিন ধরে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে মনপ্রাণ তৃপ্ত হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকার রেকর্ডিং করেছিলেন বাংলাদেশের দৈনিক *প্রথম আলো* পত্রিকার কলকাতার আলোকচিত্রী ভাস্কর মুখার্জি।]

প্রথম সাক্ষাৎকার

নিবেদিতা নাগ : ইংরেজি বিভাগ থেকে ১৯৪১ সালে এমএ পাস করে নারায়ণগঞ্জ উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষের চাকরি পেলাম ১৯৪৭ সালের ১ নভেম্বর। ঢাকায় বাবার বাড়ি ছিল। সেখানেই থাকতাম। তখন পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্টদের বন্দী করে কারাগারে পাঠাচ্ছিল। ১৯৪৮ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করল। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্য ছিলাম। 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গড়ে তোলার কাজ করছিলাম পার্টির নির্দেশে। নারী কমরেডরা আত্মনিবেদিত হলেন। নোয়াখালী, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, যশোর, বরিশাল, খুলনা জেলাগুলোয় নারী পার্টি সদস্যরা সংগঠিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠন করার প্রস্তুতি নিই। কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন সভানেত্রী। তিনি পার্টি সদস্য ছিলেন না। কিন্তু রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও লীলা নাগের নারী আন্দোলনের দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। প্রথম উদ্যোগ ছিল ময়মনসিংহ শহরে সমিতির সম্মেলন। ঢাকায় সমিতির একটি অফিস চালু করার চেষ্টা নেওয়া হয়। পুলিশের হামলায় আমরা সেই অফিস চালু রাখতে পারিনি।

সেই সময় জেলে জেলে বন্দী পার্টি সদস্যরা 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' শুরু করলে পার্টির নির্দেশে আমাদের মহিলা সমিতি এবং ছাত্র ফেডারেশনের আয়োজনে ঢাকা শহরের 'করোনেশন পার্কে' ১৯৪৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় সভা ডাকা হয়েছিল। সভা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আমার। সভা চালানোর জন্য মঞ্চে উঠতেই পুলিশ ঘিরে ফেলে। মঞ্চে ছিলাম ১১ জন মহিলা। ছাত্র কয়েকজন। সভানেত্রী সুফিয়া কামাল সেই সভামঞ্চে ছিলেন না। ছিলাম আমি নিবেদিতা নাগ, মনীষা মুখার্জি, রাধা দাস, নিরুপমা গুপ্তা, উমা রায়, সুদেশী মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী মুখার্জি, কণা পাল, রীণা সেনগুপ্ত, অনিমা দাস।

থানায় নিয়ে গেল আমাদের বন্দী করে। থানায় শুরু করি অনশন ধর্মঘট। ঢাকার জেলে আমরা লবণ জল খেতাম। একাদিক্রমে ৪০ দিন অনশন করার পর কিছু দাবি আদায় হলো। জেলে সে সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন খুলনার মহিলা নেত্রী ভানু দেবী, বরিশালের কিরণ সেনগুপ্ত, ঢাকার নাদেরা বেগম (সেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ মুনীর চৌধুরীর বোন) ও ইরা রায়। কিছুদিন পরে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন আস্তানা থেকে গ্রেপ্তার হয়ে আমাদের জেল সাথি হয়েছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সন্তোষ

গুপ্তের (দৈনিক *সংবাদ*, সে সময়ে পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন) মা কিরণ গুপ্ত।'

মালেকা বেগম : নিবেদিতা দিদির কাছ থেকে জেনেছিলাম, সন্তোষ গুপ্ত ছিলেন পার্টির গোপন সদস্য। তাঁর বাড়ি ছিল তাঁতীবাজার। সেটা ছিল পার্টির গোপন আস্তানা। সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ যাঁদের পেয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকনেতা কমরেড অনিল মুখার্জি, কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে জেলা কমিউনিস্ট নেতা তকীয়ুল্লাহ। তাঁরা ঢাকা জেলে ছিলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার

নিবেদিতা : 'মেয়েদের বিপ্লবে আসা সাজে না। মেয়েরা বিপ্লবে এলে খুব অসুবিধা হয়'—এ কথা শুনে প্রীতিদি (প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার) খুব চটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটা হতেই পারে না। সমাজের একাংশ বাদ দিয়ে কখনো বিপ্লব ঘটতে পারে না—ওটাই ছিল প্রীতিদির বক্তব্য।

প্রীতিদি সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি আমি যখন চট্টগ্রামের ডা. খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হই, তখন। যখন ভর্তি হই, তখন একটা জিনিস আমার চোখে লাগল। যখন আমরা ক্লাসে যেতাম—সব স্কুলেই যেটা হয়, লাইন করে যার যার ক্লাসে ঢোকে—আমাদের সে রকম জায়গায় শুধু হেডমিস্ট্রেস বলতেন, স্টার্ট। আমরা লাইন করে দাঁড়াতাম, প্রথমে ক্লাস টেন যেত, তারপর আমরা নাইনে যারা, তারা যেতাম। তারপর এইট। এভাবে সবাই ঢুকতাম। আমি যখন ১৯৩২ সালে স্কুলে ভর্তি হই, তখন জিনিসটা আমাকে খুব স্ট্রাইক করল। যখন দেখলাম, কোনো গান হয় না, কোনো প্রার্থনা হয় না, হেডমিস্ট্রেস স্টার্ট বলেন, আর সবাই ঢুকে যায়, ব্যাপারটা কী? পরে শুনলাম, বছর কয়েক আগে—মানে প্রীতিদি আমার ছয় বছরের বড় ছিলেন—তখন নাকি একটা গান হতো, গানটা ছিল, 'গড সেভ দ্য কিং, গড সেভ আওয়ার নোবেল কিং'। এটা নাকি স্কুলের সংগীত ছিল। আমার মা-ও একই কথা বলতেন। আমার মা অমিয় বালা চৌধুরী ঢাকার ইডেন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। সেই স্কুল থেকে মা ম্যাট্রিক পাস করেছেন। মা-ও বলতেন, সেটা আমাদের জাতীয় সংগীত ছিল। তো প্রীতিদি এই গানে আপত্তি করেন।

প্রীতিদি একটা দলবল নিয়ে হেডমিস্ট্রেসকে বলেন, এই গান কেন আমরা গাইব। এই গান তো ন্যাশনাল সং হতে পারে না। কিংকে রক্ষা করা, এটা ন্যাশনাল সংয়ে কী করে আসে। কে বলেছে, কথাটা আমি জানি না। একজ্যাক্ট কথাগুলো আমি শুনিনি। কিন্তু প্রীতিদি খুব আপত্তি করেছিলেন এবং তিনি গাইতে চাননি গানটি। হেডমিস্ট্রেস যখন গাইতে বলছিলেন, তখন মেয়েরা চুপ করে ছিল। প্রীতিদি এত ভালো অর্গানাইজার ছিলেন। স্কুলে যখন তিনি ক্লাস নাইনে পড়েন,

তখনই তিনি অর্গানাইজ করে ফেলেছিলেন যে মেয়েরা এই গান গাইবে না। তখন তো চট্টগ্রাম উত্তাল। যখন অভিভাবকেরা শুনলেন, এই গান গাওয়া বন্ধ হয়েছে, তখন তাঁরাও খুশিই হলেন এবং হেডমিস্ট্রেস কোনো রকম সমর্থন পেলেন না এ ব্যাপারে। এটা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। কারণ, ক্লাসে গানটান না করে ঢোকাটা খুব চোখে লেগেছিল বলেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম এবং ঘটনাটা জানতে পারি। এই প্রীতিদির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পরবর্তীকালে অন্য কারণে প্রীতিদি আমার আদর্শ বলতে পারো এবং প্রীতি স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য যা করে গেছেন, তার তো কোনো তুলনা নেই, তা তো সবাই জানে। এই ঘটনা অনেকেই জানে না। কলকাতার বেথুন কলেজে একবার আমাকে ডেকেছিল প্রীতিদির জন্মদিনে বক্তৃতা করার জন্য। তখন আমি এ ঘটনা বলেছিলাম। তখন সবাই শুনে অবাক হয়েছিলেন। এত বড় ঘটনা, আমরা তো জানি না প্রীতি সম্পর্কে।

আমাদের বাড়িতে সূর্য সেনের পার্টির লোকজনের খুব আসা-যাওয়া ছিল। সূর্য সেন আমার বাবার ক্লাসমেট ছিলেন। সে জন্য আমার বাবাকে অনেক ভোগান্তি সহ্য করতে হয়েছে। জেলে ঠিক যাননি, কিন্তু বারবার বাবার চাকরি গেছে এবং প্র্যাকটিক্যালি তিনি ইন্ডিয়ায় থাকতে পারেননি। তাঁকে নেপালে গিয়ে চাকরি করতে হয়। আমাদের বড় করতে হয়। তো, ব্যাপারটি দাঁড়ায় এ রকম যে আমরা পলিটিক্যাল সাফারার সেই ছোটবেলা থেকেই এবং কাকারা সব বিপ্লবী আন্দোলনে, বিশেষ করে সূর্য সেনের দলেই ছিলেন। এই দল থেকে আমার উত্তরণটা একটু আশ্চর্য। কারণ, আমি তো দেশে থাকতাম না। আমি নেপালে বাবার কাছে থাকতাম। আমি ক্লাস নাইনে খাস্তগীর গার্লস স্কুলে প্রথম যখন ভর্তি হলাম, তখন কাকারা সব বিপ্লবী দলেই ছিলেন। কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না এবং কাকাদের ইনফ্লুয়েন্স আমার ওপর খুব বেশি ছিল। দুই কাকাই দীর্ঘদিন জেল খেটেছিলেন। মনোরঞ্জন চৌধুরী আর প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী। তাঁরা বেরিয়ে এলেন অ্যান্টিকমিউনিস্ট হয়ে।

কাকারা যখন জেলে যান, তখন আমি ছোট। আমার ১৩-১৪ বছর বয়সে তাঁরা জেলে যান। যখন ফিরে আসেন, আমি তখন বিএ পড়ি। তখন থেকে, মানে বলতে পারো যে তাঁদের এক্সপেরিয়েন্সটাই বা আদর্শটাই খানিকটা জেনে, খানিকটা না জেনে গ্রহণ করি। এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে। সেটা হচ্ছে, আমি যখন কলকাতার বেথুন কলেজে পড়ি ১৯৩৭ সালে, তখন আন্দামান সেলুলার জেলে[১] একটা অনশন ধর্মঘট হয়। বিরাট সে ধর্মঘট। সেই ধর্মঘটে বন্দীদের ওপর সাংঘাতিক অত্যাচার করেছিল ব্রিটিশ শাসকেরা। তখন তাঁদের সমর্থনে সারা ভারতে একটা সার্থক স্ট্রাইক হয়। এটা বলছি ১৯৩৭-৩৮ ইনফ্যাক্ট '৩৭-ই বোধ হয়। এটা আমার বইয়েও আছে। সেই স্ট্রাইকটা আমি বেথুনে অর্গানাইজ করি।

বেথুনে আমি অর্গানাইজ করি, মানে মেয়েদের বলি, চলো, আমরা এক দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক করি। বলি যে, এক দিন দুপুরবেলা আমরা খাব না। তো, এক দিন দুপুরবেলা দুটো হোস্টেলের সব মেয়ে খেল না। তিন-চারটি মেয়ে খেল। আর বেশির ভাগ মেয়ে খেল না। তখন প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে খুব ধমকালেন। বললেন, 'আমি জানি তুমি চাটগাঁয়ে এ রকম করতে। তুমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলে। অল্প বয়স থেকে তুমি রাজনীতি করতে। আমার এখানে এসব চলবে না। তোমাকে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হবে', বলে আমাকে বেথুন কলেজের হোস্টেল থেকে বের করে দিলেন। তখন সামনে বিএ পরীক্ষা। টেস্ট পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হলাম। অনার্সও ছিল ইংলিশে। কিন্তু হঠাৎ আমাকে হোস্টেল থেকে বিতাড়িত করায় চট্টগ্রামে গ্রামের বাড়িতে এসে থাকতে হলো। কারণ, তখন বাবা নেপালের কাঠমান্ডুতে। চট্টগ্রামের বাড়িতে বইপত্র নেই। আমি অনার্স দেব না ঠিক করলাম এবং অনার্স দিলাম না। আমি বিএ পাস পরীক্ষা দিলাম। তারপর বাবা ঠিক করলেন, একগাদা ছেলেপুলে বাড়িতে, কেউ এমএ পড়ে, কেউ বিএ পড়ে...কেউ নাইনে পড়ে। তাদের সবার জন্য একটা বাসা ঠিক করলেন ঢাকার দয়াগঞ্জ রোডে। ৩৯ নম্বর দয়াগঞ্জ রোডে। বাসাটা আমি দেখে এসেছি কয়েক বছর আগে। সেই বাসায় আমরা একগাদা ছাত্রছাত্রী। প্রায় সাতজন। বাবার কাকার ছেলে, পিসির ছেলে ইত্যাদি মিলিয়ে এমএ ক্লাস থেকে শুরু করে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত সাত-আটজন ছাত্রছাত্রী সেখানে থাকি। সেখানে আমি ইনফ্লুয়েন্সড হই একজন কমিউনিস্ট নেতার সাহচর্যে এসে। অমূল্যচন্দ্র[২] তাঁর নাম ছিল। স্কুলশিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের এই পুরো বাড়ির এই গ্রুপকে প্র্যাকটিক্যালি কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করেন। আমরা সাতজন না আটজন ছিলাম, মনে পড়ছে না। কখনো থাকতাম, কখনো থাকতাম না।

মালেকা : কোনো মেয়ে ছিল আর?

নিবেদিতা : আমরা তিন ভাইবোন ছিলাম। আমার পিসতুতো ভাই ছিল। সে পরবর্তীকালে এনবিএতে কাজ করেছে। দিল্লিতে এনবিএতে কাজ করত। আমার কাকা ছিলেন অরবিন্দু চৌধুরী। তারপর আমার খুড়তুতো ভাই ছিল। সে এখন মারা গেছে। চট্টগ্রামের বাড়িতেই ছিল। তারপর আমার ছোট বোন, সে ছিল। আমরা সবাই ইনফ্লুয়েন্সড হই।

মালেকা : ছোট বোনের নাম কী?

নিবেদিতা : মুকুলিকা বসু।

মালেকা : উনি কোথায়? এখন কোথায় থাকেন?

নিবেদিতা : মারা গেছে। আমার ভাইবোন কেউ নেই। আমার তিন ভাইবোনের মধ্যে আমিই আছি।

এসব ব্যাপারে তারা খুব সাহায্য করত এবং ওই সময়ই পুলিশের গুলিতে মারা যান অমিয়া দত্ত[৩]। এখানে, মানে কলকাতায়। অমিয়া দত্ত ঢাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি।

মালেকা : এটা বোধ হয় ১৯৪৩ সালের কথা?

নিবেদিতা : হ্যাঁ '৪২-'৪৩ সালে হবে।

মালেকা : ঢাকায় যে আপনি আত্মগোপনেরও আগে থাকতেন, সে কথা জানতে চাই।

নিবেদিতা : সেটা তো অন্য কথা।

মালেকা : হ্যাঁ তারা কারা? এই যে আত্মগোপনের পরিবারগুলো, সে বিষয়ে জানতে চাই।

নিবেদিতা : আত্মগোপনের পরিবারের মধ্যে...তখন খুব আত্মগোপনের দরকার ছিল না তো। কমিউনিস্ট পার্টি তো ওপেন ছিল। কারণ, সেটাও একটা মজার ব্যাপার। তখন আমরা মিত্রশক্তি, ইন্টারন্যাশনাল সিচুয়েশনটা ছিল জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াই এবং আমাদের সাপোর্ট ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইংরেজরাও সাপোর্ট করত। আমাদের সাপোর্টও খানিকটা চলে গেল ইংরেজদের পক্ষে। এতে আমরা খুব আনপপুলার হয়ে গেলাম। কারণ, অলরেডি একটা অ্যান্টিব্রিটিশ আন্দোলন চলছে এবং মানুষের ভেতরে একটা অ্যান্টি-অ্যাটিচিউট ডেভেলপ করে গেছে। সে জায়গায় আমরা বলছি মস্কোর ব্যাপারে, রাশিয়ার ব্যাপারে আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে আছি। এটা আমাদের ঢাকাইয়া ভাষায় বলে, 'মাইনকা চিপায় পইড়া যাওয়া। ঢাকাইয়া ভাষায় বলে মাইনকা চিপা,' অর্থাৎ এটা খুব কঠোর একটা অবস্থার 'মইধ্যে পইড়া গেলাম'। কারণ, তখন আমরা ডাইরেক্টলি, প্র্যাকটিক্যালি ব্রিটিশকে সাপোর্ট করছি, যখন দেশের ভেতরে সুভাষ চন্দ্রের ভীষণ প্রভাব এবং অ্যান্টিব্রিটিশ সেন্টিমেন্ট সাংঘাতিক প্রবল, আমরা তখন পুরো ব্রিটিশ। কারণ, ব্রিটিশরা রাশিয়ার পক্ষে।

অমিয়াদি তো রেগুলার, মানে ঢাকায় থাকতে পার্টির গোপন আস্তানা 'কমিউনে' ছেলেদের জন্য রান্না করে পাঠাতেন। এত মাছ, সবজি রাঁধতেন বাসায়, বাড়িতে খেতে বসে কেউ একটার জায়গায় দুটো ভাগ চাইলে তখন অমিয়াদি বলতেন, নাই তো। বলতেন, এতগুলো খাইয়া ফালাইছ। আসলে অমিয়াদি সেগুলো কমিউনে পার্টিকে পাঠাতেন।

মালেকা : তাঁর স্বামীও তো পার্টির সমর্থক ছিলেন?

নিবেদিতা : স্বামী সদস্য ছিলেন না। কিন্তু ভাই রবি গুহ[৪] খুব সমর্থন করতেন। রবি গুহ স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সেক্রেটারি ছিলেন। একদম প্রথম যখন স্টুডেন্ট ফেডারেশন হয়, তখন রবি গুহ তাঁর সেক্রেটারি ছিলেন। সেই রবি গুহর দিদি হচ্ছেন অমিয়াদি। অমিয়াদি কলকাতায় চলে যান এবং আন্দোলনে পুলিশের

গুলিতে মারা যান। অমিয়াদি ও শিখা গুহ দুজনই সাংঘাতিক ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন রবি গুহর দ্বারা। পরে দুজনে সারা জীবন কমিউনিস্ট পার্টি করে গেছেন। ঢাকাতেই পার্টির সঙ্গে ছিলেন। পরে তো কলকাতায় চলে এলেন বাধ্য হয়ে।

মালেকা : পার্টির পুরুষেরা মনে করত বিয়ে করলে দলের জন্য ভালোভাবে কাজ করা যায় না। আমি অনেককে জানি যেমন অনিল মুখার্জি[৫] বিয়ে করেননি, মণিদা[৬] তো পরে করলেন। আরও কে...জ্ঞানদা[৭] করেননি, এ রকম গণেশদা[৮] করেননি। আপনার কী মনে হয়? সে রকম কি মেয়েরাও অবিবাহিত ছিলেন?

নিবেদিতা : হ্যাঁ, মেয়েরাও ছিলেন। যাঁদের মধ্যে তিনজনকে আমি খুব ভালো চিনি। একজন শিখা গুহ, একজন হেলেনা দত্ত[৯], একজন নীলিমা বসু। তাঁরা পরস্পর বন্ধু ছিলেন।

মালেকা : হেলেনা দত্ত পূর্ববঙ্গের?

নিবেদিতা : ঢাকারই মেয়ে। হেলেনা দত্ত বিয়ে করেছিলেন পরে। নীলিমা বসু করেননি। তাঁরা অবিবাহিত থেকেই পার্টির কাজ করে গেছেন।

মালেকা : আপনি কি মনে করেন বিয়ে নারী বা পুরুষের রাজনৈতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা জীবনের জন্য বাধা?

নিবেদিতা : একেবারেই না। বরং অনেক হ্যাপি লাইফ হয়। কমিউনিস্ট দম্পতিদের যতজনকে দেখেছি, যথেষ্ট সুখী তাঁরা। বিয়ে না করাটা খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জ্ঞান মুখার্জির মতো লোক—তারপর আমাদের বড় ভাইও (মণি সিংহ) তো অনেক দিন বিয়ে করেননি। তারপর অনিল মুখার্জি বিয়ে করেননি। তাঁরা তো জানপ্রাণ দিয়ে পার্টির জন্য করেছেন। তখন একটা ট্রেন্ড ছিল, বিয়ে না করলে ভালো হয়। কিন্তু দ্যাট ওয়াজ প্রুভড টু বি রং।

মণিদার ছেলে দিবালোক সিংহ তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমার একটি ক্যাডারকে পাবে, যে আজীবন পার্টি করে গেছে। গোপনে পার্টিকে সাহায্য করে গেছে। দুজনকে পাবে। একজনের ডাকনাম ফুলটুস, ভালো নাম শিরিন। আরেকজনের ডাকনাম আশু, ভালো নাম মমতাজ। এই দুজন সম্পর্কে ডিটেইল জানতে পারবে মণিদার ছেলে টুটুলের (দিবালোক সিংহ) কাছ থেকে।

মালেকা : ওরা কি খালি রান্নাবান্না, খাওয়া...

নিবেদিতা : না না, ওরা রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাপনা ছাড়াও প্রটেকশন দেওয়া, লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করেছে।

মালেকা : ও রকম কাজ তো ছেলেরাও করত?

নিবেদিতা : হ্যাঁ, ছেলেরাও করত। চিঠিপত্র এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যাওয়া। আরও খুঁটিনাটি অনেক কাজ করত। আমরা একসঙ্গে জেলে গেলাম। এক মা আর

তাঁর সঙ্গে তিন মেয়ে। সুদেবী মুখার্জি, কল্যাণী মুখার্জি, মনীষা মুখার্জি; আর একটা নাম ভুলে গেছি। আমার বইটাতে আছে বোধ হয়। তবে এটা ঠিকই, সমিতির মিটিং খুব বড় করতে পারতাম ঠিকই, কিন্তু সমিতির সভ্য খুব বেশি করতে পারতাম না।

মালেকা : সভাগুলো কীভাবে আয়োজন করতেন?

নিবেদিতা : সভাগুলো পার্টির ছেলেরাই ঘোরাঘুরি করে আয়োজন করত। নারায়ণগঞ্জে খুব বড় একটা সমাবেশ করেছিলাম।

মালেকা : কোথায়?

নিবেদিতা : নারায়ণগঞ্জে। একটা কনফারেন্স করেছিলাম। মহিলা সমিতির। তখন নামটা ছিল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'।

মালেকা : পার্টি আয়োজন করত। এটার সদস্য...?

নিবেদিতা : সদস্য ঠিক করতে পারতাম না। তার ভেতর থেকেই দু-একজন বেরিয়ে যেত। চিনেন, মালা, যার স্বামী ছিল শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট। কী যেন নাম মালার স্বামীর?

মালেকা : ভুলে গেছি। আছে বইয়ে লেখা।

নিবেদিতা : পরে এমপি হয়েছিল।

মালেকা : হেনাদির[১০] সঙ্গে কাজ করতেন। লক্ষ্মীবাজারে ছিল শিক্ষক সমিতির অফিসটা।

নিবেদিতা : হ্যাঁ, এইটা আমরা একটা ডেন হিসেবে ব্যবহার করতাম আগে। পরে শিক্ষক সমিতির অফিস হয়েছে।

মালেকা : এই ডেনের মালিকেরা?

নিবেদিতা : এই ডেনে থাকতাম বড় ভাই, মানে আজাদ (টেক নাম), মণি সিংহ, নেপাল নাগ। ইলার হাজব্যান্ডের নাম কী যেন...? ফরটি থ্রির পরে আমি ওপেনে কাজ করেছি ফরটি নাইন পর্যন্ত। নারায়ণগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম, সেটা তো '৫০ সালে। আন্ডারগ্রাউন্ডে যাই আমি জেল থেকে বেরিয়ে '৫০-এর মাঝামাঝি।

মালেকা : আপনার এই আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়াটা হচ্ছে পার্টির কারণে। নাকি ওই যে জেল থেকে বেরোলেন, তারপর যদি আবার ধরা পড়েন আপনার অ্যাক্টিভিটিসের জন্য সেটা এড়াতে?

নিবেদিতা : তখন আমি অর্ধমৃত অবস্থায় বেরিয়েছি। আমাকে বের করে দিয়েছিল কেন জানো? একটা কলেজের প্রিন্সিপাল জেলের ভেতর মারা যাবে। নুরুল আমিন তখন প্রধানমন্ত্রী। নুরুল আমিন আবার আমার বাবার (বিপ্লবী সূর্য সেনের সহপাঠী অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার চৌধুরী) ছাত্র, ঢাকা ইউনিভার্সিটির। বাবা নুরুল আমিনকে লিখেছিলেন, এটা তোমার একটা কলঙ্কের কারণ হবে। আমার মেয়ে যদি জেলখানায় এভাবে মারা যায়।

মালেকা : বাবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন?
নিবেদিতা : তখন নুরুল আমিন বাবার খুব ফেবারিট ছাত্র ছিলেন। সেই বহু আগে। তখন আমার বাড়ির চারদিকে পুলিশ পাহারা থাকত। আমি বাড়ির পেছন দিয়ে বোরকা পরে...আমাদের বাড়ির পেছনে একটা বাড়ি ছিল, তারা আমাদের...মন্টু[১১]। মন্টুর নাম শুনেছ তুমি?
মালেকা : হ্যাঁ হ্যাঁ...।
নিবেদিতা : মন্টুদের বাড়ির ভেতর দিয়ে ওই সময় মন্টুর মায়ের বোরকা পরে পেছন দিয়ে আমি আগারগাঁও চলে যেতাম।
মালেকা : মন্টু খানের বোন...?
নিবেদিতা : ও কিন্তু আমাদের সাপোর্টার ছিল।
মালেকা : ওই যে কী আপা যেন? ওই যে পাসপোর্ট অফিসে কাজ করতেন ওনার স্বামী। বাহাউদ্দিন আহমেদ।
নিবেদিতা : হ্যাঁ হ্যাঁ। কী যেন ভুলে গেছি আমি। ডলি।
মালেকা : *দৈনিক বাংলায়* চাকরি করতেন। ওই পরিবার পুরাটাই কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সাপোর্ট করত।
নিবেদিতা : আমি যখন অ্যারেস্ট হলাম, তখন আমার ছেলে তো তখন...মন্টুদের বাড়িতে ওরাই তখন রেখেছিল আমার ছেলেকে। পরে বাবা কলকাতায় লোক পাঠিয়ে নিয়ে যায়। মেয়েরা রাজনীতি করে। একেবারে গৃহস্থালি পুরোপুরি করলে তো তারা রাজনীতি করতে পারবে না। তাদের খানিকটা ছাড়তেই হবে। কাজেই সেই ছাড়াটা সার্টিফায়েড বলেই আমি মনে করি। যেমন আমার ছেলেকে ছেড়ে না থাকলে আমি রাজনীতি করতে পারতাম না। আমার মেয়েকে ছেড়ে না থাকলে আমি রাজনীতি করতে পারতাম না। কাজেই ছেলেমেয়েকে আঁকড়ে ধরে থাকব, আবার রাজনীতিও করব, দুটো কঠিন। বিশেষ করে অপজিশনে থেকে রাজনীতি। গভর্নমেন্টে থেকে রাজনীতি করা, সেটা আলাদা। কিন্তু গভর্নমেন্টের অ্যাগেইনস্টে যাচ্ছি আর ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করব, এটা অবাস্তব। এটা হয় না। কাজেই ছেলেমেয়েকে ছেড়ে, সেই দুঃখটা সহ্য করেই রাজনীতি করতে হবে।
মালেকা : কখনো কি আপনার চোখে পড়েছে বা জানেন, ওই যে একটা বললেন অমিয়াদির ব্যাপারটা। তাঁর স্বামী রাজনীতি করতেন না। কিন্তু বাধাও কি দিতেন?
নিবেদিতা : বাধা দিতেন না। বলতেন, ও পাগল, যা খুশি করুক। কেউ এটা ভাবত না। তারপর অমিয়াদির স্বামী, উনি পাগল মনে করতেন না। মনে করতেন, বেশি সেয়ানা। ভাইদের পরামর্শে চলে। কিন্তু সাপোর্ট করতেন না। অমিয়াদির স্বামী একদমই পছন্দ করতেন না।
মালেকা : তখন তাঁদের প্রাইভেট লাইফ কী হতো?

নিবেদিতা : একসঙ্গে থাকতেন তো। ছেলেমেয়েও হয়েছে। দুটি মেয়ে ছিল অমিয়াদির। একটি মেয়ে মারা গেছে। কলকাতায় তো এলেন পার্টিশনের পরে। ঢাকায় তো আমাদের সঙ্গে সেল মিটিং, ডেন মিটিং করতেন। ঢাকাতেই পার্টির ব্যাপারে সঙ্গে ছিলেন অমিয়াদি।

মালেকা : ওই সময়ের পার্টির কথাটা একটু বলেন তো?

নিবেদিতা : ওই সময়ে পার্টিতে ছিলাম আমরা পাঁচজন না ছয়জন মেয়ে। দাঁড়াও, নাম মনে করছি—হেলেনা বসু, নীলিমা বসু, ডলি বসু, আরেক নীলিমা বসু, একজন নীলিমা সেন, আমি ও নিরুপমা গুপ্ত।

মালেকা : তার মানে আশালতা সেনেরও[১২] পার্টির সঙ্গে যোগ ছিল?

নিবেদিতা : না, আশালতা সেন অনেক উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আশালতা সেনের পাড়া গেন্ডারিয়াতেই আমার স্বামী নেপাল নাগ[১৩], বঙ্গেশ্বর রায়, বিনয় বোস[১৪]—তাঁরা আশালতার ইনফ্লুয়েন্সেই কংগ্রেসে আসেন। পরবর্তীকালে তিনজনই কমিউনিস্ট হয়ে যান। তিনজনই আশালতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মালেকা : আশালতা সেনের শিষ্য মানে গান্ধীজির অনুসারী?

নিবেদিতা : আশালতা সেন নাকি তখন এক্সিবিশন-টেক্সিবিশন করতেন। তখন তাঁরা নাকি খুঁটি পুঁততেন। এক্সিবিশন সাজাতেন। অল্প বয়সের ছিলেন তো।

মালেকা : আশালতার বইয়ে আছে। মনে পড়ে। বঙ্গেশ্বর রায়ও লিখেছেন।

নিবেদিতা : আশালতা সেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন সবাই। এমনকি ওনার যখন ৯০ বছর পূর্তি হলো, আমি নিমন্ত্রিত হলাম দিল্লিতে। সেই ওনার ফাংশনে (জন্মদিনের অনুষ্ঠানে) থাকার জন্য। তখন আমার স্বামী মারা গেছেন। আর না হয় আমাদের দুজনেরই নিমন্ত্রণ থাকত ওনার জন্মদিনে। তাঁর ৯০তম জন্মদিনে আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'নেপাল তো নেই, তুমি এসো আমার জন্মদিনে।' আমি গেলাম দিল্লিতে। একটা পারিবারিক রিলেশন ছিল আশালতার সঙ্গে। উনি খুব উদার প্রকৃতির ছিলেন। হিংসা বলে কোনো জিনিস ছিল না। এ কমিউনিস্ট, সে কংগ্রেসি, এটা উনি ভাবতেন না। এরা ভালো কাজ করে, দেশের কাজ করে—এটাই ওনার ক্রাইটেরিয়া ছিল। কোন দল করে, সেটা উনি অতটা দেখতেন না।

মালেকা : আশালতা সেন তো কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন, কমিউনিস্ট তো আর হননি।

নিবেদিতা : না না, কোনো দিনই না।

মালেকা : কিন্তু উনি নাকি ওনার বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। আমাদের সময়ে পুলিশের ওয়ারেন্ট থাকা ছাত্রদের উনি আশ্রয় দিতেন।

নিবেদিতা : হ্যাঁ, তাঁরাও তো (নেপাল নাগরা) আশালতার বাড়িতেই থাকতেন। লীলা নাগ[১৫] ভাবতেন, আমরা মানে, কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সমিতি এ রকম একটা...। কী বলব, ঠিক শত্রুতা না। অপজিশন আরকি। লীলা নাগের বিরুদ্ধে

আমাদের সমিতি—এ রকম ভাবতেন।

মালেকা : কিন্তু সুফিয়া কামালকে তো উনি খুব টেনে নিয়ে এলেন?

নিবেদিতা : সেটা পরে। দাঙ্গার সময়...। একসঙ্গে সুফিয়া কামাল, আমি, লীলা নাগ জাস্ট আফটার পার্টিশন। একটা গাড়িতে, গাড়ি তো না, তোমার ওই যে খোলা ট্রাকগুলো। একটা ট্রাকে করে আমরা ঘুরে বেড়ালাম। যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয়। আমি কমিউনিস্ট পার্টির মেয়ে হিসেবে, লীলাদি লীলাদি হিসেবে, সুফিয়া কামাল সুফিয়া কামাল হিসেবে—আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। সেটা জাস্ট আফটার পার্টিশন। তখন থেকেই আমার সুফিয়া কামালের সঙ্গে পরিচয়। তারপর আন্ডারগ্রাউন্ডে সুফিয়া কামালের বাড়িতে গিয়ে চাল পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। বলেছি, 'আপা, আমাদের ঘরে চাল নেই, রাত্রি বেলা কী খাব।' আপা চাল দিয়ে দিয়েছেন। আরেকজনের কথা জানো না তোমরা। সে হচ্ছে খুব বড় আর্টিস্ট জয়নুল আবেদিনের স্ত্রী। জাহানারা আবেদিন। সে আমার ছাত্রী।

মালেকা : ওনাদের বাড়িটা তো ছিল...ওনার ভাইবোনেরা তো...

নিবেদিতা : হ্যাঁ, ওনার ভাই পার্টিতে ছিলেন। পরে বিলেতে চলে যান।

মালেকা : জয়নুল আবেদিনের স্ত্রী আপনার ছাত্রী?

নিবেদিতা : হ্যাঁ, যখন মুসলিম গার্লস স্কুলে পড়াই তখন। তারপর ঢাকাতে লাস্ট যেবার গেলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস ঘোষণা করল, তখন আমি ঢাকা গেলাম। তখনো ও এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

মালেকা : উনি আছেন এখনো। সেদিনও দেখা হলো।

নিবেদিতা : খানিকটা মিষ্টিআলু, খানিকটা বেগুন, মানে বাজার যা ছিল, উপুড় করে আমাকে দিয়ে দিল একেবারে। বলল, 'বাজার নিয়ে যান, আপনাদের তো খাওয়ার অসুবিধা।' একটা শিশিতে করে সরষের তেল দিয়ে দিল। বুঝলা, এ রকম। কত লোককে যে কতভাবে সাহায্য করেছে। ভুলি না গো। বিপদের দিনেও তো করেছে। ও ঢাকায় দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। কী খুশি আমাকে দেখে। ও বলল, আচ্ছা আপা, আপনাকে যে এইসব দিতাম। মিষ্টিআলুগুলো দিতাম। আপনি কিছু মনে করতেন না? আমি বলতাম...(হাসি)। বাজারের যা ছিল, সব ঢাইলা দিয়া দিত।

মালেকা : বিয়ের পরে?

নিবেদিতা : হ্যাঁ। শান্তিনগরে থাকত। তখন আমার খুব বন্ধু ছিলেন একজন।

মালেকা : আপনার বইয়ে যদি পাই। আপনি ঘটনাটা বলেন, তখন আপনি পড়ান নাকি পড়তেন?

নিবেদিতা : পড়াই তখন। মুসলিম গার্লস হাইস্কুলে রানুর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওই যে জয়নুল আবেদিনের বউয়ের সঙ্গে। এরপর আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের কমরেড মোমিন সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম, ইশ্ নামটা...হাসিনা। হাসিনা মোমিন।

মালেকা : আছেন কি উনি?

নিবেদিতা : না, ও নাই। আরে, হাসিনা আর হাসিনার বোন—দুজনের মায়ের সম্পত্তি পাওয়ার জন্য হাসিনার দুলাভাই হাসিনাকেও বিয়ে করবে। কিন্তু হাসিনার একদম ইচ্ছে নেই তাকে বিয়ে করার। আমি তখন ওই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। আমার কাছে কেঁদে কেঁদে এসে বলে যে আপা, আমাকে বিয়ে করবে শুধু মায়ের সম্পত্তিটা পাওয়ার জন্য। আমার একদমই ইচ্ছে নেই। ও তখন গ্র্যাজুয়েট। অ্যাডাল্ট। মা কি তাকে জোর করে বিয়ে দেবে? ওর দিদি লেখাপড়া না জানা মেয়ে। দিদির তখন তিনটা ছেলেমেয়ে। তখন বিয়ে দেবে বুঝলে। সেই হাসিনাকে আমি কমিউনে লুকিয়ে নিয়ে এলাম। আমি তো ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিলে। কলকাতায় নিয়ে এলাম। তারপর আমার যখন বিয়ে হলো, বিয়ের পর আমি কলকাতায় বাসা করলাম। আমি যখন বাসা করলাম, তখন হাসিনাকে বললাম, দু-এক মাস তুই বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখ, আমি যখন বাসা করব, তখন তোকে নিয়ে যাব।

মালেকা : বন্ধু ছিল?

নিবেদিতা : বন্ধু না, আমার অনেক পরিচিত। হাসিনাকে আমি নিয়ে এলাম। তারপর তো ওর জামাইবাবু ওকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছিল। সেই খোঁজাখুঁজি, পুলিশে খবর, হ্যানাত্যানা নানা কিছু করতে লাগল। কিন্তু ওরা ভাবতেই পারেনি আমার সঙ্গে আমি কলকাতায় নিয়ে এসেছি। কাজেই ওরা ট্রেস করতে পারেনি। আমি এখানে এনে ট্রেড ইউনিয়ন লিডার মোমিন সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিই। এইখানকার ট্রেড ইউনিয়নের লিডার। খুব হ্যাপি কাপল ছিল। কলকাতাতে সমিতির কাজকর্ম করত। খুব জেনারাস টাইপের মেয়ে ছিল। তিনটি ছেলে হলো। একটি মেয়ে হলো। তারপর ওরা চলে গেল মধুগঞ্জে। কারণ, মোমিন সাহেব মধুগঞ্জের লোক ছিলেন। বাড়িঘর ছিল। নিজেদের সম্পত্তি ছিল। খুবই হ্যাপি হলো। একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল লাইফটা। মায়ের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে যোগাযোগ রাখত। পরে জামাইবাবু এসে আমাকে খুব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে একাকার। তারা বুঝল, আমি ছাড়া কে করবে আর এমন কাজ। একেবারে মেয়ে নিয়ে পালিয়ে আসা। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত হাসিনা আমার কাছেই ছিল। আন্ডারগ্রাউন্ডে আমাকে খুব সাহায্য করত ঢাকায়।

মালেকা : লিডার, পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড সাপোর্টার।

নিবেদিতা : কে?

মালেকা : এই যে মেয়েরা। এদের সঙ্গে আপনার...সাহায্য করা, সহযোগিতা করা, কীভাবে চলবে এসব? কেন নারী সমিতি করলেন? পার্টি কী বলেছিল?

নিবেদিতা : যেমন পার্টির লোকেরা ট্রেড ইউনিয়ন করে। কেন? একটা উদ্দেশ্য

আছে নিশ্চয়। মেয়েরা সমাজে যে বঞ্চিত, সমাজে যে তারা অনেক উপেক্ষিত, এটা তাদের বোঝানোর জন্যই সমিতি করা। তারা যাতে তাদের অধিকারগুলো ফিরে পায়। তখন তো আমাদের মতো মাথায় কাপড় দেয় না, সিঁদুর লাগায় না—এ রকম বিপ্লবী মেয়ে তো কম ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এসব কুসংস্কার থেকে মেয়েরা মুক্ত হোক। মূল বক্তব্যই ছিল যে কুসংস্কারমুক্ত হও। যত কুসংস্কারে আবদ্ধ রাখবে, তত নিজেকে গণ্ডির মধ্যে ফেলে রাখবে।

মালেকা : সিঁদুর দেয়-টেয় না, এটা হলো এই যে তাহলে আর বুঝতে পারবে না এরা মুসলমান না হিন্দু। এ জন্যই তো?

নিবেদিতা : হ্যাঁ।

মালেকা : সুফিয়া কামাল সম্পর্কে এবার বলুন।

নিবেদিতা : সুফিয়া কামালের সঙ্গে আমার ডাইরেক্ট পরিচয় ছিল না। তোমাকে তো বললাম, একবার গাড়িতে করে আমি, লীলা, সুফিয়া কামাল ঘুরেছিলাম শান্তি রক্ষার জন্য। তারপর আমরা যে কনফারেন্সটা করতে চেষ্টা করলাম মহিলা সমিতির, সেটা আর পুলিশ করতে দিল না। ময়মনসিংহে আমরা জড়ো হয়েছিলাম। সুফিয়া কামাল যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁকে আমরা প্রেসিডেন্ট করলাম। ঢাকা জেলা মহিলা সমিতি হলো, ময়মনসিংহ মহিলা সমিতি হলো। চট্টগ্রাম জেলা মহিলা সমিতি হলো। অনেক মহিলা সমিতি হলো। সব কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ।

মালেকা : ভিক্টোরিয়া পার্কের বিষয়ে আপনারা বললেন যে সেটা অ্যাকসিডেন্টালি ১১ সেপ্টেম্বর ছিল। জিন্নাহর জন্মদিন। ওইটা খেয়াল ছিল না। তখন এসে পুলিশ তাঁদের ধরল।

নিবেদিতা : আমাদের যে কী কষ্ট দিয়েছিল থানায় নিয়ে গিয়ে। হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। বড় কষ্ট হয়েছিল।

মালেকা : আপনার ইলা মিত্রের সঙ্গেও কি জেলে যোগাযোগ ঘটে?

নিবেদিতা : না। ইলা মিত্রের সঙ্গে আমার ডাইরেক্ট যোগাযোগ কমই ছিল। কলকাতায় চলে আসার পর যোগাযোগ হয়।

মালেকা : আমার মোটামুটি, যা আমি চাই, হয়ে গেছে। এখন আপনি যা বলেছেন, যা বলেননি, বইয়ে লেখেননি, এমন কিছু কথা যদি থাকে—মেয়েদের সংগঠন, পার্টিতে কাজ, আন্দোলনে কাজ বিষয়ে...

নিবেদিতা : মেয়েরা আগের চেয়ে এখন অনেক স্বাধীন। আমাদের যেমন ঘর থেকে বেরোতে হলে—আমার বয়স ২৪ বছর—অন্তত ৮ বছরের একটা ভাইকে হলেও, ছেলেকে হলেও আমার সঙ্গে কোথাও যেতে হতো। এখন আমি একাই যেতে পারি। আমি ১৫ বছর হলেও একা যেতে পারি, ১৭ বছর হলেও একা যেতে পারি। এই যে সামাজিক কত বিধিনিষেধ। যেগুলো তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন

করেছিলাম, সেদিক থেকে আমরা খুব সাকসেসফুল। মেয়েদের অন্তত ওই যে ছেলেমেয়ে সমান, এই অ্যাটিচিউট আমরা অনেকটা আনতে পেরেছি। যার জন্য লেখাপড়াও মেয়েদের অনেক বেশি হচ্ছে। আগে শুধু ছেলেদের লেখাপড়া, ছেলেরাই লেখাপড়া শিখবে, তারাই বড় হবে—আমাদের সময় যেটা ছিল আরকি। কিন্তু পরবর্তী যুগে আমরা এই জিনিসটাকে সামাজিক দিক থেকে—আমি বলব, এটা মেয়েদের অনেক বড় একটা লড়াই এবং অবদান যে তারা নারী-পুরুষ একটা লেবেলে দাঁড় করাতে পেরেছে। অন্তত লেখাপড়া শেখানোর দিকটা। মধ্যবিত্ত সমাজে বলছি, একেবারে গরিব সমাজে বলছি না। এখানেও মেয়েরা খানিকটা স্বাধীনতা পেয়েছে আগের চেয়ে।

মালেকা : গরিব ঘরে তো আগের থেকেই স্বাধীন। তাদের তো কষ্ট। অর্থনৈতিক কষ্ট। সামাজিকটা নয়।

নিবেদিতা : মধ্যবিত্ত বাড়িতে (এই কষ্টটা আরও) ভয়ানক ছিল। আমার তখন বয়স ২২। আমার যদি কারও বাড়িতে যেতে হয়, বন্ধুর বাড়ি যেতে হয়, তাহলে আমার ৮ বছরের ভাইটাকে নিয়ে যেতে হবে। একা যেতে পারব না। এটা তোমরা ঠিক বুঝবে না।

মালেকা : এটা কি পরিবারের জন্য বলছেন না সমাজের জন্য?

নিবেদিতা : এই আন্দোলনগুলো হয়েছে বলেই হয়েছে। আন্দোলন না থাকলে এসব জিনিস হতো না। মেয়েরা এখন মাথায় কাপড় না দেওয়া, সিঁদুর না দেওয়া, শাঁখা পরতেই হবে বিয়ে হয়েছে—এগুলো খুব ছোটখাটো জিনিস, কিন্তু এগুলো তাড়াতে ফাইট করতে হয়েছে প্রচুর।

মালেকা : আপনারা তো দাঙ্গার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। আপনারা দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

নিবেদিতা : ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে তো সাংঘাতিক কাজ করেছি।

মালেকা : এবং তার সঙ্গে আমি একটু যোগ করতে চাই। আপনার কি কোনো কালচারাল মুভমেন্টের কথা মনে আছে। ওই যে ওই সময়ে...

নিবেদিতা : ওই সময় গণসংগীত ছিল, নাট্য সংঘ ছিল। নাটক করতাম। গান করতাম। গান তো চিরকালই করেছি।

মালেকা : একেবারে মঞ্চে?

নিবেদিতা : না, মঞ্চে গান করিনি আমি। মঞ্চে করিনি বললেও সত্যি কথা বলা হয় না। অনেক সময় মঞ্চেও করেছি।

মালেকা : কী রকম?

নিবেদিতা : রবীন্দ্রসংগীত করেছি। 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়', 'দে দে স্ট্যালিন ভাই, পায়ে পড়ি ছাইড়া দে...'। তখনকার খুব

নামকরা গান ছিল এটা। স্টালিন যখন হেরে যাচ্ছিলেন, তখনকার গান।

মালেকা : আচ্ছা দিদি, একটা খুবই পারসোনাল, এটা আপনি বলতেও পারেন, না-ও পারেন। সেটা হচ্ছে ওই যে '৫৫ সালে ফিরে এসে সিপিআইয়ে (এম) যোগ না দিয়ে সিপিএমে কেন গেলেন? এটা তো চীনপন্থী। আপনি এসে যোগ দিলেন যখন, তো একই পার্টি? তারপর তো ডিভাইডেড হলো, আপনি তো এই পার্টিতে এলেন। সিপিআইয়ে (এম) যাননি। কিন্তু দলগতভাবে সিপিআই (এম) কি আপনাদের গ্রহণ করল না? তখন কি দাদা বেঁচে নেই?

নিবেদিতা : হ্যাঁ বেঁচে ছিল। সে তো '৭৮ সালে মারা গেল।

মালেকা : পার্টি ডিভিশনের সময়? ডিভিশন তো হলো '৭০-এর আগেই বোধ হয়, না '৬৪-এ?

নিবেদিতা : সোভিয়েতপন্থী ছিলাম আমরা। মণি সিংহরা সোভিয়েতপন্থী হলো আর আমরা চীনাপন্থী হলাম। মোজাফ্ফর সাহেবরাও হয়ে গেলেন চীনাপন্থী।

মালেকা : কিন্তু আপনি, নেপালদা যখন ফিরে এলেন, ঢাকায় তো আপনারা সোভিয়েতপন্থী ছিলেন। এখানে এসে দেখি, অন্যদের চেয়ে এদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা বেশি। তারা কি আপনাকে গ্রহণ করেননি?

নিবেদিতা : তারা আমাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। আমি যেহেতু এখন অথর্ব...সেহেতু তেমন কিছু করতে পারি না। কিন্তু পার্টি মেম্বার ছিলাম সিপিএমেরই বরাবর। আমি ঢাকা থেকে আসার পরপরই সিপিএমের মেম্বার।

মালেকা : সেটা কি কাকাবাবুর জন্য?

নিবেদিতা : হ্যাঁ, কাকাবাবুর জন্য।

মালেকা : লিডার হিসেবে আপনি কাকাবাবুকেই...?

নিবেদিতা : আমি বরাবরই সিপিএমের। '৫৮ পর্যন্ত, এখনো যাই নাই। '৫৮ থেকে তো সামরিক শাসন।

মালেকা : পুরোটাই কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। পটভূমিকায় এই যে আপনারা যাঁরা এলেন, পার্টিটা তো ডিভাইডেড হয়নি তখনো। সুফিয়া কামাল, লায়লা সামাদ[১৬]।

নিবেদিতা : লায়লা আমার খুব ক্লোজড ছিল। পারসোনাল লাইফ সম্পর্কে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। লায়লাকে খুব ভালো জানি আমি।

মালেকা : বড়লোক ছিলেন খুব...?

নিবেদিতা : বড়লোক থাকলেও ওর একটা তুলতুলে নরম মন ছিল। ও কারও কষ্ট সহ্য করতে পারত না। হয়তো ওর বাড়ি থেকে...ঘরে কিছু নেই—এতটুকু সরষের তেল, কয়েকটা বড়ি, তা-ই দিয়ে দিল। বলত যে 'বড়িটা ভেঙে তরকারিতে দেবেন'। আরও কত কিছু দিত।

মালেকা : উনি নিজেও তো পার্টির সদস্য।

নিবেদিতা : হ্যাঁ, সদস্য ছিল এবং আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিকে যে কতভাবে সাহায্য করেছে, তা বলে শেষ করতে পারব না। কোনো অসুবিধা হলেই লায়লার কাছে চলে যেতাম। বলতাম, 'লায়লা, কালকে আমাদের তেল নেই রান্না করার। একটু তেল পাঠিয়ে দিয়ো।' তেল পাঠিয়ে দিল। আবার বলতাম, 'লায়লা, কালকে আমাদের কোনো খাবার নেই। একটু ডাল-খাবার পাঠিয়ে দিয়ো।' ডাল পাঠিয়ে দিত। মানে, লায়লার মনটা আকাশের মতো। লায়লার মনের মতো মন আমি দেখিনি।

মালেকা : এখনো তো ওনার হাজব্যান্ড সামাদ ভাই (মির্জা আবদুস সামাদ) বেঁচে আছেন। স্মৃতিভ্রষ্টের মতো। লায়লা আপার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারেন না। সব জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। উনি কিন্তু ডায়েরি লিখতেন। একটা ডায়েরিরও সন্ধান পেলাম না। মেয়েটাও (লিটা সামাদ) কিছু জানে না। স্বামীও কিছু জানেন না। (মির্জা আবদুস সামাদ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক। তিনি ২০১৫ সালের ২৯ মে মৃত্যুবরণ করেন।)

নিবেদিতা : পুরোনো দিনের লোকদের মধ্যে তো একমাত্র সামাদই ছিলেন।

মালেকা : কিন্তু ভুলে গেছেন সব। তবে লায়লা আপার মামাতো বোন হচ্ছেন তাসমিমা হোসেন টিপটিপ। বর্তমানে তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) ছেলে এবং *ইত্তেফাক* পত্রিকা ও *অনন্যা* ম্যাগাজিনের সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের (মঞ্জু) স্ত্রী। আমি ওনাকেও লাগিয়েছি যে লায়লা আপার যদি কিছু পাওয়া যায়।

নিবেদিতা : লায়লার বিষয়ে জানো। ওর মতো মেয়ে হয় না। কী যে উদার মনের মেয়ে। বিশেষ করে আমরা যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে, লায়লা যে কতভাবে সাহায্য করেছে। আরেকজন হচ্ছেন রোকেয়া রহমান কবির[১৭]।

মালেকা : আমার ওনার সঙ্গে পরিচয় ছিল।

নিবেদিতা : উনিও পার্টিতে খুব সক্রিয় ছিলেন। এই যে তসলিমা নাসরিন শেষে বেরিয়ে আসতে পারল। রোকেয়া আপার বাসায় ছিল। আর সে-ই রোকেয়া আপার বিরুদ্ধে কথা বলে। রোকেয়া আপা বলে যে তসলিমা এল, নানা রকম কথা বলে।

মালেকা : অরু হোসেন চৌধুরী। *সংবাদ*-এ যে লিখতেন।

নিবেদিতা : নামে চিনি। ও রকম পরিচয় ছিল না। ওনার স্ত্রী বিলেত থেকে এসেছিলেন। আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। এখানে পার্ক...। আমাকে একটা গরম বালেশ্বর দিয়েছিলেন। ওই একবারই দেখা হয়েছিল। এবার ঢাকা গিয়ে তাঁদের বাড়ি গেলাম। ওই যে কী চর যেন...। শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে তাঁদের বাড়িটা না। মারা গেছে, দেখা হলো না।

মালেকা : এ রকম আপনার যদি আর কিছু মনে হয় যে তাঁরা অল্প সময় সংগ্রাম করতে করতে গেলেন, লড়াই হলো, জেলে গেলেন, এলেন, নেপালদার

ভূমিকা—আপনার বইয়ে তো ডিটেইল আছে। আমি শুধু জানতে চাই, আর কোনো ব্যক্তির ভূমিকা আছে কি না। কামরুন নাহার লাইলীকে চিনতেন?

নিবেদিতা : না, তাকে আমি চিনি না। পরবর্তী সময়ে এসেছে। পার্টিশনের আগের কথা এবং '৫৫ পর্যন্ত আমি বলতে পারি, কিন্তু পরের কথা বলতে পারি না।

মালেকা : আপনি তো লায়লার কথা বললেন। লায়লা তো পার্টিশনের পরে।

নিবেদিতা : হ্যাঁ, পরে। লায়লার সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতাতেই। পরে ঢাকাতে।

মালেকা : সুফিয়া কামাল সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার নেই?

নিবেদিতা : না...

মালেকা : আপনি আমাদের মধ্যে থাকেন, এটা চাই। আমি খুবই আনন্দিত হলাম, খুশি হলাম এবং আপনাকে কষ্ট দিলাম। এবং আমি আবার ডকুমেন্টারি করে আপনাকে দেখাব। দেখে যদি মনে হয় আরেকটা লাইন ঢুকবে আর কিছু লাগবে, বলবেন। স্ক্রিপ্টে কি লিখব মেয়েদের প্রতি পার্টির ভূমিকাটা? এই যে জেলের মধ্যে...

নিবেদিতা : যে কমরেডরা জেলে ছিলেন, তাঁদের ওখান থেকে আমাদের কাছে একটা কেটলি আসত। চায়ের কেটলি। চায়ের কেটলির মুখে একটা কাগজে লিখে দিতেন তাঁরা কখন কী আন্দোলন করবেন। একটা রোল করা কাগজ থাকত। যাতে চা-টা গরম থাকে। সেই রোল করা কাগজ পেয়ে আমরা ঠিক করতাম কবে আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করব। তাঁরাই একই সময়ে করতেন। যোগাযোগটা আমাদের ওভাবে হতো। এটা অভিনব উপায় না?

মালেকা : এ রকম আরও দু-একটি উপায়ের কথা বলেন না।

নিবেদিতা : সব কি আর মনে আছে গো। আমরা তখন কাগজটা তোলার জন্য আগ্রহী হতাম। চা খাওয়া তো পরে।

মালেকা : আপনি তো ঢাকা জেলে ছিলেন?

নিবেদিতা : হ্যাঁ, আমি শুধু ঢাকাতেই ছিলাম। তবে হাঙ্গার স্ট্রাইকটা অনেক কষ্টের। এখনো পেটের গোলমালটা যায় না। আমার নাতি আমাকে বলে, 'আরও হাঙ্গার স্ট্রাইক করো! আরও হাঙ্গার স্ট্রাইক করো!' রমেনদা (রমেন মিত্র, ইলা মিত্রের স্বামী) বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমি কোনো কমরেডকে কখনো কাঁদতে দেখিনি। আর তাঁর মতো একটা বয়স্ক লোক এভাবে কাঁদছেন, আমার ভীষণ খারাপ লাগল। আমি আস্তে আস্তে গেলাম। বললাম, 'ভাই'—কী ভাই জানি বলতাম। সেজ ভাই না, কী জানি। ডাকলাম 'ভাই', চমকে উঠেছেন। বললাম, 'আপনার চোখে জল!' তারপর তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে বললেন, 'না, হঠাৎ মনটা খারাপ লাগছে।' তখন ইলা মিত্র ঢাকা হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থা। আর ঢাকা হাসপাতাল থেকে আমাদের বাড়িটা হলো খুব কাছে। এত কাছাকাছি, অথচ একজন আরেকজনকে দেখতে

পারছে না। একজন আন্ডারগ্রাউন্ড, একজন জেলে বন্দী। একটা অসাধ্য সাধন করেছিল নেপাল নাগ তখন। ওই হাসপাতালের দুজন নার্স আমাদের পরিচিত। সে-ই নার্সদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করেছিল, যাতে রমেনদা ইলাকে দেখতে যাইতে পারেন। ইলার তখন একেবারে এখন-তখন অবস্থা। কী ব্যবস্থা করল জানো। ওই আহমদুল কবির[১৮] সাহেব ছিলেন না? আহমদুল কবির সাহেবের গাড়িতে রমেনদাকে ডাক্তার সাজানো হলো। সাদা পোশাক। গলায় স্টেথো। লম্বা-টম্বা দেখতে তো, সুন্দর ছিলেন। ডাক্তার হিসেবে বেমানান হয়নি। আর গাড়ি করে নামলেন হাসপাতালের সামনে। নার্সরা আগেই প্রচার করে দিয়েছেন, একজন বিশেষ ডাক্তার আজ ইলাকে দেখতে আসবেন। আসলে সেই বিশেষ ডাক্তারটি হলেন রমেনদা। তো রমেনদা ভেতরে ঢুকলেন। ইলা তো জানে না। ইলা তো আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। আমাকে পরে এসে বললেন, রমেনদা হাতটা ধরতেই 'ইলা এই রকম কইরা চোখ তুইলা তাকাইছে। তাকাইয়া আমারে দেইখা বলছে, আমি কি স্বপ্ন দেখতেছি?' পরে তারা, মানে নার্সরা বাইরে এল। তারা খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলল। পরে রমেনদা বের হয়ে আহমদুল কবিরের গাড়িতে করে বের হয়ে এলেন। আর আমার প্রতি যে কী কৃতজ্ঞ।

নেপাল নাগকে বললাম, 'আমার লেপটা নিয়া যাইতেছ কই?' সুন্দর পোঁটলা করে বেঁধে সাইকেলে করে রওনা হয়েছে। তখন আন্ডারগ্রাউন্ড। আমি বললাম, কই লইয়া যাও? বলল, 'এর মধ্যে দুইটা কম্বল আছে।' বললাম, 'আমার কম্বলে হয় না, আমার লেপ লাগে।' লেপটা নিয়ে দিয়ে এল। কাকে দিয়ে এল লেপটা। শীতের দিন। মাঘ মাসের শীত।

তখন বোম্বে থেকে এক কমরেড এসেছে। বোম্বেতে শীত পড়ে না। রাত্রিবেলা দেখা করতে গিয়ে দেখে, একটা চাদর গায়ে দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। নেপাল নাগের খুব কষ্ট হলো। বলছে, 'দাঁড়াও, কালকেই ব্যবস্থা করতেছি তোমার।' আমাকে কিছু না বলে লেপটা দিয়ে এল। রাতের বেলা কম্বলের মধ্যে শুয়ে বলল, 'আর দুই-তিনটা দিন দেরি করো, মিলে খবর দিছি। মিলের কমরেডরা তোমারে লেপ বানায়া দিব।'

মিলের কমরেডরা ওয়্যারসহ বানিয়ে তিন-চার দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিল। আমি নেপাল নাগের মতো এ রকম কমরেড খুব কম দেখেছি। অনেক ছোটখাটো সমস্যা বুঝতেই দিত না। অথচ মানুষের ছোটখাটো সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করত। আমি খুব কম কমরেডকে এ রকম দেখেছি। কী দরদি যে ছিল!

জেলে পুলিশ একটা বুটে লাত্তি মেরেছিল এই জায়গাটায়। হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছিল, সবাইকে জোর করে খাওয়াত। আমি এ রকম উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। ওমা, ঢুকেই এক লাথি আমার কোমরে। সেই যে কোমর ভাঙল আমার, এখনো কোমরে আমার কষ্ট আছে।

টীকা

১. সেলুলার জেল বা কালাপানি

ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত একটি পূর্বতন কারাগার। ১৯০৬ সালে এই কারাগারের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বহু বিশিষ্ট আন্দোলনকারী, যেমন বটুকেশ্বর দত্ত, উল্লাসকর দত্ত ও বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে এই কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এখন এই দালান জাতীয় স্মৃতি স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একমাত্র সেলুলার জেলটিই পোড়ামাটির ইটে নির্মিত।

২. অমূল্যচন্দ্র অধিকারী (১৯০১-১৯৫১)

অমূল্যচন্দ্র অধিকারী ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব, অগ্নিযুগের বিপ্লবী এবং সাম্যবাদী চিন্তা ও আদর্শের অনুসারী। অমূল্যচন্দ্র অধিকারীর জন্ম বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার বাড়রী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শরৎচন্দ্র অধিকারী। তাঁর ছাত্রজীবন কাটে ঈশ্বরগঞ্জ ও কলকাতায়। অল্প বয়সে সেই বিপ্লবী 'অনুশীলন' দলের প্রবোধ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন।

১৯২২ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের প্রশংসাসূচক এক প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯২৪-২৮ ও ১৯৩০-৩৮ সালে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি জেলে ২০ বছর বন্দী ছিলেন এবং ৫০ দিন অনশন করেন। তাঁর উদ্যোগে দলের অধিকাংশ যুব কর্মী ও নেতাকে নিয়ে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি) গঠিত হয়।

১৯৪০ সালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। রাজনীতি, বিশেষ করে মার্ক্সীয় রাজনীতি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী নেতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

৩. অমিয়া দত্ত (১৯১৮-২৭ এপ্রিল ১৯৪৯)

বাঙালি স্বাধীনতাসংগ্রামের সক্রিয় কর্মী ও সমাজসেবী। অমিয়া দত্ত ১৯১৮ সালে বিক্রমপুরের (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলা) বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অমিয়ার ছোট ভাই রবি গুহ ছাত্রাবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ভাইয়ের কাছে তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের দীক্ষা নেন। গোপনে গোপনে পারিবারিক অনুশাসন উপেক্ষা করেই পার্টির কাজ করতে শুরু করেন। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে ১৯৪৩ সালে অমিয়া দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ওই বছর দুর্ভিক্ষের সময় ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অমিয়া দত্তের নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ত্রাণের কাজে সক্রিয় উদ্যোগ নেয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় অমিয়ার পরিবার ভারতে চলে যায়। প্রথমে হাওড়ার কদমতলায় ও পরে বাজেশিবপুরে বাসা ভাড়া করেন। সেখানে গিয়েও তিনি পার্টি এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের ডুবরী ভেরী গ্রামের আন্দোলনে অনেক কৃষক শহীদ হন। এই সময়ে ব্যাপক ধরপাকড়ে বহু কমিউনিস্ট কারারুদ্ধ হন। জেলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার দাবিতে তাঁরা জেলের ভেতরেই সংগ্রাম শুরু করেন। এ সময় তাঁদের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ২৭ এপ্রিল রাজবন্দীদের মর্যাদা ও মুক্তির দাবিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কলকাতার ভারতসভা হলে সমাবেশের আয়োজন করে। পরিকল্পনা মোতাবেক তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির উদ্দেশে ভারতসভা হল থেকে কয়েক শ মহিলার দৃপ্ত মিছিল বৌবাজার কলেজ স্ট্রিট সংযোগস্থলে উপস্থিত হলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে লতিকা সেন,

প্রতিভা গাঙ্গুলী, গীতা মুখোপাধ্যায়সহ অমিয়া দত্ত নিহত হন।

৪. রবি গুহ (১৯২৩-২০০২)

অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীর সন্তান রবীন্দ্রনাথ গুহ তাঁর দীর্ঘ জীবন ব্যয় করেছেন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং উদ্বাস্তু মানুষের বেঁচে থাকা ও শিক্ষা-অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। বালক বয়সেই সাম্যবাদে দীক্ষা নেন, মাত্র ১৬ বছর বয়সে লাভ করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র থাকাকালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় তাঁর বিরুদ্ধে।

১৯৪২ সালে ১৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি ঢাকার ২০ নম্বর কোর্ট হাউস স্ট্রিটের প্রতিরোধ পাবলিশার্স থেকে কমরেড অনিল মুখার্জির *সাম্যবাদের ভূমিকা* বইটি প্রকাশ। অন্যটি যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে ঢাকা শহরে ফ্যাসিবাদবিরোধী সভার আয়োজন; সে সভায় যোগ দিতে এসে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন কথাশিল্পী সোমেন চন্দ। পুলিশি নজরদারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের চেয়ে পৃথিবীর পাঠশালাতেই নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর প্রগতির সরণির মানুষের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, কাজী মোতাহার হোসেন, এ কে এম আহসান, আহমদুল কবির, সৈয়দ নুরুদ্দিন, নাজমুল করিম, মোজাফ্ফর আহমেদ, আখলাকুর রহমান, সরদার ফজলুল করিম।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, ১৯৪৫-এ চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঢাকা থেকে যোগ দিয়েছিলেন রবি গুহ। একই সালে নেত্রকোনায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে রবি গুহ যোগ দিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ বামপন্থী তরুণ তুর্কিকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি তাঁদের অধিকাংশের বুকের ভেতর সাম্যবাদের অগ্নিশিখা প্রজ্বালনে ভূমিকা রাখেন।

১৯৪৮ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে পূর্ববঙ্গের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে সরকারি আদেশে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত হন। পাড়ি জমান পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু আলোকমুখী লড়াই থেমে থাকল না তাঁর জীবনে। তিনি আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শিক্ষকতায়, প্রগতিশীল রাজনীতিচর্চায় আর সবার ওপরে মানব-হিতব্রতে। পূর্ব বাংলা আর বাংলাদেশ তাঁর ভাবনা থেকে কখনো দূরে থাকেনি। রবি গুহ ১৯৯০ সালে স্ত্রী নিশা গুহসহ বাংলাদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন, ফিরে গিয়ে সরদার ফজলুল করিমকে লিখেছেন, 'এককথায় ঢাকা যাওয়ায় আমার তীর্থ দর্শন হলো। এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার।' (সূত্র : পিয়াস মজিদ, *প্রথম আলো*; ২৫ নভেম্বর ২০১৭)

৫. অনিল মুখার্জি (১০ অক্টোবর ১৯১২-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২)

বাংলাদেশি কমিউনিস্ট বিপ্লবী ও লেখক। ঢাকার মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৩০ সালে কলেজে পড়ার সময় আইন অমান্য করে আন্দোলন করায় কারারুদ্ধ হন। মেদিনীপুর জেলে থাকার সময় সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আন্দামানে সেলুলার জেলে প্রেরণ করে। ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৬-এ নারায়ণগঞ্জ সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটে বিশেষ

ভূমিকা নেন। দেশ বিভাগ হলে পূর্ব পাকিস্তানে আট বছর জেলবন্দী থাকেন। মুক্তি পেলেও রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয় ১৯৭১ সাল অবধি। গোপনে মস্কো সফর এবং পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে ৭৫টি পার্টির মহাসম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৭৩ ও ১৯৮০ সালে।

৬. মণি সিংহ (২৮ জুলাই ১৯০১-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯০)

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মণি সিংহ ১৯০১ সালের ২৮ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমান নেত্রকোনা) সুসং দুর্গাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতায় যান। কলকাতায় ১৯১৪ সালে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠী অনুশীলন দলে যোগ দেন। এক দশক পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ত্যাগ করে ১৯২৫ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯২৮ সালে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে কেশরাম কটন মিলে শ্রমিকদের ১৩ দিনব্যাপী ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে দাবি আদায়ের মাধ্যমে মণি সিংহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রথম সফলতা অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সুসং দুর্গাপুরে আসেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি এখানকার কৃষকদের সংগঠিত করে টংকপ্রথার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কিষান সভার মহাসম্মেলনের তিনি অন্যতম সংগঠক ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর মণি সিংহ পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ময়মনসিংহ জেলার হাজং কৃষকদের নিয়ে আবার টংকপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন সশস্ত্র রূপ পরিগ্রহ করলে পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালে টংকপ্রথা বাতিল করে এবং মণি সিংহের ওপর হুলিয়া জারি করে তাঁর সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে নেয়।

১৯৫১ সালে মণি সিংহ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালে গোপনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তিনি আবারও সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৮ সালে গোপনে অনুষ্ঠিত পার্টির কংগ্রেসে তিনি তৃতীয়বার পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

চীন ও সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্যের কারণে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতিতে ভাঙনের পর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। মুক্তিলাভের কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৭ এপ্রিল সাধারণ কয়েদিদের সহায়তায় তিনি রাজশাহী কারাগার থেকে বের হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে মণি সিংহ পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি বাকশালে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি পুনরায় পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। দুই খণ্ডে রচিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *জীবন সংগ্রাম* সমকালীন রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। [সূত্র : বাংলাপিডিয়া]

৭. জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৯-৩ অক্টোবর ১৯৭০)

জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী। জ্ঞানচন্দ্র মজুমদারের জন্ম বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার রায়পুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। তিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম শীর্ষনায়ক ছিলেন। ১৯০৬ সালে এন্ট্রান্স পাস করে ঢাকা কলেজে পড়ার সময়ে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি মিত্রের সংস্রবে আসেন এবং তিনিই সমিতির প্রথম সদস্যরূপে বিধিবদ্ধ শপথ গ্রহণ করেন। ১৯০৬-১০ সালে সমিতির সব গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে, ঢাকার ব্রাহ্য রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনা। এই বিপ্লবী কাজের মধ্যেও তিনি ১৯১০ সালে বিএসসি পাস করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে এমএসসি পড়ার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুলিশি তৎপরতার জন্য তাঁর পড়া শেষ হওয়ার আগেই ১৯১৬ সালে তিন ধারার আইনে আটক থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ সালে ছাড়া পেয়ে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহ জেলায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলে বহু বছর তার সম্পাদক এবং পরে সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। ১৯২৫-৩০ সালে তিনি বাংলার প্রধান নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি তদানীন্তন কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিপক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানে বাস করেন। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। কলকাতায় মৃত্যু। তিনি ব্রিটিশরাজের জেলে ২৬ বছর বন্দী ছিলেন।

৮. গণেশ ঘোষ (২২ জুন ১৯০০-২২ ডিসেম্বর ১৯৯২)

গণেশ ঘোষ ছিলেন একজন বাঙালি ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামী, বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের যশোরের নিকটবর্তী বিনোদপুরে। তাঁর বাবা বিপিনবিহারী ঘোষ ছিলেন রেল কর্মচারী। বাবার কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পড়াশোনা করার সময় বন্ধু অনন্ত সিংয়ের মাধ্যমে সূর্য সেনের সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনিও বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তিনি চট্টগ্রাম যুগান্তর দলের সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্য সেন ও অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ নেন।

বিচারের পর ১৯৩২ সালে তাঁকে পোর্ট ব্লেয়ারে সেলুলার জেলে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৬ সালে মুক্তিলাভের পর তিনি কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি এই দলের একজন নেতা হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) নামক নবগঠিত দলে যোগ দেন। তিনি একবার লোকসভার (১৯৬৭) এবং তিনবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে)।

৯. হেলেনা দত্ত (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৬-?)

হেলেনা দত্ত ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব, বিপ্লবী নেত্রী ও অগ্নিকন্যা। তিনি ১৯১৬ সালে ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মুকুন্দলাল গুণ ও মায়ের নাম শৈলবালা গুণ। ১৯৩৯ সালে বিপ্লবী সুকুমার দত্তের সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৯২৮ সালে লীলা নাগের 'দীপালি ছাত্রী সংঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। গোপনে লাঠি ও ছুরি চালানো শেখেন। ১৯৩০ সালে তিনি 'শ্রী সংঘ' নামের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে বোর্ডিংয়ে থাকার সময় তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা রিভলবার প্রভৃতি বেআইনি জিনিস লুকিয়ে রাখতেন।

১৯৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ওই বছরেই আইন অমান্য করে আন্দোলনের সময় হরতালে যোগদান করায় তাঁকে ডিপিএইর নির্দেশে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় রিভলবার এনে পরে ঢাকায় থাকা নিরাপদ নয় মনে করে কলকাতার বরানগরে মামার বাড়িতে চলে আসেন। ১২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ বরানগরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ২৮ দিন লালবাজার হাজতে রাখার পর তাঁকে রাজবন্দী করে বিভিন্ন জেলে পাঁচ বছর আটকে রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান। ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে প্রথমে পলাতক থাকার পর ১৯৪৩ সালে আবার গ্রেপ্তার হন এবং ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি জেলে আটক থাকেন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পান। এরপর পিএসপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১০. হেনা দাস (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪-২০ জুলাই ২০০৯)

বাংলার নারী জাগরণে যে কজন নারী তাঁদের সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামসহ বাংলাদেশের সব ক্রান্তিলগ্নে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনেরও অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হেনা দাস সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সতীশচন্দ্র দত্ত একজন স্বনামধন্য আইনজীবী এবং মা মনোরমা দত্ত ছিলেন চুনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামের জমিদার জগৎচন্দ্র বিশ্বাসের বড় মেয়ে। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে হেনা দাস কনিষ্ঠ। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই হেনা দাস ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে প্রভাবিত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি ছাত্র ফেডারেশন নামে ছাত্রসংগঠনে যোগ দেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি 'নানকার আন্দোলনে' নানকার মেয়েদের সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকায় শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষক সমিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বহু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ভারতে চলে যান এবং উদ্বাস্তু শিক্ষকদের সঙ্গে রিলিফের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭৮ সাল থেকে পরবর্তী ১৪ বছরে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ আরও বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। হেনা দাস ১৯৮৯ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন। হেনা দাস বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ২০০০ সালের ২২ জানুয়ারি মহিলা পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগে ২০০৯ সালের ২০ জানুয়ারি রোববার সকালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১১. মন্টু খান

একজন বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। পারিবারিক সূত্রে তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর দৌহিত্র, দৈনিক *আজাদ*-এর এককালীন জেনারেল ম্যানেজার মরহুম আবদুল হাকিম খানের ছেলে। এই পরিবারে আবদুর রাজ্জাক খান ছিলেন ভারতবর্ষের আদি কমিউনিস্টদের একজন। মন্টু খান সেই পথের পথিক। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে কারাগারে ও আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে বন্দীকালীন সময় নিয়ে তাঁর লেখা বই *হায়নার খাঁচায় অদম্য জীবন*।

১২. আশালতা সেন (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬)

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব, সক্রিয় কর্মী, কবি ও সমাজসেবক এবং অগ্নিযুগের নারী বিপ্লবী। আশালতা সেন ১৮৯৪ সালে নোয়াখালীর এক উকিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বিক্রমপুরের বিদগাঁও গ্রামে। তাঁর বাবার নাম বগলামোহন দাশগুপ্ত ও মায়ের নাম মানোদা দাশগুপ্ত। বাবা ছিলেন নোয়াখালী জজকোর্টের আইনজীবী। আশালতা সেন বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ১৯০৪ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মাসিক পত্রিকা *অন্তঃপুর* প্রকাশিত করেন এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী কবিতা সুধীসমাজের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর মাতামহী নবশশী দেবীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আশালতা সেন রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে তাঁর ছেলের বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

১৩. নেপাল নাগ বা নেপালচন্দ্র নাগ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৯-৫ অক্টোবর ১৯৭৮)

নেপাল নাগ ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব, অগ্নিযুগের বিপ্লবী, স্বদেশি ও কমিউনিস্ট। নেপাল নাগ জন্মেছিলেন ঢাকার তেজগাঁওয়ে। তাঁর বাবার নাম সুরেশচন্দ্র নাগ। তাঁর ভালো নাম শৈলেশচন্দ্র হলেও নেপাল নামেই পরিচিত ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই স্বদেশি ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি আইএ পাস করার পর বিপ্লবী কাজকর্মে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২৩-২৪ সালে লীলা নাগ পরিচালিত 'শ্রী সংঘ'-এ যোগ দেন। ঢাকা শহরের বুকে যাঁরা গোয়েন্দা পুলিশকে সহায়তা করতেন, তাঁদের শায়েস্তা করতে তখনকার অন্যান্য কর্মী সুপতি রায়, জিতেন দে প্রমুখ বিপ্লবীর সঙ্গে তিনিও ছিলেন। ১৯৩২ সালের ২১ এপ্রিল তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। রাজস্থানের দেউলি বন্দী নিবাসে সাত বছর আটক থাকেন। মুক্তির পর তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। দেউলি কারাগারে আটক থাকার সময় মার্ক্সবাদী পণ্ডিত ও প্রবীণ বিপ্লবী রেবতী বর্মণের কাছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বন্দিশালায় কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্ফর আহমদ, প্রমোদ দাশগুপ্তর পরামর্শে বিহারে শ্রমিক সংগঠনের কাজ করতে যান। সেখান থেকে সফলকাম হয়ে ফিরলে তাঁকে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ এলাকায় সুতাকল শ্রমিকদের মাঝে পাঠানো হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দ্রুত মিশে যেতে পারার গুণ ছিল তাঁর। নারায়ণগঞ্জের সুতাকল এলাকায় বলিষ্ঠ শ্রমিক আন্দোলন, বিশাল শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলে সেখানকার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এ সময় কমিউন করে থাকতেন গোপনে অন্যতম বিপ্লবী জ্ঞান চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রমিকদের ভেতর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা বাড়ে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। একই বছর ডিসেম্বরে মুক্তিলাভের পর ঢাকায় সগৃহে অন্তরীণ থাকেন। কয়েক দিনের মধ্যেই অন্তরীণের বেড়াজাল ডিঙিয়ে গোপনে নারায়ণগঞ্জের সুতাকল অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে আত্মগোপন অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮-১৯৬২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল 'রহমান ভাই' নাম গ্রহণ করে আত্মগোপন অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির গোপন প্রতিনিধিত্ব করেন। পরের বছর ১৯৬১ সালে সোভিয়েত

ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসেও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। এ সময় হো চি মিন, চৌ এন লাই প্রমুখ মানুষের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা নিয়ে। পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৯ সালে রেল ধর্মঘট প্রয়াস, ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিপ্লবী অভ্যুদয় এবং ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ক্ষেত্রে নেপাল নাগের উদ্যোগ ও কাজ স্মরণীয়। দুরারোগ্য ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬২ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতায় ৪ অক্টোবর ১৯৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৪. বিনয় কৃষ্ণ বসু, বিনয় বসু নামে বেশি পরিচিত (১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৮-১৩ ডিসেম্বর ১৯৩০)

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম বাঙালি ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী। বিনয় বসুর জন্ম ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, মুন্সিগঞ্জ জেলার রোহিতভোগ গ্রামে। তাঁর বাবা রেবতীমোহন বসু ছিলেন একজন প্রকৌশলী। ঢাকায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করার পর বিনয় মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে (বর্তমানের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ) ভর্তি হন। এ সময় তিনি ঢাকার ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং যুগান্তর দলের সঙ্গে জড়িত মুক্তি সংঘে যোগ দেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর পড়ালেখা শেষ করতে পারেননি। বিনয় ও তাঁর সহযোদ্ধারা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস দলে যোগ দেন ১৯২৮ সালে। অল্প দিনের মধ্যেই বিনয় এই সংগঠনের ঢাকা শাখা গড়ে তোলেন। অচিরেই রাজবন্দীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগঠনটি রুখে দাঁড়ায়।

১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। লোম্যানের মিটফোর্ড হাসপাতালে এক সহকর্মীকে দেখতে আসার কথা ছিল। ১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট বিনয় সাধারণ বেশভূষায় নিরাপত্তাগণ্ডিকে ফাঁকি দিয়ে লোম্যানের খুব কাছে চলে এসে তাঁকে গুলি করেন। ঘটনাস্থলেই লোম্যানের মৃত্যু হয় এবং তাঁর সঙ্গে থাকা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট হডসন গুরুতর আহত হন। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বিনয় কলকাতা শহরে পালিয়ে যান বিপ্লবী সুপতি রায়ের সাহায্যে। এ সময় তাঁদের নানা ছদ্মবেশ ধরতে হয়। পুলিশ তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ৫০০০ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

বিপ্লবীদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল কারা কর্তৃপক্ষের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন এস সিম্পসন। রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচার চালানোর জন্য সিম্পসন বিপ্লবীদের কাছে কুখ্যাত ছিলেন। তাঁরা সিম্পসনকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তদানীন্তন সচিবালয় কলকাতা শহরের রাইটার্স বিল্ডিংয়ে (বর্তমানে বিবাদীবাগে অবস্থিত মহাকরণ) হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয়, বাদল গুপ্ত (১৯১২-১৯৩০; জন্ম বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলায়) ও দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-১৯৩১; জন্ম বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলায়, ফাঁসিতে মৃত্যু) একত্রে মিলে ইউরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে রাইটার্স ভবনে প্রবেশ করেন ও সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন। টেগার্টের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিবিনিময়ে টোইয়ানাম, প্রেন্টিস, নেলসনসহ আরও কিছু পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ হন। তবে অচিরেই তিন বিপ্লবী পরাভূত হন। পুলিশের কাছে ধরা না দেওয়ার জন্য বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। বিনয় ও দীনেশ পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে ১৯৩০ সালের ১৩ ডিসেম্বর বিনয়ের মৃত্যু হয়। বিনয়-বাদল-দীনেশের এই আত্মত্যাগের স্মরণে কলকাতার ডালহৌসি চত্বরের নামকরণ করা হয় বিবাদীবাগ।

১৫. লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী, পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা ও নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। আসামের গোয়ালপাড়ায় ১৯০০ সালের ২১ অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী লীলা নাগ ছিলেন একজন বেসামরিক কর্মকর্তার মেয়ে এবং তাঁর পরিবারবর্গ ছিল সিলেটের এক সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে তিনি ইংরেজিতে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তাঁর শিক্ষাগত সাফল্যের জন্য (তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন) তাঁকে 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। তাঁর বাবাকে ঢাকায় বদলি করা হলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯২৫ সালে শ্রী সংঘ নামে অভিহিত একটি বিপ্লবী দলের তিনি সদস্য হন। ছাত্রীদের জন্য তিনি ঢাকাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এর শাখা প্রসারিত করেন। ছাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতায় একটি মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় গোপন বিপ্লবী দলের (এগুলোর মধ্যে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সুবিদিত) সদস্য হিসেবে লীলা তাদের সাহায্য করতেন এবং এ দলসমূহ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষ করে নারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো সুপরিচিত নারী বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি প্রভাব রেখেছেন। ১৯২৭-২৮ সালের বিক্ষুব্ধ বছরগুলোতে, যখন নারীরা শারীরিক আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হন, তখন লীলা নাগ মহিলা আত্মরক্ষা ফান্ড নামে একটি ফান্ড গঠন করেন, যা ছিল এ অঞ্চলে প্রথম মার্শাল পদ্ধতিতে আত্মরক্ষামূলক দলের একটি। সাধারণ জনতার পর্যায়ে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি গণশিক্ষা পরিষদ নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন। লীলা অন্য যে কারণে বিখ্যাত তা হলো নারীদের বিচার্য বিষয়াবলিতে নিবেদিত প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকা *জয়শ্রীর* সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহিত্যিক কার্যক্রম।

১৯৩৯ সালে লীলা নাগ অনিল রায়কে বিয়ে করেন। এই দম্পতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দলে যোগদান করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের বাহ্যিক আকৃতি নষ্ট করার দায়ে লীলা নাগ ও অনিল রায়কে অভিযুক্ত করা হয় এবং পুনরায় তাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। কারামুক্তির পর তাঁকে নেতাজির দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র *ফরওয়ার্ড ব্লক*-এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিম বাংলায় চলে যান এবং ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলা থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরিতে অবদান রাখেন। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালী দাঙ্গার পর তিনি নোয়াখালীতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের ত্রাণকার্যে অংশ নেন। 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট' নামক একটি জনকল্যাণমূলক সংগঠনও তিনি স্থাপন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পরিপূর্ণ সক্রিয় জীবন যাপন করেন। [সূত্র : বাংলাপিডিয়া]

১৬. লায়লা সামাদ (৩ এপ্রিল ১৯২৮-১০ আগস্ট ১৯৮৯)

বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকতার একজন অগ্রপথিক ও একজন কথাসাহিত্যিক। লায়লা ১৯২৮ সালের ৩ এপ্রিল (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান ভারত) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার মির্জাপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম খান বাহাদুর আমিনুল হক ও মায়ের নাম তহমীনা খাতুন। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। তাঁর মা ছিলেন শের শাহর প্রধান সেনাপতি ড্যানিয়েল খাঁর বংশধর। সাংবাদিক হিসেবে তিনি দৈনিক *সংবাদ*, *চিত্রালী*, *পূর্বদেশ* ও *দৈনিক বাংলায়* এবং সম্পাদক হিসেবে সাপ্তাহিক *বেগম*, মাসিক *অনন্যা* ও পাক্ষিক *বিচিত্রায়* কাজ করেন। রাজনীতি, সংস্কৃতি,

সমাজসেবায়ও তাঁর অবদান ছিল। লায়লার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয় তাঁর গৃহশিক্ষক মোখলেসুর রহমানের মাধ্যমে।

মোখলেসুর রহমান (সিধু মিয়া) কমরেড মুজাফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে লায়লা সমাজতন্ত্রে উৎসাহ লাভ করেন এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে যোগ দেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন মঞ্চনাটকে অভিনয় করেন ও বেতার নাটকে কণ্ঠ দেন। ষাটের দশকে তিনি টেলিভিশন নাটক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প, নাটক, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনিতে তাঁর বিচরণ ছিল। তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংখ্যা ৬ এবং অন্যান্য রচনার সংখ্যা ৬। ছোটগল্পে অবদানের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদ মির্জা আবদুস সামাদের সহধর্মিণী। ঢাকা লেডিস ক্লাব তাঁকে উৎসর্গ করে সাহিত্যে 'লায়লা সামাদ পুরস্কার' প্রদান করে থাকে। তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচনা করেছেন *কথাশিল্পী লায়লা সামাদ*।

লায়লা সামাদ ১৯৮৯ সালের ১০ আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁকে উৎসর্গ করে কবিতা নিবেদন করেছিলেন কবি সুফিয়া কামাল ও ফজল শাহাবুদ্দীন। ভারতের *আনন্দবাজার পত্রিকা* 'নক্ষত্র পতন' শিরোনামে শোকসংবাদ প্রকাশ করে।

১৭. রোকেয়া রহমান কবির (৪ অক্টোবর ১৯২৫-২৮ জুলাই ২০০০)

বাংলাদেশের একজন নারী উন্নয়নকর্মী ও শিক্ষাবিদ। তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের তৃণমূল নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। রোকেয়া রহমান কবির ১৯২৫ সালের ৪ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মুজিবুর রহমান এবং মায়ের নাম জোহরা খাতুন। তাঁর বাবা তৎকালীন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের (আইসিএস) কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে চলে আসেন। রোকেয়া রহমান কবিরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় শিয়ালদহের লরেটো কনভেন্টে। পরবর্তী সময়ে তিনি লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে ভূগোলে স্নাতক এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলাদেশে এসে কর্মজীবনের শুরুতে তিনি চট্টগ্রামে একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ইডেন মহিলা কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসেবে কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি সরকারি চাকরি ত্যাগ করে গ্রামীণ তৃণমূল নারীদের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন; 'সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ' নামে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার গোড়াপত্তন করেন। এই সংস্থার সদস্য নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি সিল্ক থেকে সুতা, কাপড় ও পোশাক উৎপাদনের লক্ষ্যে 'সপ্তগ্রাম সিল্ক উৎপাদন কেন্দ্র' নামে একটি প্রকল্প চালু করেন, যা পরবর্তী সময়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ব্র্যাক' অধিগ্রহণ করে।

১৮. আহমদুল কবির (মনু মিয়া)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতা অঙ্গনের এক প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৪৫-৪৬ সালে ডাকসুর প্রথম সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রার্থী হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ ছাড়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নরসিংদী-২ নির্বাচনী এলাকা থেকে ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালে সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। আহমদুল কবির ১৯৫৪ সালে *সংবাদ*-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন। ২০০১ সালে তিনি প্রধান সম্পাদক হন এবং আমৃত্যু এই দায়িত্বে ছিলেন। ২০০৩ সালে কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবেশ ভাবনা

কার্ল মার্ক্সের পরিবেশ ভাবনা ও রাজনৈতিক অর্থনীতির অসমাপ্ত সমালোচনা

খলিলউল্লাহ্

কার্ল মার্ক্সেস ইকোসোশ্যালিজম : ক্যাপিটাল, নেচার, অ্যান্ড দ্য আনফিনিশড ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি—কোহেই সাইতো, মান্থলি রিভিউ প্রেস, নিউইয়র্ক, ২০১৭।

ভূমিকা

প্রকৃতি বিষয়ে কার্ল মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ উঠলেই মোটামুটি তিনটি সমালোচনা হয়ে থাকে। প্রথম সমালোচনা হলো মার্ক্স একটি 'উৎপাদনবাদী' বা 'প্রমিথীয়' দৃষ্টিকল্পের শিকার। এর অর্থ হলো মার্ক্স মানব সংগঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে পরিমাপযোগ্য অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধিকেই বিশ্লেষণের উপজীব্য হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। এই দৃষ্টিকল্পের অধীনে ভাবা হয় যে উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে মানুষের উৎপাদনক্ষমতা প্রাকৃতিক বাধাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারে। এখানে কমিউনিজম বা সাম্যবাদকে দেখা হয় প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ মনুষ্য আধিপত্য বিস্তারের পুঁজিবাদী চেতনার সম্প্রসারণ ও তা জায়েজ করার অংশ হিসেবে। এ ছাড়া পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ দুটোকেই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অনিবার্য বৈরিতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়।

দ্বিতীয় সমালোচনা হলো পুঁজিবাদের বিশ্লেষণে মার্ক্স উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকাকে হয় বাতিল করে দিয়েছেন অথবা গুরুত্ব দেননি। মার্ক্স মূল্যের যে শ্রমতত্ত্ব দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর তৃতীয় সমালোচনাটি হলো

পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের যে সমালোচনা মার্ক্স করেছেন, সেখানে প্রকৃতি বা উৎপাদনের প্রাকৃতিক শর্তগুলোর কোনো ভূমিকা নেই।

পল বুর্কেট ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত *মার্ক্স অ্যান্ড নেচার* গ্রন্থে এই সমালোচনাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি মার্ক্স সম্পর্কে এই দাবিগুলোর সাধারণ অনুসিদ্ধান্তগুলোরও উত্তর দিয়েছেন খুবই পদ্ধতিগতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে কার্যকর পদ্ধতিতে। তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম যে প্রকৃতি বিষয়ে মার্ক্সের অ্যাপ্রোচের একটি অন্তর্নিহিত যুক্তি যেমন আছে, তেমনি সাযুজ্য ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাও রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টি এখনো স্বীকৃত নয়। এমনকি পরিবেশকেন্দ্রিক ইকোলজিক্যাল মার্ক্সবাদীরাও মার্ক্সের এই অ্যাপ্রোচটির স্বীকৃতি এখনো দেয়নি।

আরেকজন প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং *মান্থলি রিভিউ* পত্রিকার সম্পাদক জন বেলামি ফস্টার এ বিষয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বিশেষ করে ফস্টারের *মার্ক্সেস ইকোলজি : ম্যাটেরিয়েলিজম অ্যান্ড নেচার* এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অবশ্য ফস্টার মার্ক্সবাদের প্রথাগত ব্যাখাকে পরিবেশের সংকট মোকাবিলায় নতুন করে সামনে এনেছিলেন। পরিবেশের সংকটকে মাথায় রেখে তিনি আরও যুক্তিসংগত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। পুঁজিবাদী কৃষি ও মাটির বাস্তুতন্ত্রের ওপর মার্ক্সের অনাদৃত লেখাজোখা, দার্শনিক প্রকৃতিবাদ ও বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ঘেঁটে ফস্টার দেখিয়েছিলেন যে মার্ক্স পুঁজিবাদী সমাজের শক্তিশালী সমালোচক হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক বিষয়ে মার্ক্স গভীরভাবে সজাগ ছিলেন।

অবশ্য কার্ল মার্ক্সের বিরুদ্ধে এসব সমালোচনার প্রথম জবাব আসে ষাট ও সত্তরের দশকেই। মার্ক্সীয় বিশ্লেষক রেমন্ড উইলিয়ামস ও ইস্তাভান মেসজারস যুক্তি দেখান যে মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে হলে পুঁজিবাদী সম্পর্কের সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের দ্বন্দ্ব ভালোভাবে বুঝতে হবে।

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক পল বুর্কেট ও জন বেলামি ফস্টারের কাজের ওপর ভিত্তি করেই জাপানি মার্ক্সবাদী পণ্ডিত কোহেই সাইতো *কার্ল মার্ক্সেস ইকোসোশ্যালিজম : ক্যাপিটাল, নেচার, অ্যান্ড দ্য আনফিনিশড ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি* গ্রন্থটি লিখেছেন। বইয়ের মূল কথা হলো পৃথিবী ধ্বংসের পেছনের মূল কারণ পুঁজিবাদী উৎপাদনের ধরন। আর এটা বুঝতে হলে মার্ক্সের চিন্তাকে কেন্দ্রীয় পদ্ধতি হিসেবে ধরতে হবে। এ ছাড়া প্রমিথীয় হিসেবে মার্ক্সের বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্যতম জবাব হিসেবে বইটি গুরুত্বপূর্ণ। সাইতোর বইয়ে মার্ক্সের বিস্তৃত কাজকে তুলে আনা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো সম্প্রতি প্রকাশিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর মার্ক্সের নোটবুকগুলো।

মার্ক্সের চিন্তার বিবর্তন

কোহেই সাইতোর মতে, মার্ক্স শুধু একজন অর্থনীতিবিদই নন। ব্যাপারটি এমন নয় যে তাঁকে মাঝেমধ্যে প্রকৃতিবিষয়ক আলোচনায় পাওয়া যায়। সাইতো মনে করেন, 'রাজনৈতিক অর্থনীতির যে সমালোচনা মার্ক্স করেছেন, তা পুরোপুরি বুঝতে হলে মার্ক্সের পরিবেশবিষয়ক ভাবনাও খতিয়ে দেখতে হবে...আসলে, মার্ক্স সমগ্র প্রকৃতি সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। সেটাই তাঁর 'ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড' বা বস্তুগত দুনিয়া, যাকে তিনি দেখেছেন পুঁজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জায়গা হিসেবে এবং এখানেই পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলো সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে (পৃ. ১৪)।' মজার ব্যাপার হলো সাইতোর এই বিশ্লেষণ পশ্চিমা মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা থেকে উৎসারিত হয়নি। এই বিশ্লেষণ সাইতো করেছেন কুরুমা স্কুল নামে মার্ক্সীয় দর্শনচর্চার জাপানি ঘরানা থেকে। জাপানি অর্থনীতিবিদ সামেঝো কুরুমার নামানুসারে এই ঘরানার মার্ক্সবাদীদের নামকরণ করা হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে কুরুমার কাজ খুব একটা পরিচিত নয়। জার্মানিতে কিছুটা পরিচিত, কারণ কুরুমার ছাত্র ও আরও কয়েকজন মিলে জার্মান ভাষায় একটি বই সম্পাদনা করেছিল। কিন্তু তাঁর মূল কাজ হলো *মার্ক্সেস থিওরি অব দ্য জেনেসিস অব মানি : হাউ, হোয়াই অ্যান্ড থ্রু হোয়াট ইজ আ কমিডিটি মানি?* কুরুমার এই কাজটি অনেকাংশেই অবহেলিত। সাইতোর এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে কুরুমার কিছু কাজকে পরিচিত করানো হয়েছে। *পুঁজি* গ্রন্থের জাপানি এই ঘরানার ব্যাখ্যায় যে তাত্ত্বিক ভিত্তি পাওয়া যায়, সেখান থেকে দেখা যায়, মার্ক্স পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বের নজির হিসেবে শ্রমশক্তি ও মাটির নিঃশেষকেই শুধু দেখেননি; বরং এখান থেকেই পুঁজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা ভেবেছেন।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস-বিষয়ক চলমান একটি গবেষণা প্রকল্পের (Marx-Engels-Gesamtausgabe) অংশ হিসেবে প্রকাশিত মার্ক্সের 'এক্সার্পট নোটবুকস' থেকে বিশদ আকারে বর্ণনা দিয়ে সাইতো মার্ক্সকে চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রথমে তিনি মার্ক্সকে চিত্রিত করেছেন একজন তরুণ ব্যক্তি হিসেবে, যার দার্শনিক প্রত্যয় ছিল কীভাবে পুঁজিবাদী সম্পর্ক আমাদের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা খতিয়ে দেখা। এরপর মার্ক্সকে তিনি দেখেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একজন প্রত্যয়ী ছাত্র হিসেবে, যেখানে তিনি পুঁজির বাস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্বগুলোর বৈজ্ঞানিক সত্যতা খুঁজে পেতে চাইছেন।

বইয়ের 'ইকোলজি অ্যান্ড ইকোনমি' নামক প্রথম অধ্যায়ে সাইতো মার্ক্সের বাস্তুতান্ত্রিক বা ইকোলজিক্যাল ক্রিটিকের পদ্ধতিগত বিকাশ তুলে ধরেছেন। ১৮৪০ সালের দশকে মার্ক্সের প্যারিস নোটবুকস থেকে মার্ক্সের পূর্ণ বয়সের কাজ *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ পর্যন্ত এই বিকাশ সাইতো দেখিয়েছেন। মার্ক্সের প্যারিস নোটবুকগুলোর একটি অংশ *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট* নামে

প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলোয় মার্ক্সকে দেখা যায়, একজন তরুণ পণ্ডিত হিসেবে, যিনি তখনো ফয়েরবাখ ও ইয়াং হেগেলিয়ান স্কুলের দার্শনিক প্রভাবের আওতায় ছিলেন। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অধীনে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার তিনি চার ধরনের সংজ্ঞা তৈরি করেছিলেন। মার্ক্স দেখান যে পুঁজিবাদের অধীনে একজন ব্যক্তি তার নিজের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, খোদ শ্রম প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, নিজের মুক্ত ও সৃজনশীল স্পিসিস বিং বা সহজাত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তার সহকর্মী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এ রকম বিচ্ছিন্নতা দূর করতে মার্ক্স ব্যক্তি সম্পত্তি (বিচ্ছিন্ন শ্রমে তৈরি পণ্য) রদ করার কথা বলেন। তাঁর মতে, এর ফলে মানুষ মুক্ত, সহযোগিতামূলক পন্থায় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারবে। পরে তাঁর ইকোলজিক্যাল বা বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তার পাটাতন তৈরি করে দিয়েছিল যেসব মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি, তা তিনি সে সময়েই পেয়েছিলেন। কিন্তু তখনো মার্ক্স একটি ইতিহাস বিযুক্ত, ফয়েরবাখীয় আদর্শবাদে প্রেমমুগ্ধ ছিলেন। এই প্রেমমুগ্ধতা তিনি পরবর্তী সময়ে অতিক্রম করেছিলেন, যা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-বিষয়ক কাজগুলোয় দেখা যায়।

মেটাবলিজম শব্দটি মার্ক্স প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর ১৮৫১ সালের *লন্ডন নোটবুকস*-এ এবং পরবর্তী সময়ে *গ্রুনড্রিসে*-এ। তবে, 'মার্ক্স তাঁর *রিফ্লেকশন* নামক কাজে মেটাবলিজমের ধারণা ব্যবহার করেছিলেন লাইবিজের (Justus von Liebig) লেখা পড়ার আগেই (পৃ. ৬২)।' সাইতোর মতে, মার্ক্স মনে করেন শ্রম প্রক্রিয়া হলো 'প্রকৃতির সঙ্গে একটি বিপাকীয় বা মেটাবলিক মিথস্ক্রিয়া', যা উৎপাদনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে সময়ে সময়ে বদলায়। পরিবেশের ওপর প্রভাবের দিক থেকে চিন্তা করলে পুঁজিবাদ তার আগের উৎপাদনের ধরনগুলো থেকে ভিন্ন। কারণ, এখানে পৃথিবীর সম্পদের সীমার বিপরীতে সম্পদের বিপজ্জনক পুঞ্জীভবনের ধারণা তৈরি হয়। সাইতোর মতে, উৎপাদনের শক্তিগুলোর বিকাশে পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে মার্ক্সের যে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা পরবর্তী সময়ে মার্ক্স নিজেই সংশোধন করেছেন। এই বিষয়টি *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো*তে স্পষ্ট হয়েছে।

মার্ক্সের বস্তুবাদী সমালোচনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে *জার্মান আইডিওলজি* (১৮৪৬) লেখার মাধ্যমে। তিনি ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে সঙ্গে নিয়ে এই পাণ্ডুলিপিটি রচনা করেন। এখানে মার্ক্স ইকোলজি বা বাস্তুতন্ত্রের একেবারে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে একটি 'প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন, যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিবর্তনযোগ্য সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এই গতিশীল আন্তবিনিময় বোঝানোর জন্য তিনি 'মেটাবলিজম' শব্দটি ব্যবহার করা শুরু করেন। এর মাধ্যমে মার্ক্স

বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রকৃতি হলো মানুষের 'ইন-অর্গানিক বডি' বা অজৈব অংশ, যার ওপর মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। ১৮৫০ সালের দশকের মাঝামাঝি সময়ে *গ্রুন্দ্রিসে* লেখার মাধ্যমে মার্ক্স মেটাবলিজমের ধারণা আরও পরিশুদ্ধ করেন। সেখানে তিনি পুঁজির একটি স্বাভাবিক মেটাবলিক বা বিপাকীয় প্রবণতা দেখান। এর মূল কথা হলো ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পুঁজিবাদ প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে শোষণ করে। এই শোষণপ্রক্রিয়ায় মানুষের শ্রমশক্তিও অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমেই পুঁজিবাদ সস্তা ইনপুট খুঁজে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের নিজস্ব দ্বন্দ্বগুলোকে আরও গভীর করে থাকে। যেমন বন বিনাশ, কার্বন নির্গমন, জীববৈচিত্র্য হারানো ইত্যাদি আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এর সবাই মার্ক্সের লেখাজোখার সময় থেকে এখন পর্যন্ত অনেক বেশি তীব্রতর হয়েছে। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের অবনতির ফলে পুঁজির পুঞ্জীভবন শেষ হওয়ার আগেই হয়তো মনুষ্যসভ্যতা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সে জন্যই টেকসই মানব উন্নয়নের সঙ্গে পুঁজিবাদের মেটাবলিক সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

রাজনৈতিক অর্থনীতির অসমাপ্ত সমালোচনা

কোহেই সাইতো তাঁর *মার্ক্সেস ইকোসোশ্যালিজম* গ্রন্থে বলেছেন যে মানুষ ও প্রাকৃতিক পৃথিবীর মধ্যে অপূরণীয় ফাটলের ধারণা মার্ক্সের বিশ্লেষণের কোনো দুর্ঘটনাপ্রসূত অংশ নয়, বরং পুঁজিবাদের প্রধান দ্বন্দ্বও বটে। এই অপূরণীয় ফাটলের ধারণাটি সমৃদ্ধ করেছেন জন বেলামি ফস্টার। তিনি একে বলছেন 'মেটাবলিক রিফট'। সাইতো মনে করেন যে যদি পুঁজিবাদের কারণে পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে একমাত্র সমাধান হলো এর চেয়ে উন্নততর উৎপাদনপদ্ধতির প্রবর্তন করা। আর তা হলো সমাজতন্ত্র। তবে মার্ক্স বলেননি যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটলেই আপনা থেকে পরিবেশ ও বাস্তুতান্ত্রিক সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র কায়েম হলে সীমিত সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। এই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করা। প্রকৃতির পার্থিব সীমার সঙ্গে সচেতন আন্তক্রিয়ার উপলব্ধি থেকে মূল্যভিত্তিক উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থার অবসান হবে। আজকের টেকসই উন্নয়নের মূল কথাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

সাইতোর বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে মার্ক্সের ১৮৪৪ সালের *প্যারিস ম্যানুস্ক্রিপ্টস* খতিয়ে দেখার মধ্য দিয়ে। মার্ক্স সেখানে বলেছেন যে সামন্তবাদের অধীনে দায়বদ্ধ কৃষক বা ভূমিদাসরা ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের অধীনে শ্রমিকদের ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। শহর ও গ্রামের মধ্যে এই ফাটলের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। কারণ, বর্জ্য পণ্য পুনরায় ব্যবহৃত হয় না।

সাইতোর বিশ্লেষণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি মার্ক্সের ইকোসোশ্যালিজম বা পরিবেশ সমাজতন্ত্রের প্রধান বিষয় হিসেবে 'রিইফিক্যাশন' (Reification) ধারণার ওপর জোর দিয়েছেন। রিইফিক্যাশন শব্দের সাধারণ অর্থ হলো কোনো বিমূর্ত বিষয়কে বাস্তব রূপদান করা। মার্ক্সবাদে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। এই প্রক্রিয়ায় যেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষ যুক্ত থাকে, সেই সম্পর্ককে মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হয়, অথবা সম্পর্কের অন্তর্গত কিছু পণ্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হয়। এই ধারণার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে অবজেক্ট পরিণত হয় সাবজেক্টে, আর সাবজেক্ট পরিণত হয় অবজেক্টে। এর ফলে একদিকে যেমন সাবজেক্টকে নিষ্ক্রিয় বা স্থির বিষয় হিসেবে দেখা হয়, অন্যদিকে অবজেক্টকে দেখা হয় সক্রিয়, নির্ধারক উপাদান হিসেবে। এই ধারণাটি মার্ক্সের এলিয়েনেশন ও কমিডিটি ফেটিশিজম ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এগুলোর চেয়ে রিইফিক্যাশন ভিন্ন। এলিয়েনেশন হলো মানুষের বিচ্ছিন্নতার সাধারণ অবস্থা। কিন্তু রিইফিক্যাশন হলো এলিয়েনেশনের একটি নির্দিষ্ট রূপ। আবার কমিডিটি ফেটিশিজম হলো রিইফিক্যাশনের একটি নির্দিষ্ট রূপ।

মার্ক্সের নিজের কাজগুলোয় রিইফিক্যাশনের ধারণা তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ধারণা হিসেবে ছিল না। এই বিষয়টি বোঝার জন্য হাঙ্গেরীয় মার্ক্সবাদী দার্শনিক জর্জ লুকাচের (György Lukács) দ্বারস্থ হতে হবে। তিনিই এই শব্দটিকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাঁর *হিস্টোরি অ্যান্ড ক্লাস কনশাসনেস* গ্রন্থের অংশ হিসেবে লিখিত 'রিইফিক্যাশন অ্যান্ড দ্য কনশাসনেস অব দ্য প্রলেতেরিয়েত' প্রবন্ধের মাধ্যমেই রিইফিক্যাশনের ধারণাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। মার্ক্সের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে কমিডিটি ফেটিশিজমের ওপর আলোচিত অধ্যায়ের নিবিড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে লুকাচ রিইফিক্যাশনের ধারণা হাজির করেছেন। তাঁর মতে, এটা পুঁজিবাদী সমাজের এমন একটি সমস্যা, যা পণ্যের ধরনের ব্যাপকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। লুকাচের কাজ পরবর্তী সময়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানার দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছিল।

মার্ক্সের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের 'দ্য ওয়ার্কিং ডে' ও 'মেশিনারি অ্যান্ড লার্জ-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি' নামের দুটি অধ্যায়ে রিইফিক্যাশন ধারণার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। তবে ইকোলজিক্যাল ক্রিটিকের অংশ হিসেবে মার্ক্স রিইফিক্যাশন ধারণাটির বিকাশ ঘটিয়েছেন ধীরে ধীরে। সংক্ষেপে, রিইফিক্যাশন বলতে বোঝায় একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বেসরকারি উৎপাদকেরা পণ্যের বিনিময় করে থাকে। এসব পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় উৎপাদনে ব্যবহৃত বিমূর্ত শ্রমের পুরো যোগফল হিসেবে। প্রকৃতির কাঁচামালগুলোর অর্থনৈতিক রূপ দেওয়া হয়। এই রূপগুলোই 'জিনিস' হিসেবে পরিণত হয়। কিন্তু পুঁজির অধীনে এই বস্তুগত জিনিসগুলো কখনোই জমা হয় না। এভাবেই সর্বোচ্চ বিমূর্ত শ্রম-শোষণের উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে পুনর্গঠন করার মাধ্যমে

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেটাবলিজমের বা বিপাকের ধারাবাহিকতাকে পুঁজি ফেলে দেয় হুমকির মুখে। রিইফিক্যাশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে সমাজের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করা সম্ভব, কিন্তু তা হতে হবে শুধুই মূল্যের মধ্যস্থতার মাধ্যমে। সাইতো এই বিষয়টি তাঁর বর্তমান বইয়ে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

মানুষ পৃথিবী ধ্বংস করছে—মার্ক্স শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তাঁর 'ম্যাটেরিয়েল ওয়ার্ল্ড' ধারণার মাধ্যমে খতিয়ে দেখেছেন কীভাবে পুঁজির বস্তুকে মূল্যে রূপান্তর প্রক্রিয়া মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার চিরন্তন মেটাবলিজম বা বিপাককে বদলে ফেলে এবং টেকসই মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বস্তুগত শর্তগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। একইভাবে, মার্ক্স সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করেছেন। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছেন এবং সবশেষে বলেছেন রিইফিক্যাশনের বিদেশি শক্তিকে অতিক্রম করার কথা (পৃ. ১৩৩)।

মার্ক্সেস ইকোলজি অ্যান্ড দ্য মার্ক্স-এঙ্গেলস-গেসামটসগাবে নামের বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাইতো মার্ক্সের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক নোটবুকগুলো ঘেঁটে দেখেছেন। এগুলো সম্প্রতি উন্মুক্ত হয়েছে। এই নোটবুকগুলোয় দেখা যায়, মার্ক্স বছরের পর বছর ধরে বহু লেখকের লেখা পড়ে গবেষণা করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল পুঁজির বাস্তুতান্ত্রিক সমালোচনার ধারণা পরিশোধিত করা। সাইতো স্বীকার করেছেন যে প্রকৃতি বিষয়ে মার্ক্সের শুরুর দিকের 'উৎপাদনবাদী' চিন্তাভাবনার কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। এর মানে হলো মার্ক্স আশাবাদী ছিলেন যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করা সম্ভব। জুস্টুস ভন লাইবিজের *অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি* এবং জেমস এফ ডব্লিউ জনস্টোনের *নোটস অন নর্থ আমেরিকা* গ্রন্থের প্রথম দিকের সংস্করণগুলো থেকে মার্ক্স বাছাইকৃত অংশের নোট রেখেছিলেন। সেখানে মার্ক্সের একটি আশাব্যঞ্জক নোট পাওয়া যায়। সেই নোটে তিনি কৃষি বিষয়ে ডেভিড রিকার্ডোর ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ আইন (law of diminishing agricultural returns) অতিক্রম করার আশা ব্যক্ত করেছেন। উন্নত মৃত্তিকাবিজ্ঞান বা সয়েল সায়েন্স ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিকার্ডোর এই তত্ত্ব অতিক্রান্ত করা যাবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। লাইবিজের প্রথম দিকের কাজগুলোয় দেখা যায়, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে কৃত্রিম সার ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। তবে লাইবিজের মত, একজন কৃষি অর্থনীতিবিদের জন্য এটা একটি বেশ সুবিধাজনক অবস্থান। কারণ, তাঁর নিজেরও রাসায়নিক সারের ব্যবসা ছিল।

তবে লাইবিজ ও মার্ক্স উভয়ের জন্যই ১৮৬২ সালে *অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি* গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সংস্করণে

লাইবিজ পুঁজিবাদী সম্পর্কের আওতায় কৃষি দস্যুতা বা রবারি অ্যাগ্রিকালচারের একটি নিকষ কালো তত্ত্ব দাঁড় করান। লাইবিজ তখন 'ল অব রেপ্লিনিশমেন্ট' বা পুনঃ জোগান আইনের কথা বলেন, যেখানে তিনি দেখান যে উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে হলে জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার উপাদানই মাটির প্রয়োজন। জৈব উপাদানের ক্ষেত্রে বলেছেন যে বায়ুমণ্ডল ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এটা পুনরায় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু অজৈব উপাদান, যেমন খনিজের ক্ষতিসাধন অবশ্যই কমাতে হবে। কারণ, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার চাপের মুখে এগুলো পুনরায় পূর্ণ করা অনেক বেশি কঠিন। এর ফলে মার্ক্স যখন *ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ড লিখছিলেন, তখন তাঁর অবস্থান বদল করেন। মার্ক্স বুঝতে পেরেছিলেন যে পুঁজিবাদের অধীনে দীর্ঘমেয়াদি বৈজ্ঞানিক বিকাশ মাটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে না। মার্ক্স এ-ও বুঝেছিলেন যে টেকসই কৃষি ও পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে। সাইতো লিখেছেন যে লাইবিজের সপ্তম সংস্করণ পড়ার ফলে 'মার্ক্সের অন্তর্দৃষ্টি আরও গভীর হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে অধীন ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কারণ, কিছু অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক সীমা আছে (১৬০)।' মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিপাকের একটি যৌক্তিক ব্যবস্থাপনার যে দাবি মার্ক্স করেছেন, তার উৎস হলো প্রাকৃতিক সীমার এই স্বীকৃতি। এ ছাড়া এই উপলব্ধি যে টেকসই মানব উন্নয়ন অর্জনে সামাজিক উৎপাদন মৌলিকভাবে পুনর্গঠন করতে হবে। মার্ক্স বুঝতে পেরেছিলেন যে পুঁজিবাদ এই যৌক্তিক মেটাবলিজম বা বিপাক প্রক্রিয়ার প্রতি সহজাতভাবেই শত্রুভাবাপন্ন। কারণ, সব ধরনের সম্পর্ককেই পুঁজিবাদ বিচার করে রিইফাইয়েড ভ্যালু বা পণ্যের মূল্যে।

মার্ক্স মনে করতেন যে সম্পদ পুঞ্জীভবনের প্রতি পুঁজিবাদের যে অসীম আকাঙ্ক্ষা, সেখানে প্রাকৃতিক সীমার এই বাধা সে চুপচাপ মেনে নেবে না। যখনই পুঁজিবাদ কোনো সীমা বা বাধার মুখোমুখি হয়, তখনই সে তা অতিক্রম করতে উঠেপড়ে লাগে। এই দিক থেকে বলা যায়, মার্ক্সবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক রোজা লুক্সেমবার্গ মার্ক্সের 'স্কিম অব রিপ্রোডাকশন' ধারণার যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা ভুল। রোজা লুক্সেমবার্গের বিশ্লেষণটি মার্ক্সীয় তত্ত্বে উল্লেখযোগ্য হিসেবে পরিচিত। তিনি *দ্য অ্যাকুমিউলেশন অব ক্যাপিটাল* গ্রন্থে বলেছিলেন যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক মেটাবলিজম বা বিপাকের একটি ভারসাম্য আছে। পুনরুৎপাদন স্কিমের সেই ভারসাম্য বিনষ্ট করলে পুঁজিবাদ ভয়ানক সংকটের মধ্যে পড়বে। কিন্তু পুঁজিবাদের একঘেয়েমি চরিত্রকে খাটো করে দেখা যাবে না। কারণ, সাইতোর বইয়ে মার্ক্সের উক্তি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদের একটি 'স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় শক্তি' আছে। এই বিষয়ে মার্ক্স বারবার জোর দিয়েছেন। মার্ক্স মনে করতেন যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক মেটাবলিজমের ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটলে এই নমনীয় শক্তির কারণে

পুঁজিবাদ ঠিকই সাড়া দিতে পারে। পুঁজিবাদের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে পুঁজির পুঞ্জীভবনের পথে যেকোনো বাধা বা সীমা অতিক্রম করতে পুঁজিবাদ ঠিকই নতুন কোনো পদ্ধতি বের করে ফেলে। এখান থেকেই পুঁজিবাদ দুটি পদ্ধতি নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হয় : 'প্রাকৃতিক ও মানব বৃত্তির সাধারণ শোষণপদ্ধতি' এবং 'সাধারণ উপযোগিতার পদ্ধতি'। নতুন কার্যকরী ও সস্তা উৎপাদনের উপকরণ, প্রযুক্তি ও বাজার খুঁজতে গিয়ে পুঁজিবাদ সারা পৃথিবীতেই শোষণ চালায়। মার্ক্সের *গ্রুনদিসে* থেকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এটা করতে গিয়ে নতুন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়। ফলে হোক সেটা বৈরী আবহাওয়া বা সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা—কোনো কিছুই পুঁজির পুঞ্জীভবনে বাধা হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জেনেটিক্যালি মডিফাইয়েড (জিএম) কৃষি বীজের উদাহরণ দেওয়া যায়। রাসায়নিক সার এবং জিএম বীজের মাধ্যমে হলেও পুঁজি তার নমনীয় শক্তির জোরে প্রাকৃতিক সীমা অতিক্রম করতে চায়।

পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী এই সর্বজনীন শোষণের কারণে প্রকৃতিও মানুষের বস্তু এবং একটি উপযোগিতার বিষয়ে পরিণত হয়। এটাকেই মার্ক্স বলেছেন, 'গ্রেট সিভিলাইজিং ইনফ্লুয়েন্স অব ক্যাপিটাল' বা পুঁজিবাদের চমৎকার সভ্যতাকরণ প্রভাব, যা পুরোনো জীবনপ্রণালি যেমন ক্রমাগত ধ্বংস করতে থাকে, তেমনি ধ্বংস করে প্রকৃতিকেও। সাইতোর ভাষায়, 'এই প্রক্রিয়ার ফলে পুঁজিবাদ তার নিজের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলোকে আরও গভীর করে, যেমন আমাজন এলাকায় ব্যাপক বন বিনাশ; চীনে শোষণমূলক শিল্পের মাধ্যমে পানি, মাটি ও বাতাস দূষণ করা; মেক্সিকো উপসাগরে দুর্ঘটনার ফলে তেল ছড়িয়ে পড়া; এবং জাপানের ফুকুশিমায় পারণবিক দুর্ঘটনা।' (পৃ. ৬৭)

মার্ক্সের মেটাবলিক রিফট তত্ত্বের একটি অনুপ্রেরণার উৎস ছিল লাইবিজের কৃষি দস্যুতার ধারণা। মেটাবলিক রিফট বা বিপাকীয় ফাটলের ধারণা পরবর্তী সময়ে বিস্তৃত আকারে জন বেলামি ফস্টার তাঁর *মার্ক্সেস ইকোলজি* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কিন্তু মার্ক্স এই ধারণা দিয়ে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গ্রাম ও শহরের মধ্যে মেটাবলিক রিফট বুঝিয়েছেন। কিন্তু সাইতো মেগা (MEGA) নোটবুকগুলো গবেষণা করার ফলে আমরা দেখছি যে ১৮৬৭ সালে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর মার্ক্স আরেকজন কৃষি অর্থনীতিবিদের কাজগুলো খতিয়ে দেখছিলেন। তাঁর নাম হলো কার্ল ফ্রাস (Carl Fraas)। বিশেষ করে ফ্রাসের ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত *অ্যাগ্রারিয়ান ক্রাইসেস অ্যান্ড দেয়ার রিমিডিজ* গ্রন্থটি লাইবিজ সম্পর্কে মার্ক্সের পূর্ববর্তী ধারণায় যেমন পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি পুঁজিবাদের বাস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্বগুলো বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর জন্য একটি বৈজ্ঞানিক রাস্তা খুলে যায়। লাইবিজের 'কৃষি রসায়নের' বিপরীতে ফ্রাস 'কৃষি পদার্থবিদ্যার' ধারণা এগিয়ে নেন। লাইবিজের বেশির ভাগ কাজের গুরুত্ব ফ্রাস অস্বীকার

করেননি। তবে তিনি মনে করতেন যে মাটির উৎপাদনশীলতার জন্য রাসায়নিক ব্যাপারগুলোর চেয়ে জলবায়ুসংক্রান্ত বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি পর্যায়ে ফ্রাস লিখেছেন যে একটি অনুকূল জলবায়ু থাকলে নিঃশেষ হওয়া ছাড়াই চাষাবাদ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা বিপাকীয় চক্রের মাধ্যমে মাটির পুষ্টি ফিরে না এলেও সমস্যা নেই।

এ ছাড়া ফ্রাস তাঁর *ক্লাইমেট অ্যান্ড দ্য প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ড ওভারটাইম* গ্রন্থে বলেছেন যে বন বিনাশই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক কারণ। কারণ, এর ফলেই তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং আর্দ্রতা কমে যায়, যেমন মরুকরণ। এই বিষয়টিকে তিনি মেসোপটেমিয়া, মিসর ও গ্রিস সভ্যতার একটি ঐতিহাসিক প্রবণতা হিসেবে দেখেছেন। ফ্রাসের মতে, সমস্যা হলো বিভিন্ন কাজে সভ্যতাগুলো বিপুলসংখ্যক বন ব্যবহার করে, যেমন জাহাজ বানানো থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি, লোহা ও চিনি। এর ফলে বিনাশ হয়ে যাওয়া বন পুনরায় লাগানো অনেক সময় বাস্তবায়নযোগ্য নয়। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে মার্ক্স দেখিয়েছেন কীভাবে আয়ারল্যান্ড থেকে ব্রিটেনে খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানি করার ফলে মাটির ধ্বংস সাধন ঘটেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে প্রথাগত টেকসই কৃষি ও হস্তশিল্পের বদলে বৃহদাকারে চা ও আফিমের পণ্য উৎপাদন চালু করে। প্রাচীন সেচব্যবস্থা বাতিল করায় খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সাইতোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'ফ্রাসের কাজ গবেষণা করে মার্ক্স সঠিকভাবেই ভেবেছেন যে উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর বিকাশের নেতিবাচক দিক এবং প্রাকৃতিক মেটাবলিজমে এগুলো যে বাধা সৃষ্টি করে, তা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের প্রেক্ষাপটে আরও ভালোভাবে গবেষণা করা দরকার।' (পৃ. ১৬৮)

সে সময়ে দ্রুতগতিতে যেসব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছিল, মার্ক্স তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি সঠিকভাবেই সেসব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গবেষণা করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। এগুলো সতর্কতার সঙ্গে গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদ যেসব বাস্তুতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করেছে, তা সে কতটুকু থামাতে পারে, তা খতিয়ে দেখা। এ ছাড়া তাঁর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। নিজের উচ্চমূল্য ধরে রাখতে পুঁজিবাদের যে অসীম আকাঙ্ক্ষা এবং তার ফলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, তা-ও মার্ক্স খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এসে তিনি লাইবিজের প্রতি মূল্যায়ন কিছুটা বদলে ফেলেন। এর ফলে আসলে বাস্তুতান্ত্রিক গবেষণার একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়।

সাইতো অবশ্য বলেছেন যে 'মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থনীতির চিন্তায় বাস্তুতন্ত্রকে যদি মনে করা হয় দ্বিতীয় সারির বিষয়, তাহলে এর কারণ আংশিক পাওয়া যাবে পশ্চিমা মার্ক্সীয় ঐতিহ্যে। কারণ, পশ্চিমা মার্ক্সবাদে সামাজিক ধরন নিয়ে আলোচনা হয় বেশি। কিন্তু ম্যাটেরিয়াল বা কনটেন্ট বহুলাংশেই অবহেলিত থাকে।' (পৃ. ১৮০)

নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে মার্ক্স প্রথমে যখন পুঁজিবাদের সমালোচনা তৈরি করছিলেন, তখন তিনি বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবেননি। কিন্তু ১৮৪৪ সালে মার্ক্স যেসব নোটবুক লিখেছেন, সেখানে দেখা যায় তিনি ইতিমধ্যেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রূপান্তর ঘটাতে আধুনিক এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার অবসান দাবি করেছেন। কিন্তু তরুণ মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার এই ব্যাখ্যাটি বহুকাল ধরে নজরে না আসার কারণ হলো তাঁর বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের মূলধারার দার্শনিক ব্যাখ্যা। তবে ইকোলজি বা বাস্তুতন্ত্র-সম্পর্কিত বিতর্কে যে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, মার্ক্স তাঁর আধুনিক সমাজের সমালোচনায় প্রকৃতি থেকে মানুষকে আলাদা করার ফলে সৃষ্ট সংকটকে মূল সমস্যা হিসেবে দেখেছেন।

শেষ কথা

মার্ক্স-এঙ্গেলস-গেসামটসগাবে-এর ঐতিহাসিক এই সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার ফলে আমরা মার্ক্সের তত্ত্বকে নতুন করে পুনর্নির্মাণ করতে পারি। এখান থেকে দেখা যায় কীভাবে মার্ক্স তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব সংহত করতে গিয়ে পুঁজিবাদের সমালোচনা হিসেবে নিজের বাস্তুতান্ত্রিক ভাবনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। মেগা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত নতুন অনেক বিষয় ঘেঁটে সাইতো দেখাতে চেয়েছেন যে প্রাকৃতিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও আমাদের বাস্তুতন্ত্রের দুর্দশা সম্পর্কে মার্ক্স উদাসীন ছিলেন বলে যে এক দেশদর্শী ও মিথ্যা ধারণা রয়েছে, তা ঠিক নয়। এ ছাড়া অসীম অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ সম্পর্কে মার্ক্সের প্রমিথীয় কুসংস্কার সম্পর্কে যে সমালোচনা রয়েছে, তা-ও যুক্তিসিদ্ধ নয়। আবার মার্ক্সের যেসব এক্সার্পটস ও নোট রয়েছে, সেগুলো ঘাঁটলে দেখা যায় যে পুঁজিবাদের সমালোচনায় ইকোলজি বা বাস্তুতন্ত্রকে মার্ক্স কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রেখেছেন। মার্ক্সের মূল্য তত্ত্ব থেকে আমরা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাস্তুতান্ত্রিক তত্ত্ব পাই এবং সেটা তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই পাওয়া যায়। তা ছাড়া পুঁজিবাদের মাধ্যমে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক মেটাবলিজম বা বিপাককে তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকল্পে উদ্ধার করার কথা বলেছেন। সাইতোর বইয়ে এই ব্যাপারগুলো স্পষ্টতই ধরা পড়েছে।

এই বইয়ে একটি বিষয় লক্ষণীয় আর তা হলো সাইতো মার্ক্সের নোটবুকগুলো অনেক বেশি পড়েছেন এবং সেখান থেকে বাস্তুতন্ত্র বিষয়ে মার্ক্সের অন্তর্নিহিত ধারণার চেয়ে স্পষ্ট ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করেই বেশি যুক্তি তিনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেখানে মার্ক্সের লেখা থেকে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি তিনি দেননি। যাহোক, মার্ক্সের পরিবেশ সমাজতন্ত্রের ধারণা বিকশিত করতে ভবিষ্যৎ গবেষকদের আরও অনেক কাজ করতে হবে। কারণ, সাইতোর বই থেকে আমরা দেখতে পাই

যে মেগা প্রকল্পের আওতায় এই পর্যন্ত মার্ক্সের বাছাইকৃত নোটবুকগুলোর মধ্যে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর শেষ পনেরো বছরে বিকাশমান পরিবেশ ভাবনা যে নোটবুকগুলোয় রয়েছে, তা মেগা প্রকল্পের চতুর্থ ভাগে প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তবু বলা যায় *কার্ল মার্ক্সেস ইকোসোশ্যালিজম* গ্রন্থটি মার্ক্সীয় পরিবেশ সমাজতন্ত্রের বিকাশমান রচনায় একটি অপরিহার্য সংযোজন।

কোহেই সাইতোর এই বইটি অত্যন্ত পরিশ্রমী একাডেমিক কাজ হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের জন্য যথেষ্ট সহজবোধ্য দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে তিনি দেখিয়েছেন, মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক প্রকল্প বাস্তবায়নে পুঁজির বাস্তুতান্ত্রিক ফাটল দূর করা অপরিহার্য। এ ছাড়া সাইতো চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে *জার্মান আইডিওলজি* লেখার পর মার্ক্সের দশকব্যাপী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার ফলে তাঁর বিশ্লেষণের ওপর প্রভাব ফেলেছে। সাইতো তাঁর বইয়ের উপসংহারে লিখেছেন, 'মার্ক্স সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, এমন নয়। তিনি আজকের পৃথিবীর জন্য ভবিষ্যদ্বাণীও করেননি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তাঁর বাস্তুতন্ত্রবিষয়ক কাজের কোনো মূল্য আজ আর নেই। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মার্ক্স পুঁজিবাদের যে সমালোচনা করেছেন, তা থেকে বর্তমানে বাস্তুতন্ত্রের সংকট বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি পাওয়া যায় এবং বাস্তুতন্ত্র বিষয়ে মার্ক্সের নোটবুকগুলো তাত্ত্বিক ভিত্তির বিরাট গুরুত্ব প্রমাণ করে।' (পৃ. ১৮৩) পৃথিবীর সঙ্গে পুঁজির অসামঞ্জস্যতা বিষয়ে মার্ক্সের বিবর্তনমূলক উপলব্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সাইতো দিয়েছেন। পরিবেশ সমাজতন্ত্র নিয়ে যারা কাজ করতে চায়, তাদের জন্য সাইতোর এই কাজ অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Paul Burkett, *Marx and Nature: A Red and Green Perspective*, New York: St. Martin's Press, 1999.

২. John Bellamy Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature*, Monthly Review Press New York, 2000.

৩. György Lukács, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, The Marlin Press, 1971.

৪. Rosa Luxemburg, *The Accumulation of Capital*, translated by Agnes Schwarzschild, Routledge & Kegan Paul, 1951.

৫. Karl Marx, *Grundrisse*, translated by Martin Nicolaus, Penguin Press, 1973. Retrieved from Marxists Internet Archive.

লে খ ক প রি চি তি

আবুল কাসেম ফজলুল হক

লেখক ও শিক্ষক। তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষালাভ করেন। গোটা কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা শেষে ২০১১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে লিখে আসছেন। তখনকার প্রগতিশীল ছাত্র-আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *কালের যাত্রার ধ্বনি*, *একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন*, *মুক্তিসংগ্রাম*, *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল*, *তাজউদ্দীন আহমদ ও প্রথম বাংলাদেশ সরকার*, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য*, *আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা*, *বিশ্বায়ন ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ*, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, *জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বায়ন ও ভবিষ্যৎ* প্রভৃতি। লিও টলস্টয়, বার্ট্রান্ড রাসেল, আল্ডুস হাক্সলি প্রমুখের কিছু লেখা তিনি সাগ্রহে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মাও সেতুংয়ের অনেক লেখা তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান* ২০১৫ সালে এবং *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ* ২০১৭ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বায়নের ওপর তাঁর আরও একটি বই প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আসেফ বায়াত

ইরানি বংশোদ্ভূত মার্কিন পণ্ডিত। বর্তমানে তিনি বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদবিষয়ক ক্যাথেরিন অ্যান্ড ব্রুস বাস্তিয়ান অধ্যাপক এবং আরাবানা-শ্যাম্পেইনে অবস্থিত ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান ও মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক। এর আগে তিনি নেদারল্যান্ডসের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান ও

মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নের অধ্যাপক ছিলেন এবং আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ ও সংস্কৃতিকেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। তিনি তেহরান থেকেই বিএ পাস করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন কেন্দ্রে তিনি পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলোশিপের পদে ছিলেন। তিনি কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেন। এ ছাড়া বার্কলের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে জড়িত ছিলেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট অ্যান্থনিস কলেজের ফেলো ছিলেন।

এম মোফাখ্‌খারুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ভারত উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর প্রধান তিনটি গবেষণাগ্রন্থ হচ্ছে *বেঙ্গল এগ্রিকালচার, ১৯২০-৪৬ : এ কোয়ানটিটেটিভ স্টাডি* (কেমব্রিজ, ১৯৭০); *ইরিগেশন, এগ্রিকালচার অ্যান্ড দ্য রাজ : পাঞ্জাব ১৮৮৭-১৯৪৭* (নিউ দিল্লি, ১৯৯৭) এবং *অ্যান ইকোনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৯৪৭* (ঢাকা, ২০১৩)। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তাঁর ৪০টি প্রবন্ধ দেশি-বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন উন্নয়ন অধ্যয়নের ওপর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জার্মান ভাষার ওপর তিনি পড়াশোনা করেছেন জার্মানির ম্যাক্স ভেবার হাউস, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক ও পরামর্শক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন এবং করছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই ও লেখা তিনি মূল জার্মান, ফরাসি ও রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন। ২০১৭ সালে তাঁর অনুবাদের ওপর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মালেকা বেগম

গবেষক ও শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিস বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক। বাংলাদেশের নারীবাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। নারীর সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও আইনি অধিকার নিয়ে গবেষণা করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—[সম্পা.] নারীর কথা (ঐতিহ্য, ২০১২); মুক্তিযুদ্ধে নারী (প্রথমা প্রকাশন, ২০১১); [সম্পা.] নির্বাচিত

বেগম : অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০ (পাঠক সমাবেশ, ২০০৬); যৌতুকের সংস্কৃতি (ইউপিএল, ২০০৬); [সম্পা.] স্নেহলতা (সূচীপত্র, ২০০৬)।

খলিলউল্লাহ্

লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে (বিসিএএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে *প্রতিচিন্তা*র সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনৈতিক অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভূরাজনীতি, সামাজিক উন্নয়নসহ সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণা করেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১